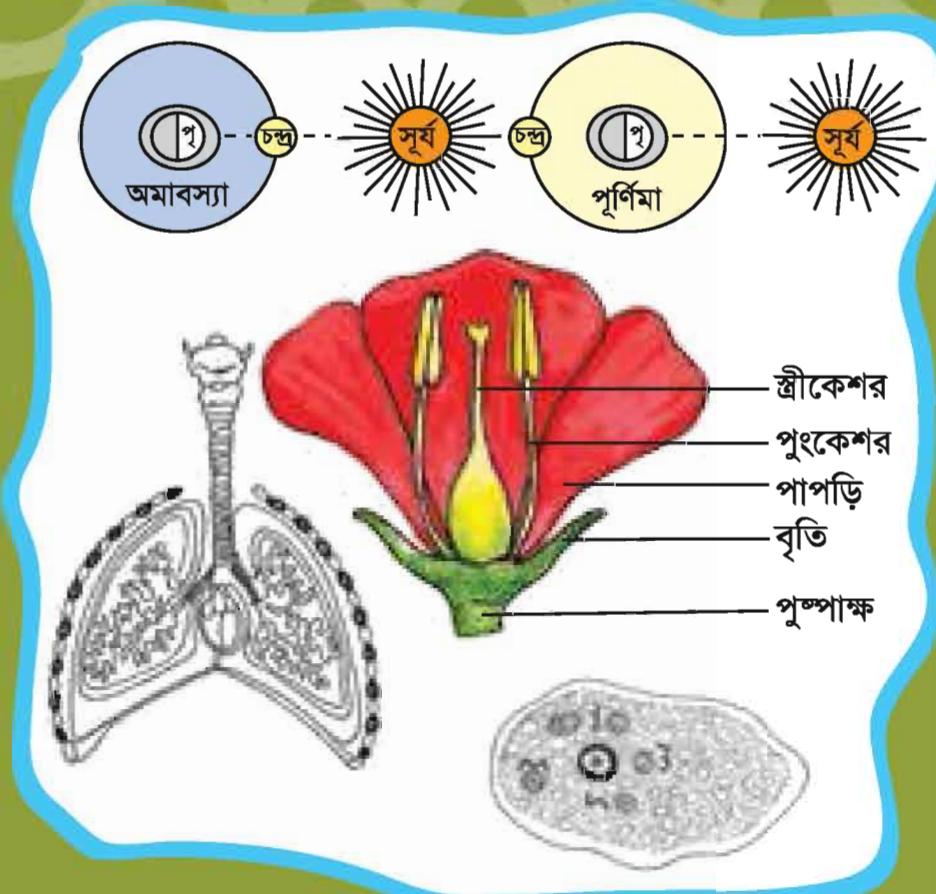


# বিজ্ঞান

## সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

---

## বিজ্ঞান

### সপ্তম শ্রেণি

#### রচনা

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন  
প্রফেসর ড. সফিউর রহমান  
প্রফেসর এস এম হায়দার  
প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা  
প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান  
যোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী  
ড. মোঃ আব্দুল খালেক  
গুল আনার আহমেদ

#### সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবাল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক শ্রেণীর সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্পিত করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের কাজ দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা  
চেয়ারম্যান  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

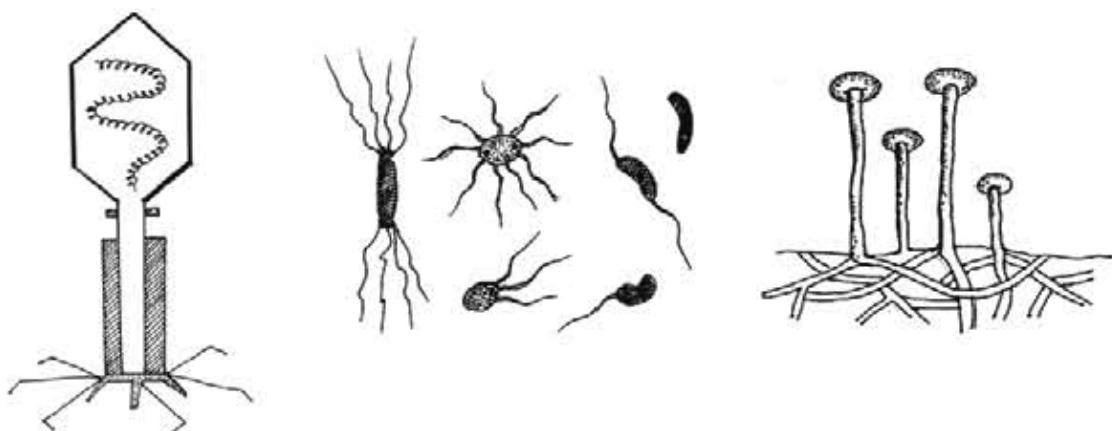
## সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	নিম্নশ্রেণির জীব	১-৯
দ্বিতীয়	উক্তিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	১০-২১
তৃতীয়	উক্তিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	২২-৩১
চতুর্থ	শ্বসন	৩২-৪০
পঞ্চম	পরিপাকতন্ত্র এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র	৪১-৫৪
ষষ্ঠ	পদার্থের গঠন	৫৫-৬৫
সপ্তম	শক্তির ব্যবহার	৬৬-৭৯
অষ্টম	শব্দের কথা	৮০-৮৯
নবম	তাপ ও তাপমাত্রা	৯০-১০০
দশম	বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা	১০১-১১১
একাদশ	পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা	১১২-১২২
দ্বাদশ	সৌরজগৎ ও আমাদের পৃথিবী	১২৩-১৩৪
ত্রয়োদশ	প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দূষণ	১৩৫-১৪৫
চতুর্দশ	জলবায়ু পরিবর্তন	১৪৬-১৬০

## প্রথম অধ্যায়

# নিম্নশ্রেণির জীব

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছাঁকা, শৈবাল, অ্যামিবা ইত্যাদিকে নিম্নশ্রেণির জীব কলা হয়। এদের মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যামিবা অপুরীকৃত বজ্রের সাহায্য ছাঁকা দেখা যায় না। এসা অপুরীকৃত অস্তর্ভূত। কিন্তু কিন্তু ছাঁকা ও শৈবাল ধাপি ঢাঁকে দেখা দেলেও অধিকালে ছাঁকা ও শৈবাল দেখতে অপুরীকৃত বজ্রের সাহায্য লাগে। এসব অপুরীব বা আদিজীব মানব, গৃহপালিত পশুপাখি ও উদ্ধিদের গোল সৃষ্টি করে। আবার পরিবেশে এদের অনেক উপকারী সূমিকাও রয়েছে।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- অপুরীবের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অপুরীবের প্রক্রিয়াসমূহ করতে পারব।
- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যামিবার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- শৈবাল ও ছাঁকাকের বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কীভাবে ছাঁকা সহজমুখ্য প্রতিক্রিয়া করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ছাঁকাকমিন্ট গোল সহজমুখ্যের বিবরে নিজে সচেতন হব ও অন্যদের সচেতন করব।
- মানবদেহে স্বাস্থ্য বৃক্ষি সৃষ্টিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এক্টামিবার সূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এক্টামিবার কানপে সৃষ্টি মানবদেহে স্বাস্থ্য বৃক্ষি প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব। এসব স্বাস্থ্য বৃক্ষি প্রতিকারে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদেরও সচেতন করব।

### পাঠ- ১, ২ : অণুজীব জগৎ

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক জীব দেখতে পাই। এসব জীব ছাড়াও আমাদের পরিবেশে অনেক জীব রয়েছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। এদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রিকামূলক সূচিত কোষও নেই। এরা অণুজীব নামে পরিচিত। এসব অণুজীব থেকেই সৃষ্টির উভয়তে জীবনের সূচাপাত হয়েছে। তাই অণুজীবদেরকে আদিজীবও বলা হয়ে থাকে।

তোমরা বষ্টি শেখিতে যাইগুলিস ও ফুইটেকারের জীবজগতের পর্যায় প্রস্তাবনার অণুজীবসমূহকে মনেরা, প্রোটিন্ট ও ফানজাই রাখ্যে দেখতে পেয়েছো। আবার অণুজীবসমূহের প্রেমিয়তাল করতে পিয়ে বর্তমান কালে অণুজীব বিজ্ঞানীগণ এ জগৎকে তিসটি রাখ্যে কাল করেছেন।



**রাখ্য-১ :** এক্যারিওটা বা অকোরীয় : এসব অণুজীব এতই ছোট যে তা সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ বরের নিচেও দেখা যায় না। এসের দেখতে ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন- ভাইরাস।

**রাখ্য-২ :** হোক্যারিওটা বা আসিকোরী : দেখব অণুজীবের কোষের কেন্দ্রিকা সূলাটিত সব তাঁরাই এ রাখ্যের সদস্য। সূলাটিত কেন্দ্রিকা না থাকার এদের কোষকে আসিকোর বলা হয়, যথা- ব্যাকটেরিয়া।

**রাখ্য-৩ :** ইউক্যারিওটা বা প্রকৃতকোরী : দেখব অণুজীব কোষের কেন্দ্রিকা সূলাটিত তাঁদেরই প্রকৃত কোষ বলে। শৈবাল, ছাঁচাক ও প্রোটোজোয়া এ রাখ্যের অণুজীব।

**নতুন শব্দ :** এক্যারিওটা, হোক্যারিওটা, ইউক্যারিওটা, অণুজীব, ভাইরাস।

### পাঠ- ৩, ৪ : ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

ভাইরাস, রিকেটিস, ছাঁচাক, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অণুজীব আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। এরা অধিকাংশই আমাদের উপকার করে। তবে কিছু কিছু অণুজীব আছে যারা আমাদের দেহে গ্রেপ সৃষ্টি করে। এবার আমরা করেবকটি অণুজীব সম্বর্কে জানব।

**ভাইরাস :** ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ বন্ধ ছাড়া ভাইরাসদেরকে দেখা যায় না। এবা সরলতম জীব। ভাইরাসের দেহে কোষঘাটীর, প্রাণঘালেমা, সুসংগঠিত নিউক্লিসাস, সাইটোগ্লাবল ইত্যাদি কিছুই নেই। তাই ভাইরাস দেহকে অকোরীয়ও বলা হয়। এবা অধুমাত্র আমির আবরণ ও নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ বা



চিত্ৰ- ৩.১। একটি  
ব্যাকটেরিয়াকার ভাইরাস কমিকা

আরএনএ) নিয়ে গঠিত। এদের আমিষ আবরণ থেকে নিউক্লিক এসিড বের হয়ে গেলে এরা জীবনের সকল লক্ষণ হারিয়ে ফেলে। তবে অন্য জীবদেহে যেইমাত্র আমিষ আবরণ ও নিউক্লিক এসিডকে একত্র করা হয়, তখনি এরা জীবনের সব লক্ষণ ফিরে পায়। অর্থাৎ জীবিত জীবদেহ ছাড়া বা জীবদেহের বাইরে এরা জীবনের কোন লক্ষণ দেখায় না। এ কারণে ভাইরাস প্রকৃত পরজীবি।

ভাইরাসদের মধ্যে ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস একটি পরিচিত ভাইরাস। চিত্র ১.১ এ এদের গঠন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

ভাইরাস গোলাকার, দণ্ডাকার, ব্যাঙাচির ন্যায় ও পাউরুটির ন্যায় হতে পারে। ভাইরাস মানবদেহে বসন্ত, হাম, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। ধানের টুংরো ও তামাকের মোজায়েক রোগ ভাইরাসের কারণে হয়। বসন্ত, হাম, সর্দি ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ।

**ব্যাকটেরিয়া :** ব্যাকটেরিয়ার কিছু কথা আমরা পূর্বের শ্রেণিতে জেনেছি। এবার একটু বিস্তারিত জানবো। ব্যাকটেরিয়া হলো আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত, অসবুজ, এককোষী অণুবীক্ষণিক জীব।

বিজ্ঞানী অ্যাল্টনি ফন লিউয়েন তুক সর্ব প্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখতে পান। ব্যাকটেরিয়া কোষ গোলাকার, দণ্ডাকার, কমা আকার, পাঁচানো ইত্যাদি নানা ধরণের হতে পারে। দেহের আকার আকৃতির ভিত্তিতে একে নিম্নরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় :



চিত্র- ১.২: কক্ষাস

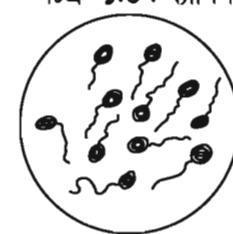
ক) **কক্ষাস** (চিত্র-১.২) : কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি গোলাকার। এরা কক্ষাস ব্যাকটেরিয়া। এরা এককভাবে অথবা দলবেঁধে থাকতে পারে, যেমন-নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া।



খ) **ব্যাসিলাস** (চিত্র-১.৩) : এরা দেখতে লম্বা দণ্ডের ন্যায়। ধনুষ্টৎকার, রক্তামশয় ইত্যাদি রোগ এরা সৃষ্টি করে।

চিত্র- ১.৩ : ব্যাসিলাস

গ) **কমা** (চিত্র-১.৪) : এরা বাঁকা দণ্ডের ন্যায় আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। মানুষের কলের রোগের ব্যাকটেরিয়া এ ধরনের।



চিত্র- ১.৪ : কমা

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা :

- মৃত জীবদেহ ও আর্বজনা পাঁচাতে সাহায্য করে।
- একমাত্র ব্যাকটেরিয়াই প্রকৃতি থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন সংবহন করে।
- পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে।
- দই তৈরি করতে ও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিতে হয়।
- বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়।
- ব্যাকটেরিয়া জীন প্রকৌশলের মূল ভিত্তি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবের কাঞ্চিত বৈশিষ্ট্য পাওয়ার জন্য জীনগত পরিবর্তনের কাজে ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ১.৫ : স্পাইরিলাম

### পাঠ-৫-৬ : ছ্বাক, শৈবাল ও অ্যামিবা

**ছ্বাক :** ছ্বাক সমাজেদেহী ক্লোরোফিলবিহীন অস্বুজ উদ্ভিদ। ক্লোরোফিলের অভাবে এরা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। তাই এরা পরভোজী অথবা মৃতভোজী। পরভোজী ছ্বাক বাসি ও পচা খাদ্য দ্রব্য, ফলমূল, শাকসবজি, ক্ষেঁজা কুটি বা চামড়া, গোবর ইত্যাদিতে জন্মায়। মৃতভোজী ছ্বাক মৃত জীবদেহে বা জৈব পদার্থ পূর্ণ মাটিতে জন্মায়।

**ছ্বাকের অর্থনৈতিক পুরুষ :** পেনিসিলিনসহ বহু মূল্যবান ঔষধ ছ্বাক থেকে পাওয়া যায়। পাউরুটি তৈরিতে ইস্ট নামক ছ্বাক ব্যবহার করা হয়। ইস্ট ভিটামিন সমূক্ষ বলে ট্যাবলেট হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এগারিকাস নামক এক ধরনের মাশকূম সৌধিন খাদ্য বলে বিবেচিত। বর্তমানে আমাদের দেশসহ বহু দেশে এর চাষ করা হয়। আবর্জনা পটিয়ে মাটিতে মেশাতেও ছ্বাকের ভূমিকা রয়েছে।

**মানুষ, জীবজুত্ত ও উদ্ভিদের বহু রোগের জন্য দায়ী এই ছ্বাক।** দাদ, ছুলী (ছেলম) ও মানুষের শ্বাসনালির প্রদাহ ছ্বাকের সংক্রমণে হয়ে থাকে। ছ্বাক আঙুর বিলম্বিত ধূসা রোগ, পাটের কালোগতি রোগ, আধের জাল পচা রোগ সৃষ্টি করে। এরা সহজেই কাঠ ও বেত বা বাঁশের আসবাবপত্র পচিয়ে আমাদের ক্ষতি করে।

**ছ্বাক সংক্রমণ প্রতিরোধকরণ :** ছ্বাকজনিত রোগ খুবই ছোঁয়াচে। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এসব রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে যা করা দরকার তা হলো:

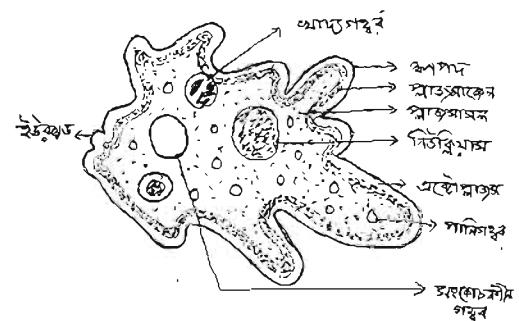
- ছ্বাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র (কাপড়-চোপড়, চিঙ্গলি, টুপি, স্যান্ডেল)
- ব্যবহার না করা।
- ছ্বাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কম আসা।
- ছ্বাক আক্রান্ত উদ্ভিদে ঔষধ ছিটানো বা উদ্ভিদ তুলে পুড়িয়ে ফেলা।

**শৈবাল :** সমাজবর্গের ক্লোরোফিলযুক্ত ও ব্য-ভোজী উদ্ভিদরাই শৈবাল। এরা মাটি, পানি ও অন্য গাছের উপর জন্মায়। সবুজ ছাড়াও লাল, বাদামি ইত্যাদি রংগের শৈবাল দেখা যায়। ‘স্পাইরোগাইরা’ নামক শৈবাল বেশিরভাগ জলাশয়ে পাওয়া যায়।

**শৈবালের উপকারিতা :** আইসক্রিম তৈরিতে সামুদ্রিক শৈবালজাত অ্যালজিন ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক শৈবাল আয়োডিন ও পটাশিয়ামের একটি ভালো উৎস। মৎস্য চাষে শৈবাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**শৈবালের অপকারিতা :** মানুষ ও উদ্ভিদের নানা রোগ সৃষ্টিতে শৈবাল দায়ী। যেমন এক ধরনের শৈবাল চা-পাতার রেড রাস্ট রোগ সৃষ্টি করে। জলাশয়ে শৈবালের আধিক্য দেখা দিলে জলজ প্রাণী ও মাছ অঙ্গিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে।

**অ্যামিবা :** প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্য অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। এদের দেহ ক্ষুদ্রাকার। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। এরা প্রয়োজনে দেহের আকার পরিবর্তন করে থাকে। এদের দেহ থেকে আঙুলের মতো ভেরি অভিক্ষেপকে ক্ষণপদ বলে। এর সাহায্যে অ্যামিবা খাদ্যাহঙ্গ ও চলাচল করে। এদের দেহে পানিগহন, খাদ্যগহন ও সংকোচন গত্তর থাকে। এদের সারা দেহ একটি পাতলা ও স্বচ্ছ পর্ণ দ্বারা ঢেরা থাকে। একে প্রাজমালেমা বলা হয়। অ্যামিবা পানিতে, স্যাতস্যাতে মাটিতে, পুকুরের তলার পচা জৈব আবর্জনার মধ্যে জন্মে।

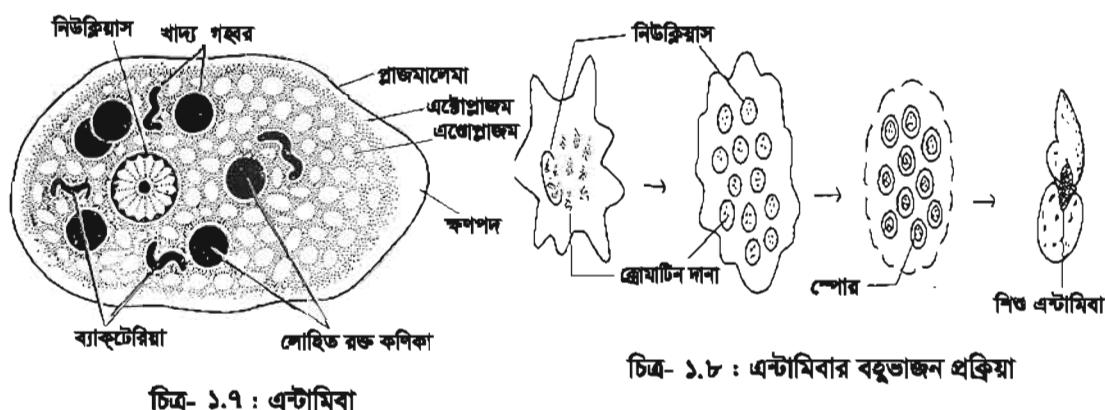


চিত্র- ১.৬ : অ্যামিবার আণুবীক্ষণিক গঠন

## পাঠ-৭ : এন্টামিবা

আমাশয় রোগ সাধারণত দুই ধরনের, যথা— এমিবিক ও ব্যাসিলারি। ব্যাসিলারি আমাশয়ের কারণ এক ধরনের ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া। এন্টামিবা নামক এক ধরনের এককোষী প্রাণীর আকৃতিশে এমিবিক আমাশয় হয়ে থাকে।

**এন্টামিবা:** এন্টামিবা প্রোটিস্টা রাজ্যভূক্ত আরেক ধরনের এককোষী জীব। খালি ঢোকে এদের দেখা যায় না। এদের দেহের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নাই কারণ এরাও সর্বদাই অ্যামিবার মত আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করতে থাকে। এদের দেহ স্বচ্ছ জেলির ন্যায়। তবে কখনো কখনো প্রতিকূল পরিবেশে এরা গোলাকার শক্ত আবরণে নিজেদের দেহ ঢেকে ফেলে। এ অবস্থায় একে সিস্ট বলে।



চিত্র- ১.৭ : এন্টামিবা

চিত্র- ১.৮ : এন্টামিবার বহুভাজন প্রক্রিয়া

এরা পরজীবী হিসাবে মানুষ, বানরজাতীয় প্রাণী, বিড়াল, কুকুর, শুকর ও ইঁদুরের বৃহদজ্ঞ বাস করে। এন্টামিবা এক ধরনের আমাশয় রোগের জন্য দায়ী।

এন্টামিবা কোষ বিভাজন ও অণুবীজ(স্পোর) সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃক্ষি করে। স্পোরুলেশন পদ্ধতিতে একটি কোষের প্রোটোপ্লাজম বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে ক্ষত্র ক্ষত্র অণুবীজ বা স্পোর গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে এরা প্রত্যেকে একটি নৃতন অ্যামিবা হিসেবে বড় হয়।

রোগী রোগজীবাগুটি কোন শক্ষণ ছাড়াই বহন করে। এমিবিক আমাশয় সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা খুব কঠিন। উপর্যুক্ত চিকিৎসকের প্রামার্শ নিয়ে ঘৃষ্ণ খেলে এ রোগ সেরে যায়।

## পাঠ -৮, ৯ : স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টিতে অণুজীবের ভূমিকা

ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দেহভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে। অগ্রিমকার হাত জীবাণুর জন্য একটি সুবিধাজনক বাহন। যার মাধ্যমে সহজেই এরা মুখগহরে দুকে যেতে পারে। আমরা যে জামা কাপড় ব্যবহার করি তাতে গেগে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর স্থানান্তরিত হতে পারে।

বাতাসে যে ধূলাবালি উড়ে বেড়ায় তার সাথে অতি সহজেই ব্যাকটেরিয়া বা তার স্পোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। হাত মেলানোর মাধ্যমেও ব্যাকটেরিয়া একজন থেকে অন্যজনে অতি সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে। পচা ও বাসি খাদ্যের মাধ্যমে জীবাণু সহজেই ছড়ায়। কলেরা ও টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবাজনিত রোগ এক সময় খুবই ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে যেত। নিরাপদ পানির অভাবে এমন হত। যত্রত্র মগমৃত ত্যাগের কারণেও জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এসব মলমুক্তে যে জীবাণু থাকে তা ভক্ষণকারী অন্য জীব এগুলোকে ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া বৃক্ষ বা জোয়ারের পানিতে এগুলো দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

**কাজ :** তোমারা তোমাদের এলাকায় ঘুরে দেখ কোন কোন বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে, তার একটি তালিকা কর এবং যাদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই তাদেরও এ ব্যাপারে সচেতন কর। তোমার কাজের বর্ণনা লিখে দেখাও।

আমাদের দেশের অনেক স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই এবং এসব অঞ্চলে মানুষ মাঠ বা কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে। এন্টামিবায় আক্রান্ত ব্যক্তির মল মাঠের মাটিতে মিশে যায়। এ মাটি হাতে লাগলে বা এ মাটিতে যে সবজি চাষ করা হয় তাতে এসব জীবাণু লেগে থাকে। সবজির ভিতরেও এরা প্রবেশ করে। রান্নার পরও দেখা যায় এ জীবাণু তখনও বেঁচে আছে। এভাবে এন্টামিবা সংক্রান্তি হয়।

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় ২/৪ দিনে এমনি এমনি রোগ সেরে যায়। তবে কিছু মারাত্মক রোগ আছে যার জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। হাঁচি, কফ, থুতু ও কাশির মাধ্যমে সর্দি কাশির ভাইরাস ছড়ায়। সংশ্রেষ্ণ দ্বারা উষ্ণিদের মোজাইক রোগ ছড়ায়। আবার এইড্স রোগ একবার হলে আর নিরাময় হয় না। অসুস্থ লোকের রক্ত গ্রহণ, মাদক গ্রহণ, এক সুই এ বহু লোকের ইনজেকশন গ্রহণ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে এ রোগ ছড়ায়। মাস্পস, হাম, বসন্ত ইত্যাদি খুবই কষ্টকর রোগ। ভাইরাসজনিত এসব রোগ বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং আমাদের শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে। এভাবে নানা মাধ্যমে ভাইরাস সুস্থ দেহে প্রবেশ করে।

### পাঠ-১০ : মানবদেহে অণুজীব সৃষ্টি স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছ্বাক ও এন্টামিবা যেসব রোগ সৃষ্টি করে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো যত্ন সহকারে পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্বল স্বাস্থ্যের ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বহন করে। তাই সকলের উচিত সুষম খাদ্য প্রয়োজন মতো নিয়মিত গ্রহণ করা।

**কাজ :** তোমার শ্রেণির যাদের নখ বড়, যারা আজ দাঁত ত্রাশ করেনি তাদের তালিকা বানাও এবং এ ব্যাপারে তাদের সচেতন কর।

শুধু মাংস আর মাছ খেলেই সুষম খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয় না। একইসাথে তাজা শাকসবজি ও ফলমূল খেলে তবেই সুষম খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয়। ভিটামিন ও খনিজ লবণ সুস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আসে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাত ও মুখ পরিষ্কার করা, নিয়মিত দাঁত ত্রাশ করা, হাতের নখ কাটা ও সাবান ব্যবহার করে গোসল করা। রাস্তাঘাটে যত্রত্র থুতু বা কফ না ফেলা। পথ চলতে বিশেষ করে ধূলাবালি উড়ছে এমন স্থানে চলাচলের সময় অবশ্যই মাস্ক বা বুমাল ব্যবহার করতে হবে। ইঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই মুখে ও নাকে বুমাল চাপা দিতে হবে। বুমালে সর্দি মুছলে অবশ্যই বাসায় ফিরে তা ধূয়ে ফেলতে হবে। তোমরা সম্ভব হলে নাক ঝাড়ার জন্য টিসু পেপার

ব্যবহার করতে পার। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য কোনো কিছু ব্যবহার বা স্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। খাবার পানি নিরাপদ হওয়া খুবই জরুরি। কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে। পান করা, গোসল ও কাপড় কাচা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদির জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত। আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ। পুকুর ও নদীর পরিষ্কার পানিও ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। মানুষ ও পশুপাখি আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসা করাতে হবে। তবে ভাইরাস, যেমন বার্জিনু তে আক্রান্ত হলে পাখি মেরে মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। ম্যাডকাউ ও অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত গরু—মহিষও মেরে ফেলা উচিত কারণ এর চিকিৎসা চলাকালীন অন্যান্য পশু আক্রান্ত হতে পারে।

**কাজ :** তোমাদের এলাকায় ঘুরে দেখ কোন কোন বাড়িতে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে। না থাকলে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থপনা কর।

এলাকার সবাইকে স্বাস্থ্যসম্ভবতাবে জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। কীভাবে এসব জীবাণু মানবদেহে ঢুকে পড়ে এবং কী করলে এদের প্রতিরোধ করা যাবে সে সম্পর্কে নিজে ভালোভাবে জানতে হবে। বিদ্যালয়ে, মসজিদে, মন্দিরে, খেলার মাঠে, হাটে, বাজারে যেখানে লোকসমাগম বেশি সেখানেই এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ। রোগাক্রান্ত হলে অবশ্যই রোগীকে একজন ভালো চিকিৎসকের নিকট গিয়ে পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে ঔষধ সেবন করতে হবে। হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের বদলে রোগ জটিল স্তরে পৌছে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সকলের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির জীব।
- ভাইরাস অকোষীয় জীব।
- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টিকারী জীব।
- পানি, বায়ু ও অপরিচ্ছন্ন হাত রোগ জীবাণু ছড়ায়।
- স্বাস্থ্যসম্ভবতাবে জীবন যাপন রোগ প্রতিরোধ করে।

### অনুশীলনী

#### শুন্যস্থান পূরণ কর

1. মানুষের টাইফয়েড রোগের কারণ \_\_\_\_\_।
2. আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের নাম \_\_\_\_\_।
3. জীবন্ত দেহের বাইরে \_\_\_\_\_ কোনো জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
4. \_\_\_\_\_ নামক ছত্রাক পাউরুটির কারখানায় ব্যবহার করা হয়।
5. দণ্ডকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে \_\_\_\_\_ বলে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রকৃত পরজীবী কথার অর্থ কী?
২. ব্যাকটেরিয়াজনিত চারটি রোগের নাম লিখ।
৩. অণুজীব কারা?
৪. কোন কোন উপাদান নিয়ে ভাইরাসের দেহ গঠিত?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করে কোন ব্যাকটেরিয়া?
 

ক. স্পাইরিলাম	খ. ব্যাসিলাস
গ. কক্স	ঘ. কমা
২. শৈবাল ব্যবহৃত হয়-
 

i. আইসফ্রিম প্রস্তুতকরণে	ii. মাছ চাষের ক্ষেত্রে	iii. উষধ তৈরি করতে
--------------------------	------------------------	--------------------

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### উদ্বীপকটি পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তারেক আখ খাবার সময় লক্ষ করল আখের গায়ে লাল দাগ পড়েছে। তার বাবা বললেন এটি এক ধরনের পরজীবীর কারণে সৃষ্টি হয়।

৩. উদ্বীপকের পরজীবী জীবটি সৃষ্টি করে-
 

i. রেড রাস্ট	ii. ট্রাকিয়ার প্রদাহ	iii. মাথার খুশকি
--------------	-----------------------	------------------

### নিচের কোনটি সঠিক?

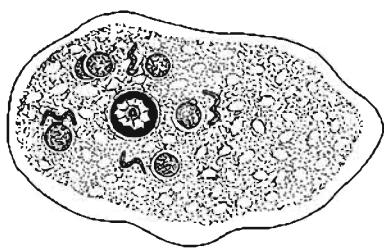
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. তারেকের লক্ষ করা রোগটির জন্য কোনটি দায়ী?

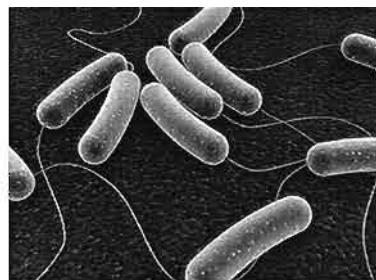
- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| ক. ছত্রাক       | খ. শৈবাল  |
| গ. ব্যাকটেরিয়া | ঘ. ভাইরাস |

## সূজনশীল প্রক্রিয়া

১.



A



B

- ক. শৈবাল কী ?  
 খ. ছত্রাককে মৃতজীবী বলা হয় কেন ?  
 গ. A ঘাসা সৃষ্টি রোগ প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. B ক্ষতিকারক জীব হলেও পরিবেশের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্মসহ তোমার মতামত দাও।
২. সোহেল ইনফ্লুয়েঞ্চার আক্রান্ত হয়েছে। তার বাবা তাকে ইঁচি ও কাঁশি দেওয়ার সময় ঝুমাল ব্যবহার করতে বললেন।
- ক. ভাইরাস কী ?  
 খ. ভাইরাসকে অকোষীয় জীব বলা হয় কেন ?  
 গ. সোহেলকে ঝুমাল ব্যবহার করতে বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. সোহেল রোগটি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যদের কীভাবে সচেতন করবে তা বিশ্লেষন কর।

## নিজেরা কর

- ১) একথে পাঁড়ুটি ভিজিয়ে অস্থকার ঘরে কয়েকদিন রেখে দাও। এর পর ঝুটির উপরে যে সাদা বা কাল আস্তরণ দেখা যাবে সেগুলো অণুবীক্ষণ ঘন্তের মাধ্যমে দেখ এবং যা দেখছ তার ছবি আৰু। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।
- ২) টেক্ডুশ পাতা, পেপে পাতাসহ অন্যান্য গাছের কঁচকানো পাতা সংগৃহ কর এবং বিষয়টি নিয়ে দলে আলোচনা কর। পাতার এ রকম পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের কর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য নাও।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# উদ্ধিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্ষত্রিয়ক্ষত্র জীবদেহ থেকে শুরু করে অতি বৃহদাকার ও উচ্চশ্রেণির উদ্ধিদ ও প্রাণীদেহের সাংগঠনিক এবং কার্যপ্রণালিতে প্রচুর মিল-অমিল রয়েছে। সকল জীবদেহের মধ্যে সাধারণ মিল বা সাদৃশ্যাত্মক হলো যে, জীবদেহ মাত্রাই কোষ দ্বারা গঠিত। বিগত কয়েকশ বছর ধরে বিজ্ঞানীগণ নিরলস প্রচেষ্টায় কোষের গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর গবেষণামূলক কাজ করেছেন। একটি জীবদেহের সব কোষের গঠন প্রকৃতি এক রকম নয় বরং ভিন্ন। আমরা এ পরিচেছে কোষের গঠন বর্ণনা করব কিন্তু নিম্নে বর্ণিত সকল অঙ্গাণু এক সাথে এক কোষে পাওয়া যায় না। তাই মোটামুটি সব ধরনের কোষে যেসব ক্ষত্রিয় অঙ্গাণু পরিলক্ষিত হয় সেগুলোকে বর্ণনার জন্য একটি কোষের আওতায় এনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দিকে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীববিজ্ঞানীরা কোষের যে ধারণা পেয়েছিলেন তা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত হয়েছে। সেই আলোকে আদর্শ কোষ আলোচনা করা হলো।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- উদ্ধিদ এবং প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্গন করতে পারব।
- প্রাণী এবং উদ্ধিদকোষের তুলনা করতে পারব।
- কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার টিস্যুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ধিদ ও প্রাণীটিস্যুর পার্থক্য করতে পারব।

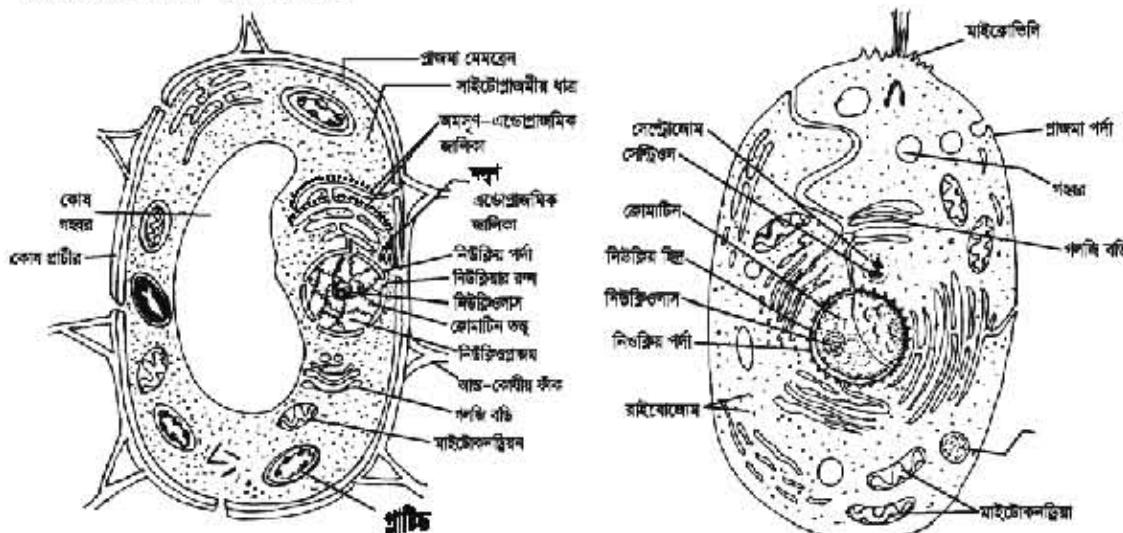
## পাঠ ১-২ : একটি উন্মিত কোরের বর্ণনা

ପ୍ରତିଟି ଜୀବଦେହ ଏକ ବୀ ଏକାଧିକ କୋଷ ମିଯେ ଗଠିତ ହୁଁ । ଏକଟି ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ସିଳକୋଷ ଥିଥାନତ ମୂଳ ଅଳ୍ପ ନିଯ୍ମାନ ଗଠିତ-କୋଷଥାତିର ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଟାଙ୍ଗମ ।

**কেবলাত্তীর :** উত্তিসকোবের ক্ষেত্রে কোষবিজ্ঞির বাইরে অক্ষ পদার্থ দিয়ে তৈরি একটি প্ল্যাটফর্ম আচার থাকে, একে কোষপ্রাচীর বলে। এটি সেন্সুলোজ হারা পঠিত। প্রাণিকোবে এ ধরনের আচার থাকে না। প্রাণিকোবের আকরণটি প্রাক্ত্য পর্দা হারা পঠিত। কোবের সঙ্গীব অংশকে রক্ত করা এবং কোবের শীমান্তখা নির্দেশ করা কোষপ্রাচীরের প্রধান বিষয়।

**ଆଟୋଗ୍ରାହ୍ୟ :** ଆଟୋଗ୍ରାହ୍ୟ କୋମେଲ ଅର୍ଥତରଳ, ଜେଣିଲ ଯତୋ ଆଠାଲୋ ଓ ଦାନାଦାର ବର୍ଣ୍ଣିନ ସଙ୍ଗୀବ ଅଳ୍ପ । ଆଟୋଗ୍ରାହ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ସିକ୍ରିଯାର ଫଳ ଜୀବନେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଣେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହି ସିକ୍ରିଯ ଜୈବ ଓ ଆଜ୍ୟ ସୌମ୍ୟରେ ଗ୍ରହିତ । ଆଟୋଗ୍ରାହ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ପରିମାଣ ଜୀଥରଥତ ଶତକଜ୍ଞ ଥେବେ ୧୦ ହାତ ।

**সাইটোগ্রাম:** কোকের প্রোটোগ্রামের নিউলিয়াসের বাহিরে ছেলের ঘটো অংশকে সাইটোগ্রাম বলে। সাইটোগ্রামের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট কোকের বিভিন্ন জৈবনিক তিস্তাকলাপের সাথে সংযুক্ত সজীব কম্প্যুসমূহকে একত্রে সাইটোগ্রামীয় অঙ্গাদৃশ্য বলা হয়। একটি আর্মি কোকে সাধারণত নিম্নস্থিত অঙ্গাদৃশ্যগুলো দেখা যায়— ১. প্রাস্টিড, ২. মাইটোক্লিয়া, ৩. গ্লুকোজ, ৪. এণ্ডোপ্রাজিয়িক জালিকা, ৫. রাইবোজেম, ৬. সাইসোজোম ও ৭. সেপ্টিক্স।



କ. ଆର୍ଦ୍ର ଉପିଲକୋବେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଳ୍ପ

३१

୯୦ ଆମର୍ତ୍ତାନିକୋଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧିତି ଚାଲୁ

**कोषलगङ्गर** : कोषेर सजीव अज्ञान् एवं निषीव कम्प्लेसमूह साइटोप्रायमेर थात्रे थाके। उडिस कोषेर निषीव कम्प्लेसमूहे यथेह आहे वित्तन्न रकमेर सवित्त पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ ओ करित पदार्थ। कोषेर साइटोप्रायमे फरवर पदार्थपूर्ण (क्रोमस) हेट-बड प्रकृत थाके तादेर कोषलगङ्गर वले। आणिकोवे सायाग्रहात कोषलगङ्गर थाके ना तबे कोलो कोलो कोषे याणि थाके ता आकाजे खुब हेट। उडिसकोवे

কোষগুহৰ বেশি থাকে এবং আকারে বড় হয়। এ কারণে উক্তিদ কোষে নিউক্লিয়াস একপাশে এবং প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াস মাঝে থাকে। নানা প্রকার জৈব এসিড, লবণ, শর্করা, আমিষ ইত্যাদি কোষ গহৱে দ্বৰীভূত অবস্থায় থেকে কোষরস প্রস্তুত করে।

**কাজ :** চিত্র দেখে দলগতভাবে প্রাণী ও উক্তিদকোষের মধ্যে পার্থক্যগুলো পোস্টার কাগজে লিখে উপস্থাপন কর।

### পাঠ ৩ – ৫ কোষ অঙ্গাণুগুলোর পরিচয়

সাইটোপ্লাজমে সুনির্দিষ্ট আবরণীযুক্ত সজীব বস্তুগুলো কোষ অঙ্গাণু। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

**প্লাস্টিড :** সজীব উক্তিদকোষের সাইটোপ্লাজমে বর্ণহীন অথবা বর্ণযুক্ত গোলাকার বা ডিম্বাকার অঙ্গাণুকে প্লাস্টিড বলে। সাধারণত প্রাণিকোষে প্লাস্টিড নেই। এ অঙ্গাণুটি উক্তিদকোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্লাস্টিড উক্তিদের খাদ্য সংশ্লেষে, বৰ্ণ গঠনে এবং খাদ্য সংপ্রয়ে মুখ্য ভূমিকা প্রাপ্ত করে। রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে প্লাস্টিডকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক্রোমোপ্লাস্টিড বা বর্ণযুক্ত প্লাস্টিড এবং লিউকোপ্লাস্টিড বা বর্ণহীন প্লাস্টিড। ক্রোমোপ্লাস্টিড দুই রকম- ক্লোরোপ্লাস্ট ও ক্রোমোপ্লাস্ট। এদের মধ্যে তিনটি অংশ পরিলক্ষিত হয়। যথা- আবরণী, স্ট্রোমা এবং গ্রানা। প্লাস্টিডের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় সুবজ বৰ্ণ ধারন করে। সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করা এর প্রধান কাজ।

ক্রোমোপ্লাস্ট ফুলের পাপড়ি ও ফুলের তৃকে বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সবুজ ফল পাকার সময় ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। টমেটোর যে লাল টকটকে রং দেখ তা এ ক্রোমোপ্লাস্টের লাইকোপেন নামক রঞ্জক পদার্থের জন্য হয়। ক্রোমোপ্লাস্টে লাল, কমলা ও হলুদ বর্ণের ক্যারোটিনয়েড নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে।

উক্তিদের যেসব অংশে আলো পৌছায় না, সেসব অংশের কোষে লিউকোপ্লাস্টিড থাকে। যেমন মূলের কোষের প্লাস্টিড। সূর্যালোকের প্রভাবে এ প্লাস্টিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়। তোমরা নিচয় লক্ষ করে থাকবে, যদি সবুজ দুর্বাধাস ইট দিয়ে কিছুদিন ঢাকা থাকে তবে ঘাসগুলো সাদা হয়ে যায়, কারণ ক্লোরোপ্লাস্টগুলো লিউকোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ইট সরিয়ে নিলে সূর্যের আলোয় ঘাসগুলো আবার সবুজ বর্ণের হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে এক ধরনের প্লাস্টিড রূপান্তরিত হয়ে অন্য ধরনের প্লাস্টিডে পরিণত হয়।

**মাইটোকন্ড্রিয়া :** সজীব উক্তিদ ও প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা ছেট ছেট দণ্ডাকার অঙ্গাণুগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে (এক বচনে মাইটোকন্ড্রিয়ন)। প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ন দ্বিতৰ পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এর বহিঃপর্দাটি মস্ণ। কিন্তু অন্তঃপর্দাটি দানা আঙুলের মতো অনেক ভাঁজ সৃষ্টি করে। এদেরকে ক্রিস্টি বলে।

জীবের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের শক্তির উৎস হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া। এ জন্য মাইটোকন্ড্রিয়কে কোষের ‘পাওয়ার হাউস’ বলে। সবুজ উক্তিদকোষে এর সংখ্যা বেশি তবে প্রাণীর যকৃত কোষে এর সংখ্যা সহস্রাধিক।



চিত্র-২ : মাইটোকন্ড্রিয়ন

**পদমি বাতি :** এগুলো পর্মাদেয়া গোলাকার বা সূজাকার অঙ্গাশ বা নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থান করে। উৎসেচক, হৃতমোন ইত্যাদি করণ করা এর কাজ।

**সেন্ট্রিওল :** আপিকোকের নিউক্লিয়াসের কাছে সুটি ফৌলা মলাকর অঙ্গাশ বা সংকোচিত অঙ্গাশ দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে, সেন্ট্রিওল সাধারণত একটি স্বচ্ছ দানাবিহীন সাইটোপ্রাইম রাসা আবৃত থাকে। এ অংশকে সেন্ট্রোজেম বলে। উভিদকোবে সেন্ট্রিওল সাধারণত থাকে না, তবে নিউক্লিওপ্রিন উভিদকোবে বেমন-ছান্দাকে থাকে। আপিকোব বিভাজনের সময় অ্যাস্টের পঠন করা সেন্ট্রিওলের পথান কাজ।

**নিউক্লিয়াস :** প্রোটোপ্রাইমে পর্মা দিয়ে বেষ্টিত সর্বাপেক্ষা অনেক ক্ষমতাকে নিউক্লিয়াস বলে।

প্রতিটি নিউক্লিয়াস চারটি অংশের সমন্বয়ে পঞ্চিত হয়—i. নিউক্লিয়ার মেধাত্রেন বা নিউক্লিয়ার পর্মা ii. নিউক্লিওলাস iii. নিউক্লিও জালিকা iv. নিউক্লিওপ্রাইম।

নিউক্লিয়াস—এর ভৌত পঠন পর্মাকার প্রকৃত সময় কোথ বিভাজন—এর পূর্ব মুহূর্তে ইন্টারফেজ মধ্যে। নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ নিচে আলোচনা করা হল।

i. **নিউক্লিয়ার পর্মা :** সজীব ও বিস্তরবিশিষ্ট পর্মা দিয়ে প্রতিটি নিউক্লিয়াস আবৃত থাকে, তাকে নিউক্লিয়ার পর্মা বলে। নিউক্লিয়ার পর্মা অসংখ্য ছিস্টুকু। এসব ছিস্টের নাম নিউক্লিয়ার মস্তু।

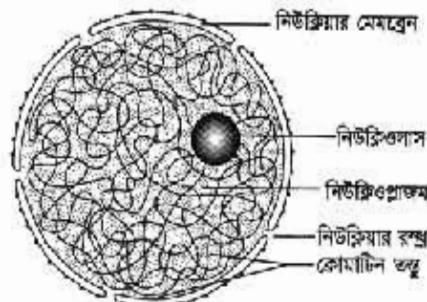
নিউক্লিয়ার পর্মা সাইটোপ্রাইম এর সাথে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন ক্ষমতাবোধ রক্ষা করে এবং নিউক্লিয়াসকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

ii. **নিউক্লিওপ্রাইম :** নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরীন নিউক্লিয়ার মেধাত্রেন দিয়ে আবৃত স্বচ্ছ, দানাদার ও জেলির মতো অর্ধতরুল পদার্থটির নাম নিউক্লিওপ্রাইম বা ক্যারিওলিফ। এটি নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোজোমের মাতৃকা বা ধারক হিসেবে কাজ করে এবং নিউক্লিয়াসের জৈবনিক কার্বাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

iii. **নিউক্লিওলাস :** নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত শূণ্য, গোলাকার, উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষমতাটি নিউক্লিওলাস নামে পরিচিত। সাধারণত প্রতি নিউক্লিয়াসে একটি নিউক্লিওলাস থাকে।

iv. **নিউক্লিওজেলিক বা ক্রোমাটিস অঙ্গ :** নিউক্লিওপ্রাইমে ভাসমান অক্ষমায় প্রাচানো সূতার মতো পঠনটি নিউক্লিওজেলিক বা ক্রোমাটিস জালিকা নামে পরিচিত। কোথ বিভাজনের সময় তত্ত্বময় পঠনটি কতগুলো টুকরায় পৃথক হয়ে থায়। প্রতিটি টুকরাকে ক্রোমোজোম বলা হয়।

**কাজ :** একটি আঙুল কেটে সামান্য গালিতে কচলিয়ে সে গালিয়ে সুই-তিস কৌটিচ অণুবীক্ষণ বর্জে দেখ এবং চিক্কের সাথে মিলাও। এগুলো কি কোনোর অঙ্গাশ নাকি অন্য কস্তু? এগুলো কেনের কী?



চিত্ৰ-২,৩ : নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ

অক্ষুন্ন শব্দ—

কোষপর্মা, প্রোটোপ্রাইম, সাইটোপ্রাইম, প্রাসিড, মাইটোকঞ্জিয়া, এভোপ্রাইমিক প্রেটিক্সুলাম, লাইসোজেম, নিউক্লিক এসিড ও ক্রোমোজোম।

### পাঠ ৬-৭ : উত্তিদচিস্যুর বৈশিষ্ট্য ও কাজ

জীবদেহ এককোষী অথবা বহুকোষী হতে পারে। যেসব জীবের দেহ একটি কোষ দিয়ে গঠিত তারা এককোষী। একটি মাত্র কোষ দিয়ে এদের পুষ্টি, বেচন, শ্বসন, জনন ইত্যাদি যাবতীয় জৈবিক কাজ সম্পন্ন হয়। বহু কোষ নিয়ে গঠিত জীবদেহকে বহুকোষী জীব বলে। বহুকোষী জীবদেহ গঠনকারী চিস্যুগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণিবিন্যাস ঘটে তেমনি অপর দিকে শুধু বিভাজনও হয়ে থাকে। কারণ যদি সকল কোষ একই সাথে এবং একই রকম ভাবে জৈবিক কার্য সম্পন্ন করত তাহলে জীবদেহের গঠন বৈচিত্র্য এবং শারীরবৃত্তীয় ও জৈবিক কাজগুলোতে নানা রকমের বিশ্লেষণ দেখা দিত। এতে সুষ্ঠু জৈবিক ধারা বজায় থাকত না। সুষ্ঠু জৈবিক ক্রিয়া এবং সুষ্ঠু জীবন ধারা রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার কোষ সমবেত ভাবে বা একত্রে কাজ করার জন্য জীবদেহে পুরুষকারে থাকে।

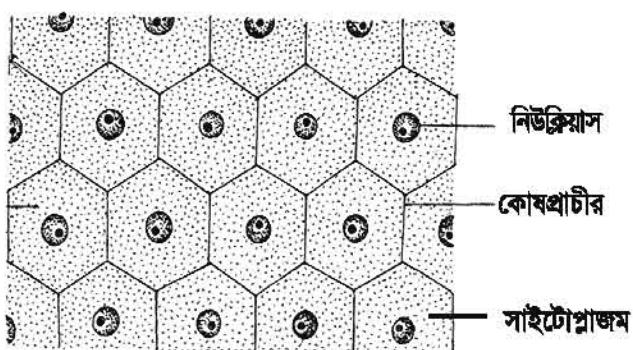
উৎপত্তির দিক থেকে একইরকম কতগুলো কোষ আয়তনে ও আকৃতিতে অভিন্ন বা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি দলগত ভাবে অবস্থান করে একই ধরনের কাজ করে তখন সেই দলবদ্ধ কোষগুলোকে চিস্যু বলে।

### উত্তিদচিস্যু

উত্তিদ ও প্রাণীদেহ বিভিন্ন প্রকার চিস্যু ধারা গঠিত। একেক ধরনের চিস্যু একেক ধরনের কাজ সম্পন্ন করে।

বিভাজন ক্ষমতা অনুসারে চিস্যু প্রধানত দুই রকম, যথা— ক) ভাজক চিস্যু ও খ) স্থায়ী চিস্যু।

**ভাজক চিস্যু :** উত্তিদের দেহে যেসব চিস্যুর কোষের বিভাজন ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোকে ভাজক চিস্যু বলে।  
ভাজক চিস্যু উত্তিদের বর্ধনশীল অঙ্গে অবস্থান করে। বিশেষত কাণ্ড ও মূলের অঞ্চলগুলো অবস্থান করে।



চিত্র-২.৪: ভাজক চিস্যু

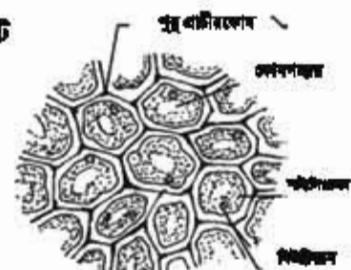
#### ভাজক চিস্যুর কাজ :

- ক্রমাগত বিভাজনের ফলে ভাজক চিস্যু নতুন নতুন কোষ ও চিস্যু সৃষ্টি করে।
- এটি উত্তিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বৃদ্ধি ঘটায়।
- ভাজক চিস্যু চিস্যুর উৎপত্তি ঘটায়।

**স্থায়ী টিস্যু :** ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন নির্দিষ্ট আকৃতিশীল পরিপন্থ টিস্যুকে স্থায়ী টিস্যু বলে। উদ্বিদের পাই সর্বজন স্থায়ী টিস্যু দেখা যায়।

### স্থায়ী টিস্যুর কাজ

- \* খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবহন করা।
- \* দেহ পঠন ও উদ্বিদকে সূচিত প্রদান করা।



চিত্র-২.৫ : স্থায়ী টিস্যু

**কাজ :** ভাজক ও স্থায়ী টিস্যুর কাজ দেখে এসের বৈশিষ্ট্য গুলো আলাদা করে পোস্টারে শিখে দলে উৎসাহন কর।

### পাঠ ৮-১০ : প্রাণীটিস্যুর বৈশিষ্ট্য ও কাজ

আমরা কীভাবে ইটাচলা করি, কীভাবে খাবার খাই, কীভাবে শুল-প্রশাস দেই কর করা। এ কাজগুলো যেমন আলাদা ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা খাদ্য দিয়ে ইঁটি, হাত দিয়ে শিখি, মুখ দিয়ে খাবার খাই, দাত দিয়ে খাবার চিবাই। এ কাজগুলো করে আলাদা আলাদা অভ্য। এই অভ্যগুলোর কোথের পঠন ও কাজ আলাদা। আমাদের দেহের হাড়, মাস, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অনেকগুলো কোথ দিয়ে তৈরি হাদের পঠন ও কাজ ভিন্ন প্রকৃতির।

বহুবেষ্টী প্রণালীতে এতাবে অনেকগুলো কোথ যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ করে তখন এই কোকগুলোকে একত্রে টিস্যু (Tissue) বা কলা বলা হয়। এসব কোকের উদ্দেশ্য এক হলেও এসের আকার, আয়তন ও গঠন ভিন্ন হতে পারে। এটা নির্ভর করে টিস্যু ও কোকের কাজের ধরনের উপর।

প্রাণিদেহ বিভিন্ন ধরণের টিস্যু দিয়ে গঠিত। টিস্যু সাধারণত চার ধরনের হয়। যথা-

ক. আকরণী টিস্যু

খ. বোজক টিস্যু

গ. পেশি টিস্যু

ঘ. মাঝ টিস্যু

ক. আকরণী টিস্যু বা এপিথিলিয়াল টিস্যু

যে টিস্যু দেহের খোলা অংশ ঢেকে রাখে এবং দেহের ডিভড়ের আকরণ কৈরি করে তাকে আকরণী টিস্যু বলে। আমাদের স্তবকের বাইজের আকরণ মুখগুলোর ডিভড়ের আকরণ ইত্যাদি আকরণী টিস্যু দিয়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন প্রশিক্ষণগুলোও আকরণী টিস্যু দিয়ে তৈরি।

আকরণী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য

- \* আকরণী টিস্যু গুলো এক বা একাধিক সকলে সাজানো থাকে।

- কোষগুলো একটি পাতলা ভিত্তি পর্দার উপর সাজানো থাকে।
- এধরনের কলাতে কোনো আন্তঃকোষীয় ধাত্র (matrix) থাকে না।

**কাজ :** এ টিস্যু দেহের ভিতরের ও বাইরের অঙ্গগুলোকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। পাকস্থলি ও অন্ত্রের আবরণী কলা পাচক রস ক্ষরণ করে।

#### খ. পেশি টিস্যু বা মাসকুলার টিস্যু

দেহের কোনো কোনো পেশি আমরা ইচ্ছামত চালনা করতে পারি। যেমন— হাত বা পায়ের পেশি। এ পেশিগুলো আমরা যেভাবে চালাতে চাই সেভাবেই চলে। আবার দেহের কোনো কোনো পেশি আমরা ইচ্ছামতো চালনা করতে পারি না। এ ধরনের পেশি তাদের নিজের ইচ্ছামতো চলে। যেমন— পাকস্থলির পেশি।

এ আলোচনা থেকে জীবন্তাম পেশি দুই প্রকার। যথা—

- ঐচ্ছিক পেশি এবং
- অনৈচ্ছিক পেশি।

**কাজ :** তোমার হাতের কনুই বাঁকাও ও সোজা কর। এতে তোমার হাতের পেশির কী পরিবর্তন ঘটছে? কেন পরিবর্তন ঘটছে? কীভাবে এ পরিবর্তন ঘটছে? লক্ষ কর এবং লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

#### ১. ঐচ্ছিক পেশি

আমরা যখন কনুই বাঁকা করি তখন উর্ধ্ব বাহুর সামনের দিকের পেশি সংকুচিত হয়ে নিম্ন বাহুকে টেনে বাঁকা করে। যে পেশি আমরা ইচ্ছামতো সংকুচিত ও প্রসারিত করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি, তাকে ঐচ্ছিক পেশি বলে। মানবদেহে ঐচ্ছিক পেশির সংখ্যা বেশি। এ পেশি হাড়ের সাথে লেগে থেকে আমাদের অঙ্গ নড়াচড়া করতে সাহায্য করে।

#### ২. অনৈচ্ছিক পেশি

আমাদের খাদ্য নালিতে খাদ্য পরিবহনের দায়িত্ব পালন করছে অন্তর্ব্রহণ পেশি। এ ধরনের পেশির উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থাৎ যেসব পেশি আমাদের ইচ্ছামতো সংকুচিত হয় না, তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। হংপেশি নামে আরেক ধরনের বিশেষ অনৈচ্ছিক পেশি আছে। এ পেশি নিজ ছলে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও স্বাভাবিক হয়ে দেহের রক্ত সঞ্চালন করছে। শুধু হংপেশি এ পেশি দ্বারা গঠিত।

**পেশির কাজ :**

- দেহের আকৃতি দান করে ও অস্থি সঞ্চালনে সহায়তা করে।
- নড়াচড়া ও চলাচলে সাহায্য করে।
- দেহের ভিতরের অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে।
- হংপেশি দেহে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে।

**কাজ :** একটি টেবিলের উপর এমনভাবে বস যাতে পাদুটো ঝুলে থাকে। হাটুর নিচ থেকে একটি পা সোজা কর। আবার একটু বাঁকাও। কোন পেশিগুলো এই নড়াচড়ায় অংশ নিচ্ছে? হাত দিয়ে ধরে বোঝার চেষ্টা কর এবং কী বুঝলে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

### পাঠ : ১১

**যোজক টিস্যু বা কানেক্টিভ টিস্যু :** যোজক টিস্যু প্রাণিদেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এই টিস্যু প্রধানত কাঠিন, তরল ও মেদময় হয়। যেমন—রক্ত, হাড়, তরুণাস্থি, মেদময় কলা ইত্যাদি যোজক টিস্যুর উদাহরণ।

### যোজক টিস্যুর কাজ :

হাড়ের গঠনের একটি প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। হাড় দেহের কাঠামো গঠন করে, দেহের ভার বহন করে ও দৃঢ়তা দান করে। পেশিকর্মনী বা টেনন পেশিকে হাড়ের সাথে যুক্ত করে, মেদ কলা স্থে পদার্থ সঞ্চিত রাখে। তরুণময় যোজক টিস্যু ফ্লুসফুস ও রক্তনাপির প্রাচীর সংকোচন ও প্রসরণে সাহায্য করে। তরুণাস্থি হাড়ের চেয়ে নরম ও অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি চাপ ও টান সহ্য করতে পারে। যেমন— নাক ও কানের তরুণাস্থি। রক্ত বিভিন্ন স্বর্যাদি (অঙ্গিজেন, খাদ্য, ঝেচন পদার্থ) দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করে। এছাড়া রক্ত ঝোগ জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। রক্ত তরল যোজক কলা।

### স্নায়ুটিস্যু বা নার্ভিটিস্যু :

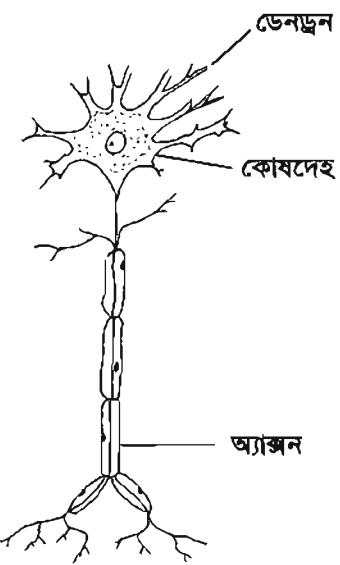
প্রাণী দেহের ষে কলা উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উগ্রমুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে পারে তাকে স্নায়ুটিস্যু বা নার্ভিটিস্যু বলে। স্নায়ুটিস্যুর একক হচ্ছে স্নায়ুকোষ বা নিউরন। মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়ুকোষ বা নিউরন দিয়ে তৈরি।

প্রতিটি নিউরন তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা—

(ক) কোষদেহ (খ) ডেনড্রন এবং (গ) অ্যাঙ্গন।

### স্নায়ুটিস্যুর কাজ :

- দেহের বিভিন্ন ইন্সিয় ও সংবেদন প্রহণকারী অংশ থেকে গৃহীত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
- দেহের কার্যকর অংশ এ উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। যেমন— মশা কামড়ালে এ অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক হাতকে এ কথা জানায় তখন হাত মশা মারার চেষ্টা করে।
- উদ্দীপনা বা স্টোকে মৃত্যিতে ধারণ করে।
- দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।



চিত্র-২.৬ : একটি স্নায়ুকোষ

**কাজ :** ভূমি চোখ বন্ধ কর। কিছু দেখতে পাছ কি? কান হাত দিয়ে বন্ধ কর। কিছু শুনতে পাছ কি? ভূমি পড়া মনে রাখ কীভাবে? এই কাজগুলো করতে তোমার দেহের কোন টিস্যু সাহায্য করে, তার একটি কোষের চিত্র অঙ্কন কর ও এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত এককের নাম কোষ।
- বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম কোষ আবিষ্কার করেন।
- কোষ মধ্যস্থ সম্পূর্ণ সজীব অংশকে প্রোটোপ্লাজম বলে।
- সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত সজীব অঙ্গাণুগুলোর নাম যথাক্রমে নিউক্লিয়াস, প্লাস্টিড, মাইটোকণ্ড্রিয়া, গলগিবস্তু, সেন্ট্রোল ইত্যাদি।
- প্লাস্টিড তিন প্রকার। যথা- ক্লোরোপ্লাস্টিড, ক্রোমোপ্লাস্টিড ও লিউকোপ্লাস্টিড।
- মাইটোকণ্ড্রিয়াকে শক্তির ঘর বলা হয় কারণ শুসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি মাইটোকণ্ড্রিয়াতে সংরক্ষিত থাকে।
- উৎপত্তির দিক থেকে এক হয়ে সম আকৃতির অথবা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো যদি দলগতভাবে একই ধরনের কাজ করে, তখন সেই দলবদ্ধ কোষগুচ্ছকে টিসু বলে।
- টিসু প্রধানত দুই প্রকার- ভাজক টিসু ও স্থায়ী টিসু। ভাজক টিসু থেকে স্থায়ী টিসুর উৎপত্তি।
- যে টিসুর কোষগুলো ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি করে তাকে ভাজক টিসু বলে।
- ভাজক টিসু থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত পরিণত টিসুকে স্থায়ী টিসু বলে।
- হৃৎপেশি এক ধরনের বিশেষ অনেছিক পেশি।
- রক্ত এক ধরনের যোজক কলা।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ————— টিসু বিভাজন অক্ষম।
২. উদ্ভিদ টিসু দুই ধরনের ————— টিসু ও ————— টিসু।
৩. হৃৎপেশি এক ধরনের ————— পেশি।
৪. মস্তিষ্ক অসংখ্য ————— দ্বারা গঠিত।
৫. ————— কোষের পাওয়ার হাউস বলে।

#### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পেশির কাজ বর্ণনা কর।
২. আবরণী টিসুর বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩. নিউক্লিয়াসের গঠন বর্ণনা কর।

৪. প্রাস্টিডের কাজ উল্লেখ কর।
৫. মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভাজক কোষে অনুপস্থিত কোনটি?

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ক. কোষপ্রাচীর | খ. নিউক্লিয়াস |
| গ. কোষগহ্বর   | ঘ. সেলুলোজ     |

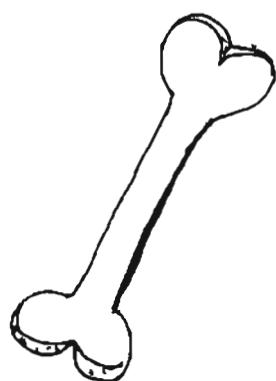
২. কোষগহ্বরে বিদ্যমান ধাতু-

- i. জৈব এসিড ও লক্ষণ
- ii. আমিষ ও শর্করা
- iii. অজৈব এসিড ও জৈব এসিড

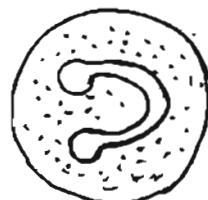
নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্বোধকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



A



B

৩. উদ্বিগকের A চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে –

- i. দৃঢ়তা প্রদান করা
- ii. চর্বি জমা রাখা
- iii. রক্ত কণিকা তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. A ও B এর বৈশিষ্ট্য হলো –

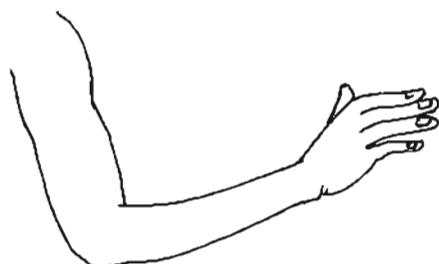
- i. এরা যোজক টিস্যু
- ii. এরা অঙ্গিজেন পরিবহন করে
- iii. এদের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

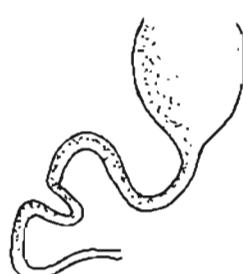
- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. iii         |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১.



P



Q

ক. রক্ত কী?

খ. আবরণী টিস্যু বলতে কী বোঝায়?

গ. P চিত্রে অস্থির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. P ও Q চিত্রের পেশির টিস্যুর তুলনামূলক পার্থক্য কর।

২.



M



N

ক. কোথা প্রচীর থী?

খ. মাইটোসিঙ্গারেকে শক্তি দয়া করা হয়ে কেন?

গ. চিত্র N মূল হওয়া স্বত্ত্বাপন বর্ণনা কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র M এর উপরে ঢাকা উড়িসাটিতে ৮-১০ দিন পুরু হে পরিবর্তন ঘটবে তা বিস্তৃত কর।

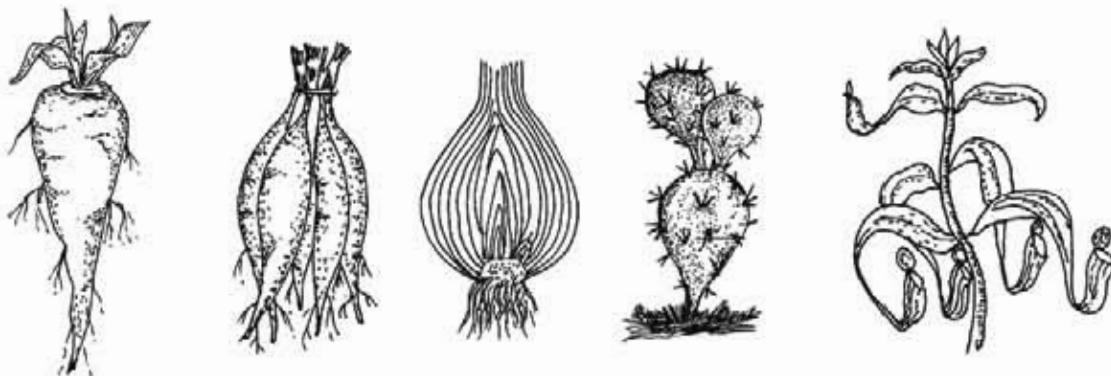
### নিজেরা কর

১। তোমার মেহেরে কোন কোন অঙ্গ একটি পোশি ভাস একটি আলিকা তৈরি করে প্রেসিতে উপস্থাপন কর।

## ত্ত্বীয় অধ্যায়

# উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কখনও কখনও উদ্ভিদের মূল, কাঁড় ও পাতা এমন ভাবে রূপান্তরিত হয় যে তাদের চেনাই যায় না। কেন এরা রূপান্তরিত হয় এবং কীভাবেই যা তাদের নিজে রূপে চেনা যাবে এ অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে।

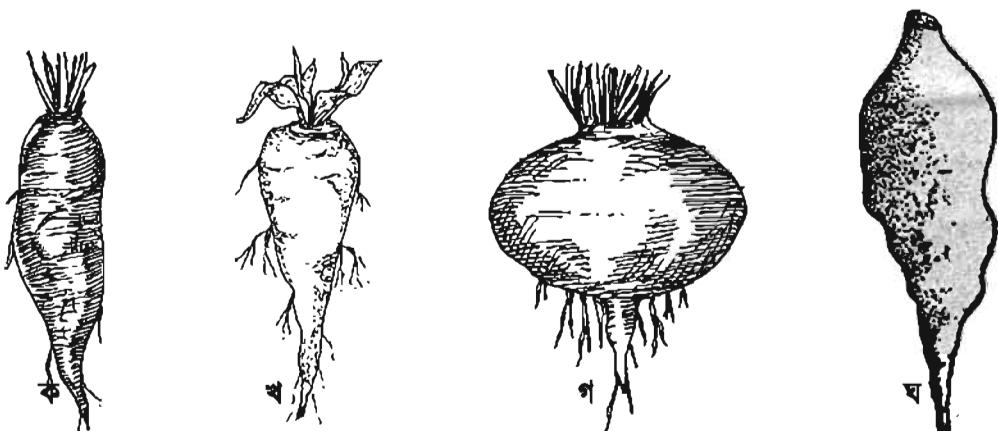


### এ অধ্যায়ে পাঠ শেবে আসবা

- রূপান্তরিত মূলের পঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত কাঁড়ের পঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত পত্রের পঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত মূল, কাঁড় ও পাতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত মূল, কাঁড় ও পাতার চির অঙ্গস করতে পারব।
- আমাদের জীবনে রূপান্তরিত মূল, কাঁড় ও পাতার গুরুত্ব উপরিক করতে পারব।

## পাঠ- ১ : প্রধান মূলের বৃপ্তিরিত

মূলের প্রধান কাজ হল গাছকে মাটির সঙ্গে আবক্ষ রাখা। কিন্তু মূল কখনো বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য বৃপ্তিরিত হতে পারে। এবার খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রধান মূলের বৃপ্তির সম্পর্কে আলোচনা করব। মূলা, গাজর ও শালগম আমরা সবাই দেখেছি এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। এগুলো মূল না কাউ? একটু লক্ষ কর। এদের গায়ে কি কোনো “গিট বা পর্ব আছে? পাতা আছে? মুকুল আছে? না নেই। মাটির উপরে যে পাতা দেখা যায় তা মূলের উপরে অবস্থিত ক্ষুদ্র কাড়ের গা থেকে বেরিয়েছে। আকৃতিগত দিক থেকে এরা চার প্রকার, যথা- ১। মূলাকৃতি মূল, ২। গাজরাকৃতি মূল ৩। শালগমাকৃতি মূল এবং ৪। কলাকৃতি মূল।



চিত্র-৩.১ : বিভিন্ন ধরনের ক্রপাত্তিরিত মূল, ক. মূলাকৃতি মূল, খ. গাজরাকৃতি মূল, গ. শালগমাকৃতি মূল, ঘ. কলাকৃতি মূল

**মূলাকৃতি মূল:** এরা খাদ্য সংগ্রহ করে তাই প্রধান মূল মোটা ও রসাল হয়। এই মূলের মধ্যভাগ মোটা কিন্তু দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। যেমন - মূলা।

**গাজরাকৃতি মূল:** এরা খাদ্য সংগ্রহ করে তাই প্রধান মূলটি মোটা ও রসাল হয়। এই মূলের উপরের দিক মোটা এবং নিচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যায়। যেমন - গাজর।

**শালগমাকৃতি মূল:** এই ক্ষেত্রে প্রধান মূলটির উপরের অংশ খাদ্য সংগ্রহের ফলে গোলাকার এবং নিচের অংশ হঠাতে করে সরু হয়ে যায়। যেমন - শালগম।

**কলাকৃতি মূল:** খাদ্য সংগ্রহের ফলে কখনো কখনো প্রধান মূলটি অনিয়মিতভাবে মোটা হয়। এদের কোনো নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি নেই। যথা- সজ্জামালতি।

## পাঠ-২-৪ : বৃপ্তিরিত অস্থানিক মূল

অস্থানিক মূল বিশেষ বিশেষ কার্য সাধনের জন্য পরিবর্তিত বা বৃপ্তিরিত হয়ে থাকে। অস্থানিক মূল সাধারণত তিন ধরনের কাজ করার জন্য বৃপ্তিরিত হয়ে থাকে, যথা- খাদ্য সংগ্রহ, যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা ও শারীরবৃদ্ধীয় কার্য সম্পাদন।

**খাদ্য সংক্ষের জন্য রূপান্তর :** বিভিন্ন ধরনের অস্থানিক মূল ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করে স্ফীত হয় এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যেমন মিষ্টি আঙুর কসাল মূল, শতমূলী ও ডালিয়ার গুচ্ছিত কসাল মূল ও করলার মালাকৃতির মূল ইত্যাদি। মিষ্টি আঙুর কসাল অস্থানিক মূল মাটির কাছাকাছি কাণ্ডের পর্য হতে বের হয় এবং খাদ্য সংরক্ষণ করার ফলে অনিয়মিত ভাবে স্ফীত হয়ে অনিবারিক আকার ধারণ করে। খাদ্য সংরক্ষণ করা এই মূলের পরিবর্তিত কাজ।

**কসাল মূল (চিত্র ৩.২) :** অস্থানিক মূল কখনো অনিয়মিতভাবে স্ফীত হয়, যথা—  
মিষ্টি আঙু।

**গুচ্ছিত কসাল মূল (চিত্র ৩.৩) :** ইহা কসাল মূলের মতো খাদ্য সংক্ষের জন্য অনিয়মিতভাবে স্ফীত হয়। ভবে স্ফীত মূলগুলো একটি গুচ্ছে অবস্থান করে কারণ, এক গুচ্ছ অস্থানিক মূলের সবগুলোই খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কসালের মতো স্ফীত হয়ে থাকে এই জন্য এই মূলকে গুচ্ছিত কসাল বলা হয়। খাদ্য সংরক্ষণ এর প্রধান কাজ। উদাহরণ— শতমূলী ও ডালিয়া।



চিত্র-৩.৩: ডালিয়ার গুচ্ছিত কসাল মূল

**নড়লুজ মূল (চিত্র ৩.৪) :** যখন মূলের অঙ্গভাগ খাদ্য সংরক্ষণ করে স্ফীত হয়, যেমন—  
আমআদা।

**মালাকৃতির মূল (চিত্র ৩.৫) :** যখন কোনো অস্থানিক মূল পর্যায়ক্রমে স্ফীত ও  
সংকৃতিত হয়, যথা— করলার মূল।



চিত্র-৩.৪: নড়লুজ মূল

### বাণিক ভারসাম্য রক্ষার্থে রূপান্তর

এ মূল উদ্ধিদকে মাটির উপর খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে, আরোহণ করতে বা  
পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। এ জন্য অস্থানিক মূলের বিভিন্ন রকম রূপান্তর ঘটে  
থাকে, যেমন— সততমূল, ঠেসমূল, আরোহী মূল, ভাসমান মূল ইত্যাদি।

**সততমূল:** এই ধরনের অস্থানিক মূল কাণ্ড বা শাখা হতে উৎপন্ন হয়। এরা খাড়াভাবে  
নিচের দিকে নামতে নামতে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং মোটা হয়ে সততের  
আকার ধারণ করে, যেমন— বট।



চিত্র-৩.৫: মালাকৃতি মূল

**ঠেস মূল :** কোনো কোনো উদ্ধিদের প্রধান কাণ্ড দুর্বল হওয়ার কারণে সোজা ভাবে  
দাড়াতে পারে না। তাই কাণ্ডের গোড়ার দিক থেকে কতগুলো অস্থানিক মূল বের  
হয়ে তীর্যকভাবে মাটিতে প্রবেশ করে, যেমন— কেয়ার ঠেশ মূল।



চিত্র-৩.৬: আরোহী মূল

**আরোহী মূল :** এই মূল দুর্বল কাণ্ডমুক্ত উদ্ধিদের পর্য হতে উৎপন্ন হয়ে অন্য কোনো  
উদ্ধিদ বা অবস্থানকে আকড়ে থরে এবং উদ্ধিদটিকে উপরে উঠতে সাহায্য করে,  
যেমন— পান।



চিত্র-৩.৭ : বটের মূল

সততমূল : শীর্ষ-প্রশান্তির  
পাতিতিক তার দখল করে  
এবং পাতাকে সূক্ষ্ম  
ভোজন করে।



চিত্র-৩.৮ : কেওয়ার ঠেস মূল

ঠেস মূল :  
পর্য, পর্যবেক্ষণ  
ও পাতা  
ধৰণ করে  
না। গাছকে  
সোজাতাবে  
নৈড়িয়ে  
ধাক্কতে  
সাধার্য করে।

### শারীরবৃত্তির কার্য সাধনের জন্য ঝুগান্ত

মূলের আত্মাবিক শারীরবৃত্তীয় কার্য হাঙ্গাও বিশেষ বিশেব ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় কার্য সমাধা করার জন্য অস্থানিক মূলের ঝুগান্ত ঘটে থাকে।

**পরাপ্রকৃতি বায়বীয় মূল :** এক অকার মূল বাতাস থেকে জলীয় বাল্প প্রবেশ করে। এদের বায়বীয় মূল বলে। বধা— গ্রাস্ত।



চিত্র-৩.৯ : মাল্টার বায়বীয় মূল

**পরাপ্রকৃতি বা শোষক মূল :** পরাপ্রকৃতি উত্তিসে প্রেরণাবিল থাকে না তাই খাদ্যের জন্য আপ্রয়োগিক উত্তিসের সেহে বিশেব ধরনের মূল প্রবেশ করিয়ে থালাইস শোষণ করে থাকে। এ মূলগুলোকে শোষক মূল বলে, বেমন— স্বর্ণলতা।



চিত্র-৩.১০ : স্বর্ণলতার শোষক মূল

**শাসমূল :** সম্মুখ উপকূলে সবশান্ত ও কর্মসূচি ঘাটিতে উত্তিসের অধ্যান মূল হতে শাখা মূল যাইজ উপরে খাঙ্গাতাবে উঠে আসে। এই সকল মূলে ছেট ছেট ছিপ্প থাকে। এই ধরনের ঝুগান্তরিত মূলকে শাসমূল বা নিউমাটোকের বলে। বেমন— সুন্দরী, গুরান ইত্যাদি।



চিত্র-৩.১১ : শাসমূল

অসম মূল : কোনো কোনো উত্তিসের মূল প্রজননে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন— মিঠি আঙু, পটল, কাকতোল ইত্যাদি।

### পাঠ ৩-৭ : মুগাক্তিরিত কাণ্ড

তোমরা জান, কাণ্ড সাধারণত মাটির উপরে অবস্থান করে এবং পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ কাণ্ড ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাণ্ড সমন্বয় করার জন্য কাণ্ডের আকৃতিগত ও অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তনকে কাণ্ডের মুগাক্তির বলে। অবস্থান অনুবায়ী মুগাক্তিরিত কাণ্ড তিস প্রকার, যথা— ১) চূ-নিম্নস্থ ২) অর্ধ বাস্তীর ও ৩) বাস্তীর।

### চূ-নিম্নস্থ মুগাক্তিরিত কাণ্ড

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা, খাদ্য সংরক্ষণ এবং অভাব উপরে বঞ্চিস্তার করার জন্য কিন্তু কিন্তু উত্তিসের কাণ্ড মাটির নিচে বৃক্ষ পায়। এ ধরনের কাণ্ডকে চূ-নিম্নস্থ মুগাক্তিরিত কাণ্ড বলে। এরা চার অক্তোর, যথা— স্বীকৃত কল, যৌগকাণ্ড বা রাইজোম, কল ও পুকুরকল।

**টিকোর বা স্বীকৃত কল :** গোল আঙু স্বীকৃতকলের উদাহরণ। স্বীকৃত কলের পর্ব, পর্বমধ্য, শক্তপুর ও কাকিক মূকুল থাকে। শক্তপুরের কক্ষে গর্ভের মতো অংশকে “চোখ” বলে। অনুকূল বাহ্যিকে “চোখ” হতে কাকিক মূকুল বৃক্ষ পেয়ে নতুন উত্তিসের সৃষ্টি করে। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য স্বীকৃত হয়ে এরা গোলাকার রূপ ধারণ করে।



চিত্র-৩.১২ : অনন্মূল



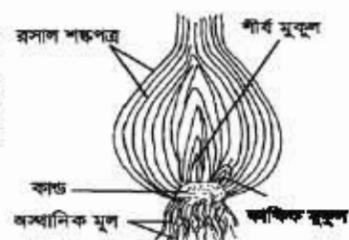
চিত্র-৩.১৩ : টিকোর

**রাইজোম :** আসা, হলুদ অঙ্গুতি উত্তিসের কাণ্ড রাইজোম-জাতীয়। এরা মাটির নিচে খাদ্য সংরক্ষণ করে সমান্তরাল বা খাকাতাবে অবস্থান করে। এদের সূলট পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। পর্ব হতে শক্তপুর ও অস্থানিক মূল এবং শক্তপুরের কক্ষে কাকিক মূকুল উৎপন্ন হয়।



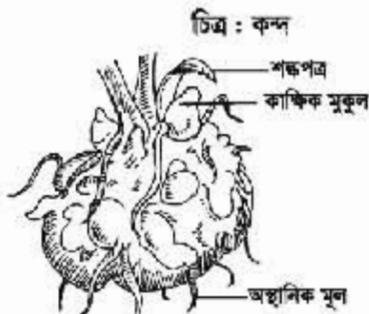
চিত্র-৩.১৪ : রাইজোম

**কল :** পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি উত্তিসের কাণ্ড এই প্রকারের। এদের কাণ্ডটি (কল) ধূমই আঙু, গোলাকার ও উচ্চ। পর্ব ও পর্বমধ্যগুলো সংকুচিত। পুরু ও রসাত্তে শক্তপুরগুলো অবনতাবে অবস্থান করে যে কলটিকে দেখা যায় না। এ কাণ্ডের নিচের দিক থেকে প্রচুর অস্থানিক পুরুমূল বের হয়।



চিত্র-৩.১৫ : কল

**গুড়িকল** : তলকচু গুড়িকলের উদাহরণ। এ ধরনের কাণ্ড বেশ বড়। আকৃতিতে প্রায় পোকাকর। এতে সূক্ষ্ম পর্য ও পর্বমধ্য থাকে। শক্তগতের কফে উৎপন্ন পর্য বা কার্কিল মুক্তালুলি বড় হয় এবং শিখ গুড়িকলের সূচি করে।



চিত্র-৩.১৬ : গুড়িকল

#### অর্ধবায়বীয় মূগাকরিত কাণ্ড

নরম কাণ্ডমুক্ত (বিহু) উত্তিসে এক ধরনের বিশেষ শাখা উৎপন্ন হয়। এ শাখাগুলো অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে নতুন উত্তিসের সূচি করে থাকে। যাত্র উপরে বা সামান্য নিচে অবস্থিত এ ধরনের সূক্ষ্ম শাখিত জগাঙ্গারিত কাণ্ডকে অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বলে। এরা চার প্রকারের হতে পারে।

**আনন্দ বা ধানক:** ধানকুনি, দুর্বায়াস, আমবুল ইত্যাদি উত্তিসের কাণ্ডের নিচের পর্যের কার্কিল মুক্ত থেকে বেশ শাখিত শাখা জন্মায় তাকে ধানক বলে।



চিত্র-৩.১৭ : ধানক

**স্টেলন বা বক ধানক :** এরা এক বিশেষ ধরনের ধানক। কচু উত্তিসের লোঢ়া থেকে সম্ভা শাখা বের হয়। এ শাখার শুধুমাত্র পর্বগুলি অস্থানিক মুলের সাহায্যে মাটি ধরে রাখে বাকি শাখাটি কলতাবে অবস্থান করে। কফে সৃষ্টি মুক্ত থেকে পরে নতুন উত্তিস জন্মায়।



চিত্র-৩.১৮ : বক ধানক

**অকসেট :** টেশাপানা, কচুরিপানা নামক জনপ্রিয় উত্তিসের পর্বমধ্যগুলো ছোট ও স্বোচ্ছ হওয়ার কারণে কাণ্ডকে অর্বাকৃতি দেখায়। এদের অকসেট বলে।



চিত্র-৩.১৯ : অকসেট

**সাকার বা উর্ধ্ব ধানক :** চম্পু মঞ্চিকা, বৌশ প্রভৃতি উত্তিসের শাখিত কার্কিল মুক্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে শাখাটির অংতর্গত মাটির উপরে চলে আসে এবং নতুন উত্তিস উৎপন্ন করে।



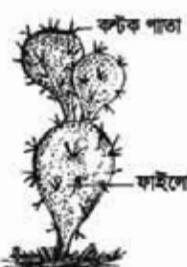
চিত্র-৩.২০ : উর্ধ্ব ধানক

#### বায়বীয় মূগাকরিত কাণ্ড

এ সবল কাণ্ড মাটির উপরে স্থানাবিক কাণ্ডের মত অবস্থান করে কিন্তু বিশেষ ধরনের কাণ্ড বেমন- খাদ্য তৈরি, অঙ্গজ প্রজনন, আন্তরক্ষা, আন্তোহণ ইত্যাদি কাজের জন্য মূগাকরিত হয়ে থাকে। এরা চার প্রকারের হতে পারে।

**ফাইলোক্র্যান্ত বা গর্ভ কাণ্ড :** ফলিষনসা জাতীয় উত্তিসটিই এ ধরনের কাণ্ডের উদাহরণ। এ ধরনের কাণ্ড পাতার মত চ্যাটা ও সবুজ, বার কলে এরা খাদ্য তৈরি করতে পারে। পাতাগুলো কাটার পরিপত্ত হয়ে উত্তিসের আন্তরক্ষা কাজ করে।

**পর্ণ বা শাখা কঠিক :** অনেক সময় কঠিক মূলুল শাখা মূলুল তৈরি না করে শক্ত ও সূচালো কঠিক রূপান্বিত হয়। বেল, মরলার্কাটা, মেঝেদি ইত্যাদি উচ্চদের কঠিকের মতো শাখা কঠিক দেখা যায়।



চিত্ৰ-৩.১৫: পৰ্ণ কাত



চিত্ৰ-৩.১৬: শাখা কঠিক



চিত্ৰ-৩.১৭: শাখা আকৰ্ষণী



চিত্ৰ-৩.১৮: বুলবিল

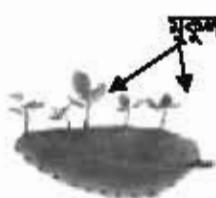
**স্টেম টেলেজিল বা শাখা আকৰ্ষণী:** মুমকেলভা, হাড়জোড়া ইত্যাদি দূর্বল আত্মাদী উচ্চদের পত্রকক্ষ থেকে সূতায় মতো সন্তুষ্ট, সম্পূর্ণ ও শীঘ্ৰান্তে অংশগুলো বেৱ হয় তাকে শাখা আকৰ্ষণী বলে। আকৰ্ষণীতে পাতা উৎপন্ন হয় না।

**বুলবিল:** কোনো কোনো আত্মাদী উচ্চদের কঠিক মূলুল শাখায় পরিষেক না হয়ে শুধু খাদ্য সংকৰণ করে পোলাকৰণ মাধ্যমে পিঙ্কের আকার ধারণ কৰে। এয়াই বুলবিল। যেমন : গাছ আছু।

### পাঠ-৮ : রূপান্বিত পাতা

বিশেষ কাজ সম্বৰ্থন কৰায় জন্য পাতার মূল পরিষেকিত হয়। এ ধৰনের রূপান্বিত পাতা সম্পর্কে এবাব আমৰা জানব।

**ক) আকৰ্ষণী :** সম্পূর্ণ পাতা, পাতার শীৰ্ষতাপ অথবা পৰক অনেক সময় পৌঁছানো শিঙ্গ-এর মতো জুগ ধাৰণ কৰে। গুচ্ছে আকৰ্ষণী। এৱ সাহায্যে গাছ কোনো কিছু আঁকড়ে ধৰতে পাৱে। জুহী মটৰ গাছে এ ধৰনের আকৰ্ষণী দেখা যাব।



চিত্ৰ-৩.১৯: পাখৰকুটি



চিত্ৰ-৩.২০: আকৰ্ষণী



চিত্ৰ-৩.২১: শঙ্কপুৰা



চিত্ৰ-৩.২২: পুনৰৱিত ফুটিল



চিত্ৰ-৩.২৩: পুনৰৱিত পাতা

**খ) খাদ্য সংকৰণ :** পৌঁছাজ, রসুল বা সৃতকুমারী পাতৰে পাতা পুনৰু ও রসালো হয়। এসব পাতার খাদ্য জমা থাকে।

**গ) পত্রজ্ঞ ফৌদ :** কলসি উচ্চদে এক ধৰনের লতানো পাহ ও কীৰ্তি নামক জলজ উচ্চদের পাতা রূপান্বিত হয়ে কলসি বা ধৰে মতো জুগ ধাৰণ কৰে। এৱ যথে পৌকামাকড় দুকলে কলসিৰ ঢাকলাটি বল্খ হয়ে যাব, পোহ গাছ কৰায় দেহ থেকে রস শুষে নেয়।

**ঘ) প্রজনন :** কোনো কোনো উচ্চদে পাতার কিনারা থেকে কুড়ি পজায়। ধীৱে ধীৱে এসব কুড়ি থেকে নিচের দিকে গুজমুদ্রাও পজায়। কোনো এক সময় এন্না মূলুল হয়ে স্বাধীন উচ্চদের জন্ম দেয়, যেমন—পাখৰকুটি।

ঙ) কঠিক পত্র : পাতা কখনো কাঁটায় রূপান্তরিত হয়, যথা- লেবু।

চ) শক্তপত্র : কখনো ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের পাতা পাতলা আঁশের মতো আকার ধারণ করে। যেমন- আলু, আদা, হলুদ ইত্যাদি। এগুলোই শক্তপত্র। রসাল শক্তপত্র খাদ্য সংস্থয় করে এবং কাষ্টিক মুকুলকে রক্ষা করে। যেমন-পিঁয়াজের রসাল শক্তপত্র।

### পাঠ-৯ ও ১০

**দলগত কাজ :**

- ১। রূপান্তরিত অস্থানিক মূলের গুরুত্ব দলে আলোচনা ও উপস্থাপন।
- ২। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে রূপান্তরিত কাণ্ডের গুরুত্ব পোস্টার পেপারে উপস্থাপন।
- ৩। পাতার রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা যুক্তিসহকারে উপস্থাপন।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- আদা ও আলু রূপান্তরিত কাণ্ড।
- কাণ্ড ও পাতা কঠিক বা আকর্ষীতে রূপান্তরিত হতে পারে।
- মূল, কাণ্ড ও পাতা খাদ্য সংস্থয়, জৈবনিক কার্য সম্পর্ক করা, প্রজনন ইত্যাদি কারণে রূপান্তরিত হয়।
- রূপান্তরিত মূল, কাণ্ড ও পাতা মানব জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### অনুশীলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর**

- ১। মিষ্টি আলু একটি রূপান্তরিত ----- |
- ২। কাঁচা হলুদ একটি রূপান্তরিত----- |
- ৩। ফনিমনসা একটি রূপান্তরিত ----- |
- ৪। মূল থেকে পাতায় পানি পৌছানোর কাজ করে----- |
- ৫। পাতার প্রধান কাজ ----- করা।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর**

- ১। গোল আলু মূল নয় কেন?
- ২। ফনিমনসার দেহটি কাণ্ড না পত্র, ব্যাখ্যা কর।
- ৩। পাতা কী কী কারণে রূপান্তরিত হয় ?
- ৪। কাণ্ডের বিশেষ কাজগুলো উল্লেখ কর।
- ৫। মূল কী কী কারণে রূপান্তরিত হয়?

### বন্ধনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন উদ্ধিদের মাণাকৃতির মূল থাকে?

- ক. ভালিগা      খ. আম আদা      গ. মিঠি আলু      ঘ. করলা

২. রাইজেম কাঠের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্ব মধ্য থাকে ii. পর্ব ও পর্ব মধ্যগুলো সংকুচিত iii. মাটির নিচে সমান্বয় তাবে থাকে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

উদ্ধীপকটি লক্ষ কর এবং ত ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. M টিকিত অণ্ডার কাজ হলো—

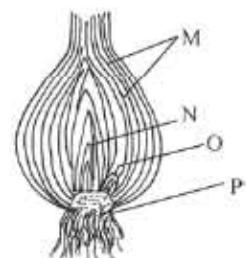
i. খাদ্য জমা দাখা ii. কাফিক মুকুলকে রক্ত করা iii. প্রজননে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. i ও iii      ঘ. i, ii ও iii

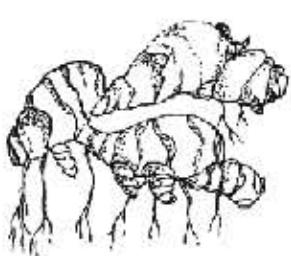
৪. উদ্ধীপকের কোন অংশগুলো থেকে নতুন চারা সৃষ্টি হয়?

- ক. M ও N      খ. N ও O      গ. O ও P      ঘ. M ও P



### সূজনশীল প্রশ্ন

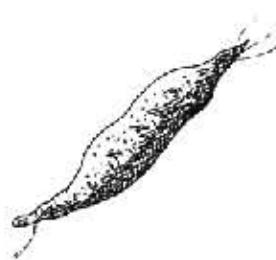
১.



X



Y



Z

ক. মুলবিল কী?

খ. পাখরকুটি পাতার মাঝামে কীভাবে প্রজনন হটে?

গ. চিত্র X এর ব্যবহারিক দিক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Y ও Z এর বৈশিষ্ট্যের ভূলনামূলক আলোচনা কর।

২.



ক. অবস্থট কী?

খ. কলসি উদ্ভিদকে পতঙ্গ কাঁদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ম চিত্রে M চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. R ও N উদ্ভিদ দুইটির ফুলসামূহক আলোচনা কর।

#### নিচেরা কোন

১। যাইচ গাছ, শাল, এক ধক্ক আলা, এক ধক্ক কাঁচা ঝুল, আমফুল শাক, কচুর শতি, কপীয়নসা ও কেশকাঁচা সঞ্চার কর। এসের কাঁচ কোন প্রকৃতির তা খাতার নেট কর এবং তোয়ার কথার বগফে ঝুঁকি দাও।

## চতুর্থ অধ্যায়

### শ্বসন

প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন আছে। জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়ার জন্য শক্তি প্রয়োজন। জীব কোষের সাইটোপ্লাজমে সঞ্চিত সর্টাচ, শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাটের অণুতে শক্তি সঞ্চিত থাকে। সকল জীবকোষের জৈব ক্রিয়ার জন্য অঙ্গিজেন অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে অঙ্গিজেন দ্বারা খাদ্যস্থ স্যেতিক শক্তি যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌরশক্তি থেকে সঞ্চিত হয়, তাকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করাই শ্বসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গতিশক্তি ও তাপশক্তির দ্বারা জীব খাদ্য গ্রহণ, চলন, রেচন, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে। শ্বসন এক প্রকার দহন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অঙ্গিজেন দ্বারা খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি নির্গত হয়।

#### এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা

- জীবের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিত্রের সাহায্যে প্রাণীর শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগের কারণ ও রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারব।
- প্রাণীর শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

#### পাঠ-১ : শ্বসন পদ্ধতি

জীবদেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। শ্বসন দ্বারা এই শক্তি উৎপন্ন হয়। শ্বসনের সময় জীবদেহে কোষস্থিত খাদ্যকে দহন করার জন্য অঙ্গিজেন ব্যবহৃত হয়। এর ফলে উৎপন্ন হয় শক্তি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড। সুতরাং যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ খাদ্যবস্তু অঙ্গিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে খাদ্যস্থ রাসায়নিক শক্তিকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত ও মুক্ত করে এবং ফলশ্রুতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয় তাকে শ্বসন বলে।

শ্বসন একটি বিপাকীয় ক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া চলাকালে প্রতিটি জীব পরিবেশ থেকে অঙ্গিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। নিম্নলিখিত কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী অঙ্গিজেন ছাড়া শ্বসনক্রিয়া সম্পন্ন করে। তবে সকল ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষে দিন রাত্রি সব সময় শ্বসন কার্য ঘটে।

### পাঠ-২ জীবজগতে শুসন :

শুসন একটি অস্তঃকোষীয় বিগাক প্রক্রিয়া এবং উচ্চিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন সঙ্গীব কোষে শুসন প্রক্রিয়াটি মূলত একই। কিন্তু বিভিন্ন জীবের অঙ্গিজেন প্রক্রিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন পদ্ধতিটি তিনভাবে। উচ্চিদ দেহে শুসন কালে অঙ্গিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় অপেক্ষাকৃত সরল। উচ্চিদের কোনো নির্দিষ্ট শুসন অঙ্গ নাই। পাতার পত্ররস্ত, কাণ্ডের সেন্টিসেল এবং অস্তঃকোষের মাধ্যমে বায়ু দেহজ্যত্ত্বারে প্রবেশ করে। পানিতে নিমজ্জিত উচ্চিদগুলো সমষ্টি দেহতলের সাহায্যে অঙ্গিজেন শোষণ করে। প্রাণীদেহেও শুসন বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নানাভাবে সম্পর্ক হয়। নিম্নপ্রেগ্রিংর প্রাণীতে প্রধানত তৃক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে শুসন হয়। উন্নত প্রাণীদের শুসনে গ্যাসীয় বিনিময়ের জন্য বিশেষ ধরনের শুসন অঙ্গ আছে। যেমন— মাছ ও ব্যাঙ্গাচি ফুলকার সাহায্যে এবং স্থলজ মেরুদণ্ডীরা ফুসফুসের সাহায্যে শুসন সম্পর্ক করে।

### শুসনকালে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণ

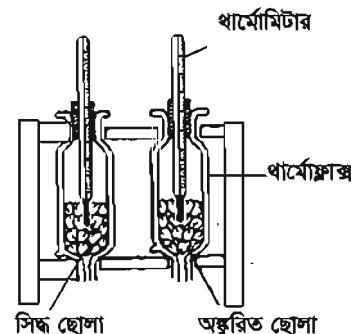
শুসনে যে শক্তি (তাপ) উৎপন্ন হয় তা নিম্নে বর্ণিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

**উৎপক্রমণ :** দুটি ধার্মোফ্লাক্স, দুটি ধার্মোমিটার, অঙ্কুরিত ছোলা বীজ, পানিতে সিক ছোলা বীজ ও ছিদ্রযুক্ত রাবারের ছিপি।

**পরীক্ষা :** অঙ্কুরিত ছোলা বীজগুলোকে একটি ধার্মোফ্লাক্সের মধ্যে রেখে একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়ে মুখটি বন্ধ করতে হবে। এরপর ছিপির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটি ধার্মোমিটার এমন ভাবে প্রবেশ করতে হবে, যাতে ধার্মোমিটারের পারদপূর্ণ প্রাণ্টটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজগুলোর মধ্যে প্রোটিন থাকে। অনুকূলপ্রভাবে অপর ধার্মোফ্লাক্সটিতে সিক ছোলা বীজগুলো রাখতে হবে এবং অপর ধার্মোমিটারটি স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি ধার্মোমিটারের পারদ রেখার অবস্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

**পর্যবেক্ষণ :** কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে জীবস্ত অঙ্কুরিত ছোলা বীজযুক্ত ধার্মোফ্লাক্সের উক্ততার বৃক্ষি ঘটায় ধার্মোমিটারের পারদ রেখার পরিবর্তন ঘটে। সিক বীজযুক্ত ধার্মোফ্লাক্সের উক্ততার বৃক্ষি হয়নি অর্থাৎ ধার্মোমিটারের পারদ রেখা অপরিবর্তিত আছে।

- জীবস্ত ছোলা বীজযুক্ত ধার্মোফ্লাক্সের ধার্মোমিটারের পারদ রেখার কেন পরিবর্তন ঘটে?
- এতে কী প্রমাণিত হলো?



চিত্র-৪.১: ছোলবীজে শুসনের পরীক্ষা

### পাঠ-৩ : প্রাণীর শুসন

আমরা নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রহণ করি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় আমরা কী গ্যাস প্রহণ ও ত্যাগ করি? প্রাণী ও উচ্চিদ বায়ু থেকে অঙ্গিজেন প্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। তাদের এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে সারাজীবন। তবে প্রাণী ও উচ্চিদের বেশায় গ্যাস প্রহণ ও বর্জন করার প্রক্রিয়া তিনি প্রকৃতির। উচ্চিদ পাতায় অবস্থিত স্টোমাট নামক এক প্রকার ছিদ্রের মাঠ্যমে অঙ্গিজেন প্রহণ করে। নিম্ন ও উচ্চপ্রেগ্রিংর প্রাণীর দেহে গ্যাসের আদান প্রদান ঘটে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের মাধ্যমে। যেমন— ফুলকা, ফুসফুস। যে অঙ্গগুলো শুসনকার্য চালানোর কাজে অংশ নেয় তাদের একত্রে শুসনতত্ত্ব বলে। মানব শুসনতত্ত্ব নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

১. নাসারক্তি ও নাসাপথ  
৪. শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া  
৭. মধ্যচন্দসা

২. নাসা গলবিল  
৫. ক্লোম শাখা বা ত্রুজ্জ্বাস

৩. স্বরযত্ন  
৬. কূসকূস

**১. নাসারক্তি ও নাসাপথ:** নাসিকা মুখগহণের উপরে অবস্থিত একটি ডিকোণামূলক প্রদৰ। এটি সামনে নাসিকা ছিল হতে পচাতে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা গর্দা দিয়ে এটি দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর সম্মুখভাগ লোম ও পচাত দিক বিহীন হারা আবৃত থাকে। আমরা নাক দিয়ে বে বায়ু প্রবেশ করি তাকে প্রাপ্তি হলে। অব্দিত বায়ুতে শুলিকণা, ক্লোমজীবাণু থাকলে তা এই লোম ও বিন্দিতে চাটকে থাকে।

**২. নাসা গলবিল :** নাসা গলবিল হলো নাসাপথের শেষ অংশ বা গলবিলের সাথে যুক্ত। গলবিল পথে শ্বাসনালিতে বাতাস প্রবেশ করে।

**৩. স্বরযত্ন :** গলবিল ও শ্বাসনালির সংযোগস্থলে স্বরযত্ন অবস্থিত। স্বরযত্নে স্বর সৃষ্টিকারী স্বররক্তু বা তোকামূল কর্তৃ থাকে। তাই একে স্বরযত্ন বলে। স্বরযত্নের মুখে একটা ঢাকনা থাকে। এটি খাদ্য প্রস্তুপের সময় স্বরযত্নকে দেকে রাখে, বাতে এতে খাদ্য চুক্তে না পাইয়ে আবার শ্বাস প্রস্তুপের সময় খুলে থাকে।

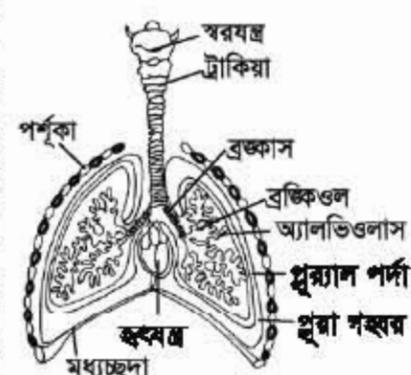
**৪. শ্বাসনালি:** খাদ্যনালির সম্মুখে অবস্থিত স্বরযত্ন থেকে শুরু হয়ে ক্লোম শাখা পর্যন্ত বিস্তৃত নালিকে শ্বাসনালি বলে। শ্বাসনালির মাধ্যমে বায়ু কূসকূসে প্রবেশ করে।



চিত্র-৪.২: নাসারক্তি ও নাসাপথ

**৫. ক্লোম শাখা বা ত্রুজ্জ্বাস:** শ্বাসনালি কূসকূসের কাছে এসে ভান ও বায় দুইটি শাখার বিভক্ত হয়ে ব্যথাকামে ভান ও বায় কূসকূসে প্রবেশ করে। এদেরকে ভান ও বায় ক্লোম শাখা বা ত্রুজ্জ্বাস (এক কলে ত্রুজ্জ্বাস) বলে। কূসকূসে প্রবেশ করার পর এই শাখার অস্ত্র্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। ধানেরকে ত্রুক্কিতে বলে। ত্রুজ্জ্বাসের গঠন শ্বাসনালির মতো।

**৬. কূসকূস :** বক্ষগহণের ভিতর দুইটি কূসকূস হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে অবস্থিত। এটা স্বাঙ্গের মতো নরম ও কোমল। ভান পাশের কূসকূসটি বায় পাশের কূসকূসের চেয়ে সামান্য কম। কূসকূস দুই ভাগবিশিষ্ট পুরু নামক একটি বিন্দু বা গর্দা হারা আবৃত। দুই ভাগের মধ্যে এক প্রকার পিণ্ডিত পদার্থ থাকে। কলে শ্বাস-প্রশ্বাস করে, কূসকূস ও বক্ষগহণের সাথে কোনো বর্দ্ধন নাইলে না। ত্রুজ্জ্বাস প্রতিপাদে কূসকূসে প্রবেশ করে অস্ত্র্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই সূক্ষ্ম ত্রুক্কিখন্দুগুলো বায়ুবালি বা বায়ুকে প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি বায়ুবালি পাতলা ঘ্যাপিয়েলিয়াল কোব হারা গঠিত। এ কোবগুলো কৈশিক জালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কোবগুলোতে বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেঙ্গলের মতো ফুলে উঠে ও প্রে আপনা আগনি



চিত্র-৪.৩: মানব শ্বাসক্ষমতা

কুঞ্চিত হয়ে যায়। বায়ুথলি ও কৈশিক জালিকা উভয়ের প্রাচীর এত পাতলা যে, সহজেই এগুলোর মধ্য দিয়ে বায়ু আদান-প্রদান করতে পারে।

**৭. মধ্যচ্ছদা :** যে মাংসপেশি বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে পৃথক করে রেখেছে তাকে মধ্যচ্ছদা বলে। এটা দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে। তখন বক্ষগহ্বরের আয়তন বাড়ে। আবার এটা যখন প্রসারিত হয় তখন উপরের দিকে উঠে এবং বক্ষগহ্বর সংকুচিত হয়। মধ্যচ্ছদা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

**নিজেরা কর :** চার্ট দেখে শ্বসনতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর এবং ফুসফুসের কাজ বর্ণনা কর।

**নতুন শব্দ:** শ্বাসনালি, বায়ুথলি, স্বরযন্ত্র, ব্রহ্মিওল, ব্রক্ষাস, গ্লোম শাখা ও অনুগ্লোম শাখা।

### পাঠ ৪-৬ : শ্বসন পদ্ধতি

আমরা নাক দিয়ে বাতাস নিই আবার ছেড়ে দিই। একেই আমরা সাধারণত শ্বসন বলে থাকি। আমাদের এ ধারণা ভুল। আমাদের বুক হাপের মতো অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এতে ফুসফুসের আয়তন বাড়ে ও কমে। ফুসফুস অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে অঙ্গিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এতাবে অবিরত অঙ্গিজেন নেওয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করাই শ্বাস ক্রিয়া নামে পরিচিত। এটা শ্বসনের একটি ধাপ। শ্বসন প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা – ১. বহিঃশ্বসন ও ২. অন্তঃশ্বসন।

**১. বহিঃশ্বসন :** যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে তাকে বহিঃশ্বসন বলে। এ পর্যায়ে ফুসফুস ও রক্ত জালিকা বা কৈশিক নালির মধ্যে অঙ্গিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় ঘটে। বহিঃশ্বসন দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা–

(i) প্রশ্বাস বা শ্বাস গ্রহণ : পরিবেশ থেকে আমরা যে অঙ্গিজেনযুক্ত বায়ু গ্রহণ করি একে শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস বলে। প্রশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছদা ও বক্ষপিঙ্গুরাস্থির মাঝের পেশি সংকুচিত হয়।

(ii) নিঃশ্বাস: প্রশ্বাসের পর পরই নিঃশ্বাস পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে মধ্যচ্ছদা ও পিঙ্গুরাস্থির পেশিগুলো শিথিল ও প্রসারিত হয় এবং ফুসফুস আয়তনে ছোট ও সংকুচিত হয়। ফলে বায়ুথলির ভিতরের বায়ু, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ফুসফুস থেকে ব্রক্ষাস ও ট্রাক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে নাসারম্ভ দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

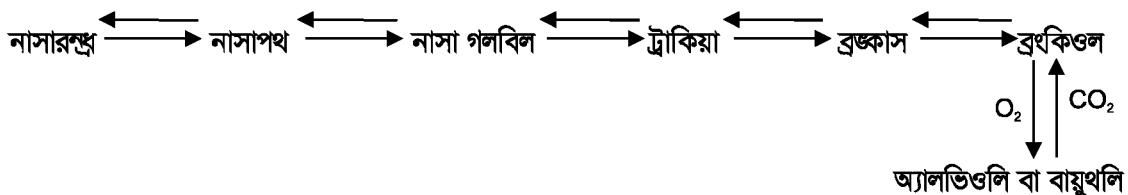
**নিজেরা কর**

তুমি তোমার সহপাঠীর নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস নেওয়া লক্ষ কর। মধ্যচ্ছদা চেপে রেখে এ কাজটি করার চেষ্টা কর। কী ঘটে? কেন ঘটে? তা ব্যাখ্যা কর।

**২. অন্তঃশ্বসন:** অন্তঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় দেহকোষস্থ খাদ্য অঙ্গিজেনের সাহায্যে জারিত হয়ে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে পরিণত হয়। ফুসফুসের রক্তে যে অঙ্গিজেন প্রবেশ করে তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের দূরবর্তী কৈশিকনালিতে পৌছায়। কৈশিকনালির গাত্র ভেদ করে আন্তঃকোষস্থ রস হয়ে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারপর এটি কোষের ভিতরের খাদ্যের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে শক্তি উৎপন্ন করে। এর ফলে তাপশক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে ফুসফুসে ফেরত আসে।

**নতুন শব্দ:** বহিঃশ্বসন, অন্তঃশ্বসন, প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস।

শ্বসনতন্ত্রের প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:



#### নিজেরা কর

বেশ কয়েকবার উঠাবসা কর অথবা দৌড়াও। তারপর ঘড়ি ধরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গণনা কর। দেখবে বিশ্বামুরত অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যত ছিল, পরিশ্রমের ফলে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার ছেট ভাইবোনদের প্রত্যেকের প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার গণনা কর।

#### পার্থ-৭ : শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগ

হাকিম সাহেবে যক্ষায় ভুগছেন। প্রফুল্ল বাবুর এ্যাজমা বা ইঁগানি। ছেট শিশু বিকাশের নিউমোনিয়া হয়েছে। এ রোগগুলোর কারণ কী? কী ধরনের সাধানতা গ্রহণ করলে তাদের এ রোগগুলো হতো না? এ রোগগুলোর প্রতিকার কী? এ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা জেনে নিলে রোগের আক্রমণ থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

#### যক্ষা

যক্ষা একটি অতি পরিচিত সংক্রামক রোগ। এ রোগ সহজে সংক্রমিত হয়। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে এবং অপুষ্টিতে ভোগে বা যক্ষা রোগীর সাথে বাস করে তারা এ রোগের শিকার হয়ে থাকে।

**কারণ:** এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই রোগ হয়।

#### লক্ষণ:

- দেহের গজন কমতে থাকে ও শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- খুসখুসে কাশি হয়, কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত পড়তে পারে।
- বিকালের দিকে অল্প জ্বর হয়, রাত্রে শরীরে ঘাম হয়।
- বুক বা পিঠে ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে পেটে অসুখ দেখা দেয়।

### প্রতিকার:

- রোগীকে পৃষ্ঠিকর খাবার দিতে হবে।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী, সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না।

### প্রতিরোধ:

- যক্ষা প্রতিষেধক টিকা হলো বি.সি.জি.। জন্মের পর থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুকে এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জন্মের পরপরই যত দ্রুত সম্ভব শিশুকে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।
- যক্ষা রোগীকে পৃথক রাখতে হবে। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো হাসপাতালে পাঠানো। এতে সুচিকিৎসা নিশ্চিত হয়।
- রোগীর কফ-থুতু মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার। কারণ এসবে অসংখ্য জীবাণু থাকে।
- ইঁচি-কাশির সময় মুখ বুমাল দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।
- যক্ষা রোগীর কাছে শিশুদেরকে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

### নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগলে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। হাম, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগের পরে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। শিশুদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

**কারণ :** এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

**লক্ষণ :** কাশি ও শ্বাস কষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় নাকের ছিদ্র বড় হয়। বেশি জ্বর হয়। কাশির সময় রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে।

**প্রতিকার:** অতিদ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর ঔষধ ও পথ্য খাওয়া দরকার। বেশি করে পানি ও তরল পদার্থ (স্যুপ, ফলের রস) পান করতে হবে। রোগীকে পৃষ্ঠিকর খাবার খাওয়াতে হবে।

**প্রতিরোধ:** শিশুদের হাম বা ব্রংকাইটিস হলে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

### ব্রংকাইটিস

শ্বাসনালির সংক্রমণকে ব্রংকাইটিস বলে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ধূলাবালি মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা এবং ধূমপান থেকে এ রোগ হতে পারে।

**কারণ :** এক ধরনের ভাইরাস থেকে এ রোগ হয়।

**লক্ষণ:** কাশি ও শ্বাস কষ্ট হয়। কাশির সাথে কফ থাকে। জ্বর হয়, রোগী ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে।

**প্রতিকার:** ধূমপান বন্ধ করা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

### ইঁপানি বা এ্যাজমা:

ইঁপানি ছোঁয়াচে বা জীবাণুবাহিত রোগ নয়।

**কারণ:** বিশেষ কোনো খাবার, বাতাসে উপস্থিত ধূলাবালি অথবা ফুলের রেণু প্রশাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ

করলে হাঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ সর্দি থেকে হাঁপানি হতে পারে।

**ব্যতিক্রম:** বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যায়।

**অক্ষণ:** হঠাত শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো হয়। রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে। ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমত অঙ্গিজেন সরবরাহ হয় না বা বাঁধাত্তাস্থ হয়। ফলে রোগীর কষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝের চামড়া ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। কাশির সাথে কখনো কখনো সাদা কফ বের হয়। জ্বর থাকে না। রোগী কোনো শক্ত খাবার খেতে পারে না। কখনো কখনো বমি হয়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

**প্রতিকার:** আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা। যে সকল জিনিসের সংস্পর্শে আসলে বা খেলে হাঁপানি বাঢ়ে, তা থেকে বিরত থাকা। যেমন- পশমি কাপড়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। ধোয়া, ধুলাবালি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা। ধূমপান পরিহার করা।

ঔষধ সেবনে শ্বাসকষ্টের কিছুটা লাঘব হয় বটে, কিন্তু রোগ পুরোপুরি ভালো হয় না। তাই শ্বাসকষ্ট লাঘবে রোগীর সাথে সব সময় ঔষধ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

### পাঠ-৮

তোমরা যষ্ঠ শ্রেণিতে সালোকসংশ্লেষণ সম্পর্কে জেনেছ। তোমরা পূর্বজ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিম্নের কাজটি কর।

**কাজ :** দলগত কাজের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের পার্থক্য লিখে একটি পোষ্টার কাগজে উপস্থাপন কর।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

শক্তির জন্য প্রতিটি জীবের শ্বসন অপরিহার্য।

**পত্ররন্ধ্র ও রক্ষীকোষ :** পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষগুলো পত্ররন্ধ্রকে খোলা বা বন্ধ রাখতে সাহায্য করে। রক্ষীকোষে ক্লোরোফিল থাকে। তাই দিনের বেলায় রক্ষীকোষে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে এবং এর ফলেই পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। প্রতিটি জীবে শ্বসন অপরিহার্য।

**বহিঃশ্বসন :** ফুসফুসের বায়ুথলি থেকে অঙ্গিজেন কৈশিকনালির রক্তে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্ত থেকে বায়ুথলিতে আসে। ফুসফুসের এই গ্যাসীয় আদান-প্রদানকে বহিঃশ্বসন বলে। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস এই দুই প্রক্রিয়া বহিঃশ্বসনের অন্তর্গত।

**অন্তঃশ্বসন :** কোমের মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে কতগুলো এনজাইমের নিয়ন্ত্রণাধীনে খাদ্যের সাথে অঙ্গিজেনের বিক্রিয়া ঘটে। এভাবে অন্তঃশ্বসন ক্রিয়া ঘটে।

**লসিকা :** এক রকম স্বচ্ছ, দ্বিতীয় মৃদু ক্ষারীয় পদার্থ। এটা এক ধরনের রূপান্তরিত কলারস।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ————— খাদ্য তৈরি হয় কিন্তু ————— খাদ্য জ্বরিত হয়।
২. জীবকোষের ————— নামক সাইটোপ্লাজমিয় অঞ্চাগুকে কোষের শক্তিশর বলে।
৩. ফুসফুস অসংখ্য ————— দ্বারা গঠিত।
৪. ————— একটি হোয়াচে রোগ।
৫. শ্বসন একটি ————— প্রক্রিয়া।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অভ্যন্তরীণ শ্বসন কাকে বলে?
২. নিটমোনিয়া রোগের কারণ ও লক্ষণ কী?
৩. শ্বসনের প্রয়োজনীয়তা উত্থাপন কর।
৪. বায়ুথলির কাছ উত্থাপন কর।
৫. উত্তির ও প্রাণিদেহে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি উত্তিরের শ্বসন অঙ্গের নয়?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ক. ত্বক     | খ. লেপ্টিসেল  |
| গ. রক্ষীকোষ | ঘ. প্রতিরক্তি |

২. নিম্নলিখিত প্রাণীরা শ্বাসকার্য চালায়—

- |                           |                               |                               |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| i. ফুলকা ও তুকের সাহায্যে | ii. ত্বক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে | iii. ফুসফুস ও ফুলকার সাহায্যে |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

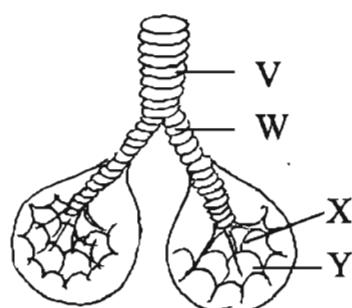
### নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. i      | খ. ii      |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

### উচ্চীগতি সক্ষ কর এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. W চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

- |                |              |               |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| ক. অ্যালভিওলাস | খ. ব্রুক্সাস | গ. ব্রুক্সিওল | ঘ. ট্রাকিয়া |
|----------------|--------------|---------------|--------------|



৪. উদ্বীপকের কোন অংশটিতে  $O_2$  ও  $CO_2$  এর বিনিময় ঘটে?

- ক. V      খ. W      গ. X      ঘ. Y

৫. V এর সত্ত্বমধ্যে কোন রোগ হয়?

- ক. এজমা      খ. ব্রাকাইটিস      গ. নিউমোনিয়া      ঘ. যক্ষা

### সূজনশীল প্রণালী

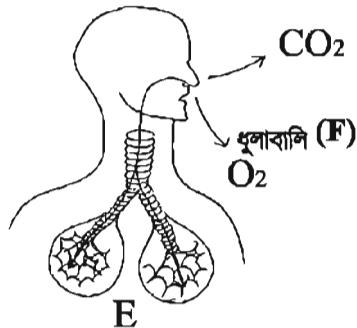
১।

ক. পুরা কী?

খ. নিউমোনিয়া একটি মারাত্মক রোগ- ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রে সংবিটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. F উপাদানটি E অংশে প্রবেশের ফলে সৃষ্টি সমস্যা প্রতিক্রিয়ার উপায়গুলো বিশ্লেষণ কর।



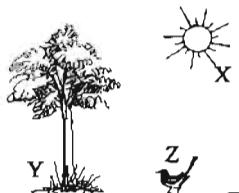
২।

ক. শ্বসন কী?

খ. পত্ররক্ষ কীভাবে শ্বসনে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর।

গ. Y ও Z এর মধ্যে কোনটি X এর উপাদান সরাসরি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্যাসীয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে E ও F কীভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল যুক্তিসহ লেখ।



### নিজেরা কর

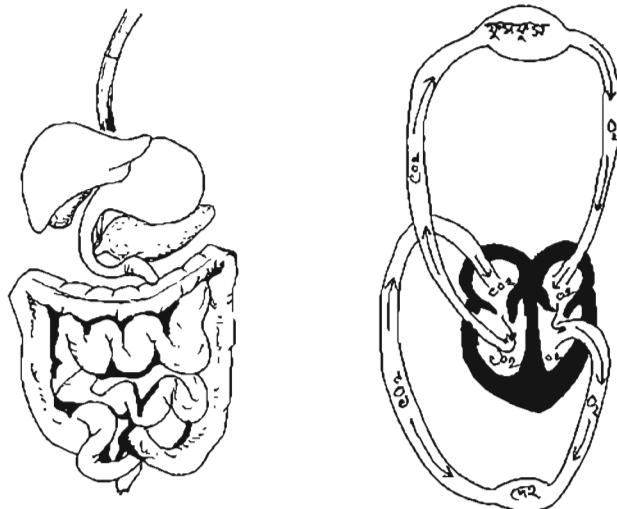
শ্বসনতন্ত্রের চিত্র একে চিহ্নিত কর। শ্বসনে ফুসফুসের গুরুত্ব আলোচনা কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

# পরিপাকতন্ত্র এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র

আমরা যে খাদ্য প্রহণ করি তাদের অধিকাংশই জটিল খাদ্য। এই জটিল খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের শরীর শোষণ করে সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জটিল, অদ্রবণীয় খাদ্যকস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় দেহের প্রহণ উপযোগী দ্রবণীয় সরল ও তরল খাদ্য উপাদানে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। যে তন্ত্র পরিপাকে অন্থ নেয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বা পরিপাক তন্ত্র বলে।

প্রাণিদেহের যাবতীয় জৈবনিক কাজের ক্ষমতম একক হলো কোষ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি কোষের প্রয়োজন অঙ্গিজেন ও খাদ্য। বিপাকের ফলে কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বস্তু তৈরি হয় যেগুলো অপসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ভন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। রক্ত সংবহনতন্ত্র এই যোগাযোগের কাজটি করে থাকে।



### এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা

- প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের ঝোপের কারণ ও ঝোপের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের ঝোপের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের ঝোপের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সকলকে সচেতন হতে উৎসুক করব।
- পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

- রক্ত ও রক্তকণিকার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত সংবহনতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পাঠ : ১ খাদ্য পরিপাক

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। আমরা কী কী খাদ্য খাই? খাদ্য কেন খাই? নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমরা তা জানার চেষ্টা করি।

ক. আমাদের দেহে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ. প্রধান তিন শ্রেণির খাদ্যগুলো কী কী?

গ. কীভাবে তিন শ্রেণির খাদ্য আমাদের দেহের চাহিদা মেটায়?

ঘ. ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা কী?

ঙ. হজম হয় না এমন আঁশযুক্ত খাবারের প্রয়োজনীয়তা কী? কী ধরনের খাবারে এটা পাওয়া যায়?

তোমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনেছে ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে আমরা দেহে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে তা জানব। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাদ্য গিলে ফেলার পর আমরা খাদ্যকে আর দেখতে পাই না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই খাদ্য পরিপাক হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, যা দেহ শোষণ করে নেয়। হজম না হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো দেহ থেকে মলরূপে বের করে দেয়। দেহের ভিতর খাদ্যের যে পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুস্থ দেহে এ কাজটি আপনা-আপনি ঘটে। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ উচ্ছিষ্ট হিসেবে পায়পথে বের করে দেওয়া এটুকুই আমরা দেখছি। এই দুটি ঘটনার মাঝখানে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটছে?

যে সকল অঙ্গ খাদ্যের এই পরিবর্তন ঘটাতে অংশ নেয় তাদেরকে একত্রে পৌর্ণিকতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র বলা হয়। আমরা যে খাবার খাই তার পরিপাক আরম্ভ হয় মুখগহ্বরে। মুখগহ্বরের ভিতর খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে তা আমরা নিম্নের পরীক্ষণ দ্বারা নিজেরা করে দেখতে পারি।

**কাজ:** পরীক্ষণটি করার জন্য দুজন ছাত্র/ছাত্রী দরকার। তাদের একজনের মুখে টোস্ট বিস্কুট বা শুকনো বুটি (সেদ্ব আলু বা ভাত) নিয়ে চিবাতে বলো। চিবানোর পর খাবারটুকু সরাসরি না গিলে কিছুক্ষণ মুখের ভিতর রেখে দিবে। অপর ছাত্রটি তা পর্যবেক্ষণ করবে। পরে দ্বিতীয় ছাত্রটিও নিজে এ কাজটি করবে। এবার প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয় ছাত্রটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। এবার তারা দুজনে মিলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

ক. খাবার চিবানোর সময় মুখগহ্বরের কোন কোন অংশ নড়েছিল?

খ. মুখের ভিতর বিস্কুট বা শুকনো বুটির টুকরোর কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল?

গ. চিবানোর পর খাদ্যটির স্বাদের কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল কি?

ঘ. বুটি বা বিস্কুটে কোন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে?

ঙ. খাদ্য গিলবার সময় তোমার দেহের কোন অংশটি নড়েছিল?

চ. খাদ্য গিলবার পর খাদ্য কোথায় যায়? কীভাবে যায়, লক্ষ কর।

নতুন শব্দ: পরিপাক ও খাদ্য উপাদান।

## পাঠ-২ : লালা ও এনজাইম

তুমি খুব মিষ্টি পছন্দ কর। তোমার সামনে এক থালা রসগোল্লা রাখা হলো। তোমার মুখের ভিতর কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি? তোমার মুখের ভিতর কোনো পানির মতো তরল পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করছ কি? তোমার ডান হাতটি ভাল করে সাবান দিয়ে ধূয়ে নাও। পরিষ্কার আঙ্গুল দিয়ে জিহ্বা থেকে কিছুটা তরল পদার্থ নাও। এর বর্ণ কেমন?

উপরের পরীক্ষা থেকে যা জানলাম তা নিম্নের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নেই। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাবার মুখে নিয়ে আমরা তা দাঁত দিয়ে চিবুতে থাকি। জিহ্বা খাবারগুলোকে নেড়েচেড়ে দেয় যেন এগুলো ভাল করে চিবানো যায়। মুখের মধ্যে ঐ খাবারগুলো লালার সাথে মিশ্রিত হয়। লালা একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থ। মুখের পেছনে অবস্থিত লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়। খাদ্য পরিপাকে লালার বিশেষ ভূমিকা আছে। লালা খাদ্যবস্তুকে পিছিল করে ও গিলতে সাহায্য করে। লালায় এক ধরনের অনুষ্টুক বা এনজাইম থাকে। তোমরা হয়তো ভাবছো এনজাইম কী? এনজাইম হলো :

- এমন একটি বস্তু, যা খাদ্যবস্তুর সাথে মিশে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কিন্তু নিজে অংশ নেয় না ও অপরিবর্তিত থাকে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত এনজাইম ভাল কাজ করে।
- নির্দিষ্ট এনজাইম নির্দিষ্ট কাজ করে। যেমন— ট্রিপসিন এনজাইম শুধুমাত্র আমিষের উপর ক্রিয়া করে।

লালার এনজাইম শ্বেতসারকে পরিবর্তন করে শর্করায় (মলটোজ) পরিণত করে। এ কারণে শর্করা জাতীয় খাবার চিবানোর পর কিছুক্ষণ মুখে রাখলে মিষ্টি লাগে। জিহ্বা আমাদের খাদ্যবস্তু গিলতে সাহায্য করে। মুখের শেষ প্রান্ত থেকে দুইটি নল আমাদের দেহের ভিতরের দিকে নেমে গেছে। এই নলের মতো অংশটিকে অন্ননালি বলে। এই নালি দিয়ে খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলিতে পৌছায়।

### খাদ্য কীভাবে পাকস্থলিতে পৌছায়

#### নিজেরা কর

একটি মার্বেল নাও। খেয়াল রাখতে হবে, নলের পরিধির চেয়ে মার্বেলটি যেন বড় হয়। মার্বেলটিকে নলের ভিতর প্রবেশ করাও। এবার মার্বেলের পেছনদিক ঠেলতে থাক। ওটা নলের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকবে। এভাবে খাদ্য অন্ননালির ভিতর দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অন্ননালিতে আর্থিত মতো গোল পেশি রয়েছে। এই পেশিগুলো সংকোচন ও প্রসারণ করতে পারে। খাদ্যবস্তুর পেছনে অন্ননালির পেশি সংকুচিত হয় এবং সামনে অন্ননালির পেশি প্রসারিত হয়। অন্ননালির এরূপ সংকোচন ও প্রসারণকে ক্রমসংকোচন বলে। এভাবে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যবস্তু ধীরে ধীরে পাকস্থলিতে পৌছায়।

### পাঠ ৩ – ৫ : পরিপাকতন্ত্র

আমরা আপেই হেনেছি জীবন ধরণের জন্য চাই খাদ্য। আমরা জালি খাদ্য খেতে থাকি। আমরা এও হেনেছি, জালি খাদ্য দেহকের সরাসরি প্রক্রিয়াতে সরল ও পানিতে প্রক্রিয়াত করা প্রয়োজন। এ কাজকে খাদ্যের হজমক্ষিয়া বা পরিপাক বলে। হজম করা সম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় শৌকিকবস্তি বা পরিপাকবস্তি এবং সাথে রয়েছে কচ্ছুলো আরক রস ও সাহায্যকারী এনজাইম নিঃসরণকারী পদ্ধি।

মুখস্থি, মুখগ্রহণ, অঙ্গবস্তি, পাকবস্তি, ক্ষয়ার এবং বৃদ্ধির নিয়ে শৌকিকবস্তি গঠিত। এছাড়া শৌকিকবস্তির সাথে রয়েছে বিভিন্ন এনজাইম বা আরক রস নিঃসরণকারী তিসটি পদ্ধি বৰ্তা: লালার্পিদ, অঞ্জাপিদ এবং বক্স। এছাড়া পাকবস্তি ও ক্ষয়ার্পণের পাচিয়েও আছে আরও এনজাইম ও আরক রস নিঃসরণকারী ক্ষম ক্ষম পদ্ধি।

আমাদের পরিপাকবস্তি বা শৌকিকবস্তি মুখগ্রহণ থেকে শুরু থেকে মসার পর্যন্ত বিস্তৃত। সিদ্ধে এ তেলজ্বর বিভিন্ন অঙ্গগুলোর বৰ্ণনা দেওয়া হলো:

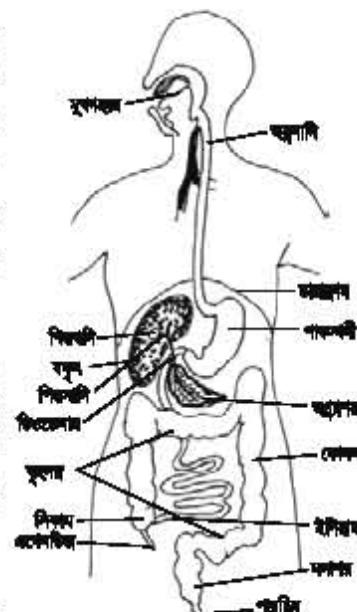
১. **মুখস্থি** : মুখস্থি থেকেই পরিপাকবস্তি শুরু। মুখস্থিটোর উপরে রয়েছে

উপরের ঠোট এবং নিচে রয়েছে নিচের ঠোট। ঠোটের খোলা ও ক্ষম থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াত প্রবেশ করে। এ ছিএ পথেই খাদ্য পরিপাকবস্তিতে প্রবেশ করে।

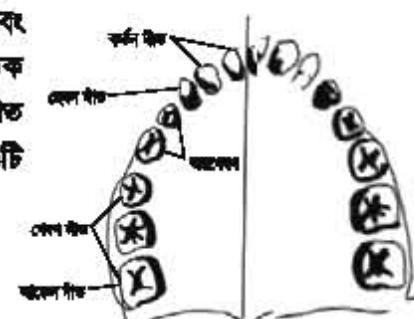
২. **মুখগ্রহণ** : মুখস্থিত্র পতেই মুখগ্রহণের অক্ষয়ন। সামনে দীক্ষিত সূচি তোলার দ্বারা মুখগ্রহণ বেরিত। এর উপরে রয়েছে তালু এবং নিচের নিকে রয়েছে মাসল জিহ্বা। এছাড়া দুই পাশে রয়েছে তিন জোড়া লালার্পিদ। সীত খাদ্যবস্তু কেটে ছেট করে পেষণে সাহায্য করে। এসময় জিহ্বা খাদ্যবস্তুর স্বাদ প্রক্রিয়া এবং খাদ্যবস্তুকে বার বার সীতের নিচে পাঠিয়ে চিবাতে সাহায্য করে।

লালার্পিদ থেকে নিঃসৃত লালা খাদ্যকে পিছিল করে এবং খাদ্যবস্তুকে পিলতে সাহায্য করে। লালা রসে এক ধরনের উৎসুচক বা এনজাইম আছে, যা পেষণকারী আধিক তেকে পর্যবেক্ষণ পরিপন্থ করে। মানুষের স্বার্গী সীতের সংখ্যা ৩২টি। প্রতি তোলালে ১৬টি কার থাকে। এসব সীত চার প্রকার। বৰ্তা—

- I. কর্তন সীত খাবার ছেট ছেট করে কাটে।
  - II. হেসন সীত দিয়ে মাসল ও অন্যান্য শক্ত জিনিস ছিঁড়ে ও কাটে।
  - III. অহসেবণ সীত দিয়ে খাদ্যবস্তু চৰ্বণ ও পেষণ করা যায়।
  - IV. পেষণ সীতগুলো খাদ্যবস্তু চিবাতে ও পিলতে সাহায্য করে।
- এ ছাড়া অন্যান্য সীতের অনেক পত্র গুজার আকেল সীত।



চিত্র-৩.১ : শৌকিকতন্ত্র



চিত্র-৩.২ : বিভিন্ন অক্ষর সীত

**৩. গলবিল :** মুখগহরের পরেই এর অবস্থান। এর মাধ্যমেই খাদ্যবস্তু মুখগহর থেকে অনুনালি বা গ্রাসনালিতে যায়। গলবিলে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। তাই এখানে কোনো খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না।

**৪. অনুনালি :** গলবিল ও পাকস্থলীর মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। খাদ্যবস্তু এর ভিতর দিয়ে গলবিল থেকে পাকস্থলিতে যায়।

**৫. পাকস্থলি :** অনুনালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। গলবিল ও অনুনালির ক্রমসংকোচনের ফলে পিছিল খাদ্যবস্তু এখানে এসে জমা হয়। পাকস্থলির আকৃতি থলির মতো। এর প্রাচীর বেশ পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলির প্রথম ও শেষ অংশে পেশিবহুল রয়েছে। পাকস্থলির প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রস্টি নামে প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এখানে খাদ্য সাময়িক জমা থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পাচক রস পরিপাকে সাহায্য করে।

**৬. ক্ষুদ্রান্ত্র :** ক্ষুদ্রান্ত্র হলো পাকস্থলির পরবর্তী অংশ, এটা পরিপাকনালির সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা – (ক) ডিওডেনাম (খ) জেজুনাম ও (গ) ইলিয়াম।

(ক) ডিওডেনাম : এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ। পাকস্থলির পরের অংশ, দেখতে ট আকৃতির। পিন্তুথলি থেকে পিন্তুরস এবং অঞ্চল থেকে অঞ্চল রসনালির মাধ্যমে এখানে এসে খাদ্যের সাথে মিশে। এ রসগুলোও পরিপাকে অংশ নেয়। এখানে আমিষ, শর্করা ও দ্রেহ পদার্থের পরিপাক ঘটে।

(খ) জেজুনাম : এটা ডিওডেনাম এবং ইলিয়ামের মাঝের অংশ।

(গ) ইলিয়াম : এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ। ইলিয়ামের ভিতরের প্রাচীরে শোষণ যন্ত্র থাকে। ব্যাপন পদ্ধতিতে শোষণকার্য সমাধার জন্য প্রাচীরগাত্রে আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। এদের ভিলাই (ভিলাস) বলে। হজমের পর খাদ্যের সারাংশ ভিলাসগত দ্বারা শোষিত হয়।

**৭. বৃহদন্ত্র :** ক্ষুদ্রান্ত্রের পরেই বৃহদন্ত্রের শুরু। এটা ইলিয়ামের পর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি তালু বা কপাটিকা থাকে। লম্বায় এটা ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ছোট। কিন্তু ভিতরের ব্যাস ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের ব্যাস থেকে বড় থাকে। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা – (ক) সিকাম (খ) কোলন এবং (গ) মলাশয়। মলাশয় বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্ত। দেখতে কতকটা থলির মতো। খাদ্যের অপাচ্য বা অহজমকৃত অংশ এখানে মলরূপে জমা হয়।

**৮. মলাশয় :** পায়ু পরিপাকনালির শেষ প্রান্ত। এই প্রান্ত পথেই পরিপাক নালি দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

#### পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাকগ্রন্থির কাজ

পরিপাকনালির যেসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদের পরিপাকগ্রন্থি বলে। তোমরা আগেই জেনেছ লালগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অঞ্চল পরিপাক গ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত। লালগ্রন্থি থেকে লালা ক্ষরণ হয়। লালায় এনজাইম ও পানি থাকে। পানি খাদ্যকে নরম করে। লালার এনজাইম হলো টায়ালিন।

**যকৃৎ :** দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃৎ। যকৃৎ থেকে পিন্তুরস তৈরি হয়। পিন্তুরস পিন্তুথলিতে জমা থাকে। হজমের সময় পিন্তুনালি দিয়ে পিন্তুরস ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মিশে। পিন্তুরস স্নেহ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

**অঘ্যাশয় :** প্রধানত তিনটি এনজাইম অঘ্যাশয়ে তৈরি হয়। যথা—অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন এবং লাইপেজ ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন আমিষ খাদ্য, লাইপেজ স্নেহ খাদ্য এবং অ্যামাইলেজ শর্করা জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

**গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি:** গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলির ভিতরের প্রাচীরে থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস।

**আল্ট্রিক গ্রন্থি:** ক্লুডেন্সের প্রাচীরে ভিলাসে প্রচুর আল্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম আল্ট্রিক রস।

**বৃহদত্ত্ব :** বৃহদত্ত্বে খাদ্য হজম হয় না। এখানে কোনো জারক রস বা এনজাইম তৈরি হয় না। বৃহদত্ত্ব মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে। এ কাজটি অত্যন্ত দরকারি। এতে শরীর থেকে পানি বেশি পরিমাণে বের হওয়া রোধ করে।

বৃহদত্ত্বের সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ মলাশয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ মল হিসাবে সঞ্চিত হয়। প্রয়োজনমতো পরে পায়ু দিয়ে তা শরীরের বাইরে বর্জিত হয়।

**নতুন শব্দ:** পাকস্থলি, অঘ্যাশয়, যকৃৎ, ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ।

## পাঠ-৬ : সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

**১. গ্যাস্ট্রোইটিস :** সাধারণত বেশি মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খেলে, খাওয়ায় অনিয়ম করলে বুক জ্বালা আর অস্ফল হয়। এতে পেটে বাড়তি এসিড তৈরি হয় আর তা থেকে পেট বা বুকের মাঝখানে একটা অস্ফিতি বা জ্বালার ভাব হয়। গলা ও পেট জ্বালা করে এবং পেটে ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মত এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে পাকস্থলি ও অস্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে। নিয়মিতভাবে কম মসলা ও কম তেলযুক্ত খাবার খাওয়া এবং সময়মত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

**২. আমাশয় :** আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। দুই ধরনের আমাশয় দেখা যায়। যথা—  
(ক) অ্যামিবিক আমাশয়ঃ প্রধানত এন্টামিবা নামে এক প্রকার এককোষী প্রাণী মানুষের অস্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। এ রোগের উপসর্গগুলো হলো— তলপেটে ব্যথা, মলের সাথে রক্ত বা শ্লেষ্মা বের হওয়া। নলকূপের পানি বা ফুটানো পানি পান, পানি ও শাকসবজি যাতে দুষ্প্রিয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। মাছি, আরশোলা থেকে খাদ্যবস্তুকে রক্ষার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

(খ) ব্যাসিলারি আমাশয় : সিগেলা নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া অক্রকে আক্রমণ করলে এ ধরনের আমাশয় হয়। জীবাণু বৃহদত্ত্বের বিহিনীকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা বের হয়। অনেক সময় এর সাথে রক্তও যায়। এজন্য এ রোগকে রক্ত আমাশয় বলে। এ রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**৩. কোষ্টকাঠিন্য :** কোষ্টকাঠিন্য প্রক্রিয়াক্ষে কোনো ঝোগ নয়। বিভিন্ন কারণে কোষ্টকাঠিন্য হতে পারে। যেমন— পৌষ্টিকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন ধীর হওয়া, কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি না খাওয়া, পায়খানার বেগ পেলে সহজে সহজে পায়খানায় না কসা ইত্যাদি। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা, নিয়মিত শাকসবজি খাওয়া, ফলমূল ও আশ্বস্তু খাবার খাওয়ার মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা যায়।

**কাজ:** শিক্ষার্থীরা খাতায় পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন খোগের নাম লিখবে। দলে বিভিন্ন হয়ে শিক্ষার্থী কী কারণে এ রোগগুলো হয় তা খাতায় লিপিবদ্ধ করবে। প্রতিটি দলের একজন করে তা প্রেরিতে উপস্থাপন করবে। অন্যরা বিষয়গুলো মিলিয়ে নিবে।

### পরিপাকতন্ত্রের যত্ন

- ১। **দীত:** প্রতিবার খাওয়ার পর দীত ত্রাশ করা ও পরিষ্কার করা উচিত। দীতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে থাকলে তা পচে মুখে দুর্গম্ব হয়। দীতের ক্ষয় হয়। খুব বেশি মিষ্টি খেতে নেই। মিষ্টি দীত ক্ষয়ের জন্য দায়ী।
- ২। **খাদ্যবস্তু:** খাদ্যবস্তু পরিষ্কার ও সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। বাসি গচা খাবার খাওয়া উচিত নয়। আঙ্গুলের নখ ছোট রাখা এবং খাওয়ার আগে থালাবাটি ও হাত অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- ৩। **খাওয়া:** নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া উচিত। একসাথে বেশি খাবার খাবে না। সব সময় সুষম খাবার খাবে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রচুর পানি খাবে। সব সময় পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খাবে। খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খাবে। অধিক মসলা ও তেজমুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়।

**নতুন শব্দ:** কোষ্টকাঠিন্য, ব্যাসিলারি আমাশয় ও অ্যামিবিক আমাশয়

### পাঠ ৭-৮ : রক্ত সংবহন তন্ত্র

যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে রক্ত পরিবহনের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে সংবহন প্রক্রিয়া বলে। রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং লসিকা ও লসিকাবাহী নালির সমন্বয়ে মানব দেহের সংবহনতন্ত্র গঠিত। যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তবাহী নালির সমন্বয়ে রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

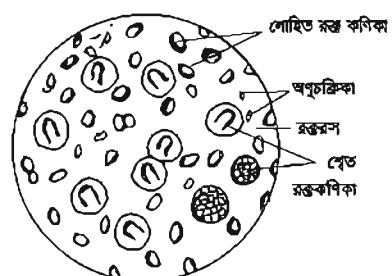
#### রক্ত ও রক্তের উপাদান

তোমরা মূরগি, গরু অথবা ছাগল জ্বাই করতে দেখে থাকবে। জ্বাই করার সময় ক্ষতস্থান থেকে ফিল্মি দিয়ে রক্ত বের হয়। এই রক্তের রক্ত কেমন? রক্ত কী ধরনের পদার্থ? রক্ত ঘন লাল রক্তের একটি তরল পদার্থ। এটি এক ধরনের তরল যোজক কলা বা চিস্য। রক্তের স্বাদ ক্ষারধর্মী। রক্তের উপাদান দুইটি, যথা—

১। **রক্তরস**

২। **রক্তকণিকা**

- ১। **রক্তরস:** রক্তরস রক্তের তরল অংশ। সাধারণত রক্তের শতকরা ৫৫ ভাগ রক্তরস। এতে আমিষ, লবণ ও অৱ থেকে শোষিত খাদ্য উপাদান থাকে। রক্তরসে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এতে ফাইব্রিনোজেন নামে একটি উপাদান থাকে যা রক্ত জমাটি বাঁধতে সাহায্য করে।



চিত্র- ৫.৩ : রক্তের উপাদান

**কাজ :**

- ১। রন্তরস দেহের বিভিন্ন অংশে অঙ্গিজেন, খাদ্যসার, হরমোন ইত্যাদি বহন করে।
- ২। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ (যেমন-কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইটরিয়া, ইটরিক এসিড ইত্যাদি) বহন করে বিভিন্ন রেচন অংগের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়।

**২। রন্তকণিকা :** রন্তে তিনি ধরনের কণিকা রয়েছে। যথা-

**ক. লোহিত রন্তকণিকা**

**খ. শ্বেত রন্তকণিকা**

**গ. অণুচক্রিকা**

**ক. লোহিত রন্তকণিকা :** লোহিত রন্ত কণিকার জন্য রন্তের রঙ লাল দেখায়। এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিনের সাথে অঙ্গিজেন যুক্ত হয়ে দেহকোষে পৌছায়। লোহিত রন্তকণিকা উভঅবতল (উভয় পৃষ্ঠে খাদ আছে)। চাকতির মতো গোলাকার কোষ। লোহিত রন্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। লোহিত রন্তকণিকা যকৃত ও অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়।

**খ. শ্বেত রন্তকণিকা:** শ্বেত রন্তকণিকা লোহিত রন্তকণিকার চেয়ে আকারে কিছুটা বড় ও অনিয়মিত আকারের হয়। এদের নিউক্লিয়াস আছে। প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় এদের জন্ম। দেহে কোনো রোগ-জীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেত রন্তকণিকা সেগুলোকে ধ্বংস করে। শ্বেত রন্তকণিকা দেহের প্রহরীর মতো কাজ করে। এদের সৈনিকের সাথে তুলনা করা হয়।

**গ. অণুচক্রিকা :** অণুচক্রিকা দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মতো। এরা লোহিত রন্তকণিকার চেয়ে আকারে ছোট হয় ও নিউক্লিয়াস থাকে না। এরা গুচ্ছাকারে থাকে। এদের উৎপত্তি লোহিত অস্থিমজ্জায়। দেহের কোনো অংশ কেটে রন্তপাত ঘটলে অণুচক্রিকা রন্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এদের প্লেটলেটও বলে।

**রন্তের কাজ :** রন্ত আমাদের দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। রন্ত দেহে নানা রকম কাজ করে। যথা-

**১. খাদ্য পরিবহন :** আমরা যে খাবার খাই, পরিপাকের পর এগুলো সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং রন্তের সাথে মিশে যায়। রন্ত সেই খাদ্যের সারাংশকে দেহের সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে দেহের কোষগুলোর পুষ্টি সাধন হয়।

**২. অঙ্গিজেন পরিবহন :** আমাদের দেহে সকল কাজের জন্য অঙ্গিজেন দরকার। অঙ্গিজেন না হলে জীবকোষ বাঁচতে পারে না। কাজেই খাবারের সাথে সাথে এদের দিতে হয় অঙ্গিজেন। রন্তের লোহিত রন্তকণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অঙ্গিজেন গ্রহণ করে। অঙ্গিহিমোগ্লোবিন রূপে প্রতিটি কোষে বহন করে।

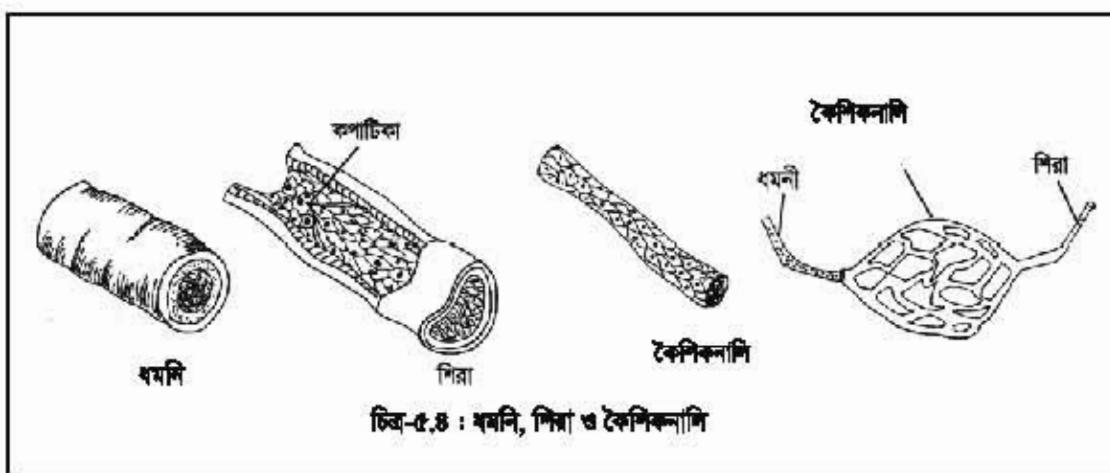
**৩. কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন :** রন্তরস দেহের বিভিন্ন অংগের কোষগুলোতে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়।

**৪. বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন :** দেহে সৃষ্টি নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত দুষ্পুর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেওয়ার কাজে সহায়তা করে।

৫. গ্রোগ প্রতিরোধ : দেহে কোনো গ্রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা সেগুলোকে মেডে কেলে গ্রোগ প্রতিরোধ করে।
  ৬. হারমোন পরিবহন : দেহের নালিহীন অঞ্চলে হরমোন উৎপন্ন হয়। রক্তের মাধ্যমে হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।
  ৭. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ : রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশের তাপ পরিবহন করে। এতে দেহের সর্বজ্ঞ তাপমাত্রা টিক থাকে।
  ৮. রক্ত জর্মাট বাধা : দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে রক্তপাত হয়। অণ্ডক্রিকা রক্ত জর্মাট বৈধাতে সাহায্য করে। কলে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- সমূল শব্দ :** সোভিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা, অণ্ডক্রিকা, রক্তপাত, হরমোন ও নালিহীন প্রাণী।

### পাঠ-৯-১০ : রক্তনালি

তোমার হাতের উপর দিক লক করলে দেখতে পারবে নীল রক্তের এক ধরনের নালি দেখা যাব। এগুলো হল শিরা। শিরা এক ধরনের রক্তনালি। রক্তনালি কী? যে নালির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে রক্তনালি বলে। আমাদের দেহে তিনি ধরনের রক্তনালি আছে। বধি— ১. ধমনি ২. শিরা ও ৩. কৈশিকনালি।



১. ধমনি : যে সকল রক্তবাহী নালি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বহন করে, তাকে ধমনি বলে। এরা দেহের ডিকের দিকে অবস্থিত। ধমনির পাঁচির পুরু, গহুর ছেট এবং এর গহুতে কপাটিকা থাকে না। ধমনি অঙ্গজোন সমূহ রক্ত পরিবহন করে।

২. শিরা : যে সকল রক্তনালি ঘাঁঠ দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে কিন্তে আসে তাকে শিরা বলে। শিরা পাঁচির অপেক্ষাকৃত পাতলা। এদের গহুরাটি বড় ও গহুতের পাঁচিরগাছে কপাটিকা থাকে। দেহের কৈশিক অঙ্গিকা থেকে শিরার উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু ব্যাডিক্রম ছাড়া শিরা সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডের রক্ত বহন করে।

৩. কৈশিকলালি : ধমনি ক্ষমতায়ের শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষে পর্যবেক্ষণ অভিসূচ মালি তৈরি করে। এই সকল সূচনালালিকে কৈশিকলালি বা কৈশিক অভিক্ষ বলে। কৈশিকলালি থেকে শিরায় উৎপন্ন। এক স্তরবিশিষ্ট পাতলা এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে কৈশিকলালিক প্রাচীর গঠিত। কৈশিকলালি দেহকোষের চারপাশে অবস্থান করে।

নিজেরা কর : তোমরা নিচের ছকটি পুরুষ করে ধমনি ও শিরায় পর্যবেক্ষণ নির্ণয় কর।		
উৎপন্নি	ধমনি	শিরা
কণাটিকা		
গহুর		
প্রাচীর		
অঙ্গীকেনের পরিমাণ		
কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ		

### হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ড বক্ষগহুরের বাম দিকে দুই ক্ষুস্কুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি মোচাকৃতির অংশ। এটা পেরিকার্ডিয়াম নামে দুই স্তরবিশিষ্ট একটি পাতলা পর্ণ দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি দ্বারা পর্যটিত। হৃৎপেশি এক ধরনের স্বাধীন অনৈক্ষিক পেশি, যা কাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া নিজেই সংকেচন ও ফ্রায়ারণে সক্ষম। প্রতি ঘণ্টিটে ক্ষয়বেশি ৭২ বার হৃৎপিণ্ড সংকেচিত ও ফ্রায়ারণ। তুমি তোমার কুকের মাঝখানে হাত রাখ। একটা ধূকশুকালি বা কোনো স্পন্দন দের পাছ কী? কেন এমন ঘটে? হৃৎপিণ্ডের সংকেচন ও ফ্রায়ারণের ফলে এইরূপ ঘটে। এটা হৃদস্পন্দন।

**নিজেরা কর :** তুমি যত্নে দেখে তোমার বক্ষুর হৃদস্পন্দন সংযোগ কর।

হৃৎপিণ্ড তিন স্তরে গঠিত। বৰ্ধ- ক. বাইজের স্তর বা এপিকার্ডিয়াম বা মাঝের স্তর বা মাঝোকার্ডিয়াম এবং গ. ক্লিপের স্তর বা এঙ্গোকার্ডিয়াম। এসের মধ্যে মাঝোকার্ডিয়ামই সবচেয়ে পুরু এবং এর সংকেচনের কারণে হৃৎপিণ্ড পার্শ্ব করে রক্ত সংকেচন করে।

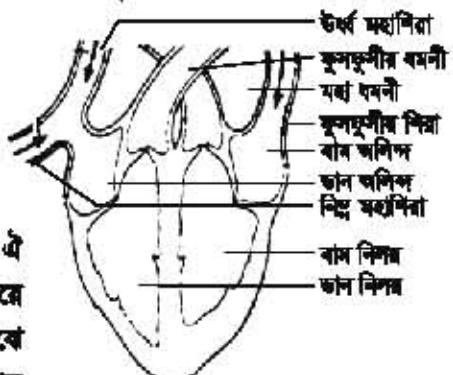
হৃৎপিণ্ড একটি চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট কৌশ অংশ। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ দুটির নাম ভান অলিস ও বাম অলিস এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুইটি বর্ধাকরে ভান ও বাম নিলয়।

অলিসে প্রাচীর পাতলা ও নিচেরে প্রাচীর পুরু থাকে।

অলিস ও নিলয় দুইটি আলাদা প্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকে।

আবার অলিসগুলো নিচেরে ঢেরে আকারে ছেঁটি হয়।

ভান অলিস ও ভান নিলয়ের মাঝে ভান অলিস-নিলয় ছিপ থাকে। এই ছিপখে কণাটিকা থাকে। রক্ত এ ছিপখে অলিস থেকে নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে বাম অলিস ও নিলয়ের মাঝে কণাটিকা থাকে। একেও বাম অলিস থেকে রক্ত কেবল মাঝ



চিত্ৰ-৫৫: হৃৎপিণ্ডের গঠন

নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া মহাধমনি ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে ও ফুসফুসীয় ধমনি এবং ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা রয়েছে। এ কপাটিকাগুলো রন্ত্রের গতিপথ একদিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**নিজেরা কর :** একদিন সাগরের বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়েছিলেন। সাগরের বড় ভাই একজন ডাক্তার। ভাইয়া বাবার হাতের কবজির উপর হাত রেখে হাত ঘড়ি দেখছিলেন। সাগর বিষয়টি লক্ষ করল। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভাইয়ার কাছে জানছে চাইল বাবার কবজির উপর হাত রেখে তিনি কী পরীক্ষা করছিলেন। হাতের উপরের দিকে যে রক্তনালিগুলি দেখা যায় ওগুলোকে কী বলে? ভাইয়া তার প্রশ্নের জবাবে বললেন, তিনি বাবার নাড়ির স্পন্দন দেখছিলেন। নাড়ি স্পন্দন কী? হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ধমনির মধ্যে যে স্পন্দন স্ফীটি হয় তাকে নাড়ি স্পন্দন বলে। ধমনি থাকে দেহের ভিতরে আর শিরা থাকে দেহের উপরিভাগে।

এবার তুমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। তার হাতের শিরাগুলো পর্যবেক্ষণ কর। তোমার বন্ধু তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করবে। এবার তুমি স্কুলের মাঠে পাঁচ মিনিট দৌড়ে আস। তুমি তোমার বন্ধুকে তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে বলো। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ বেড়ে যায় ফলে নাড়ির স্পন্দনও বৃদ্ধি পায়।

### হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রন্ত্র সঞ্চালন :

হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। যখন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন হয় তখন হৃৎপিণ্ড থেকে রন্ত্র ধমনি পথে বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। আবার হৃৎপিণ্ডে যখন প্রসারণ ঘটে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রন্ত্র শিরা পথে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এভাবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা রন্ত্র একবার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে আবার হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয়।

নতুন শব্দ: কপাটিকা, ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি, অঙ্গিদ ও নিলয়

### পাঠ ১১-১২ : হৃদরোগ

আমান সাহেব একজন ব্যাংক কর্মচারী। তিনি একজন মাঝারি গড়নের মোটাসোটা মানুষ। তিনি মাছ-মাছ্স ও তেলযুক্ত খাবার থেতে খুব পছন্দ করেন। তিনি একজন ধূমপায়ী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করেন। পরিশ্রমের সাথে মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করেন। সারা দিন ইঁটাচলা, ব্যায়াম হয় না বললেই চলে। হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে বুকের বাম দিকে ব্যথা অনুভব করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা তীব্র হলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী তৎক্ষণাতে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন যে, আমান সাহেব হৃদরোগে ভুগছেন। এবার বলতো হৃদরোগের কারণগুলো কী কী?

### হৃদরোগের কারণ :

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা হৃদরোগের যে কারণগুলো জানতে পারলাম তা হলো:

- অধিক তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ।

- সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা।
- ধূমপান করা।
- অতিরিক্ত পরিশ্রম করা।
- খেলা, ইঁটাচলা, ব্যায়াম বা কোনো রকম শারীরিক পরিশ্রম না করা।

**হৃদরোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় :**

- ১। অধিক শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া।
- ২। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা। যথা— খেলাধুলা, ইঁটাচলা, ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- ৩। নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
- ৪। ধূমপান ত্যাগ করা। ধূমপানের ফলে ধর্মনিগাত্র শক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।
- ৫। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও দুচিন্তাযুক্ত থাকার চেষ্টা করা।
- ৬। তাজা ফলমূল, শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- ৭। দেহের ওজন বাঢ়তে না দেওয়া। দেহের ওজন বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের উপর রক্ত সঞ্চালনের চাপ পড়ে। ফলে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

**নিজেরা কর :** হৃৎপিণ্ডের চিত্র অঙ্কন কর। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতিপথ চিহ্নিত কর। কীভাবে হৃদরোগ রোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় এমন একটি চার্ট তৈরি কর।

**এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম**

**ধমনি :** ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের সকল অঙ্গে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় ধমনি কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে নিয়ে যায়।  
**শিরা:** শিরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় শিরা এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় শিরাপথে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বাম অঙ্গে নিয়ে আসে।

**লোহিত কণিকা :** লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে।

**অণুচক্রিকা :** অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

### অনুশলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর**

১. এনজাইম \_\_\_\_\_ সাহায্য কর।
২. \_\_\_\_\_ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়।
৩. লোহিত কণিকায় \_\_\_\_\_ নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে।

৪. ————— রক্ত জ্বাট বাঁধতে সাহায্য করে।
৫. ————— কণিকা দেহে প্রহরীর মতো কাজ করে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিপাক হওয়া খাদ্য কোথায়, কীভাবে, শোষিত হয়?
২. দীর্ঘ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. মুখ দিয়ে পাকস্থলিতে কীভাবে খাদ্য যায় কর্ণলা কর।
৪. গোমার দেহে রক্তকণিকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৫. রক্তনালি আমাদের দেহে কী কাজ করে?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?
  - ক. অগ্নিশয়
  - খ. আত্মিক গ্রন্থি
  - গ. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি
  - ঘ. যকৃৎ
২. সালায় ধাকে কোনটি?
 

ক. টায়ালিন ও পানি	খ. ট্রিপসিন ও পানি
গ. লাইপেজ ও পানি	ঘ. অ্যামাইলেজ ও পানি

উচ্চীপক্ষটি শক্ত কর এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত ধাকে—
  - i. M, N
  - ii. N, O
  - iii. O, M

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. i ও iii

৪. P চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে—

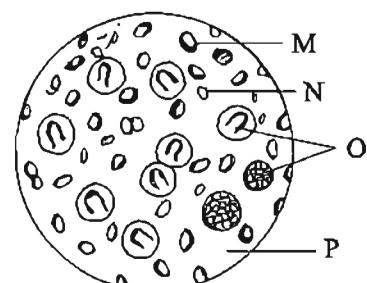
- i. খাদ্যসার বহন করা
- ii. প্রহরী হিসেবে কাজ করা
- iii. বর্জ্য নির্গমনে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৫. কোনটি রক্ত জ্বাট বাঁধতে সাহায্য করে?

- ক. M
- খ. N
- গ. O
- ঘ. P



### সূজনশীল প্রশ্ন

১।

ক. ভিলাই কী?

খ. খোড়ার পর দাঁত ব্রাশ করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. Y চিহ্নিত অংশটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Z অংশটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে মানবদেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে?

ব্যাখ্যা কর।



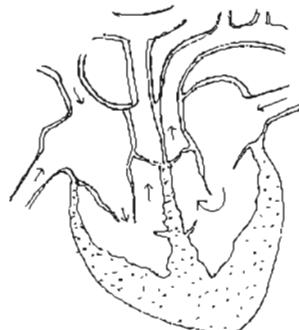
২।

ক. পেরিকার্ডিয়াম কী?

খ. লাইপেজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে তীর চিহ্নিত পথে কীভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গটি সুস্থ রাখার জন্য আমাদের কেন সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত, তা যুক্তিসংহ লেখ।



### নিম্নেরা কর

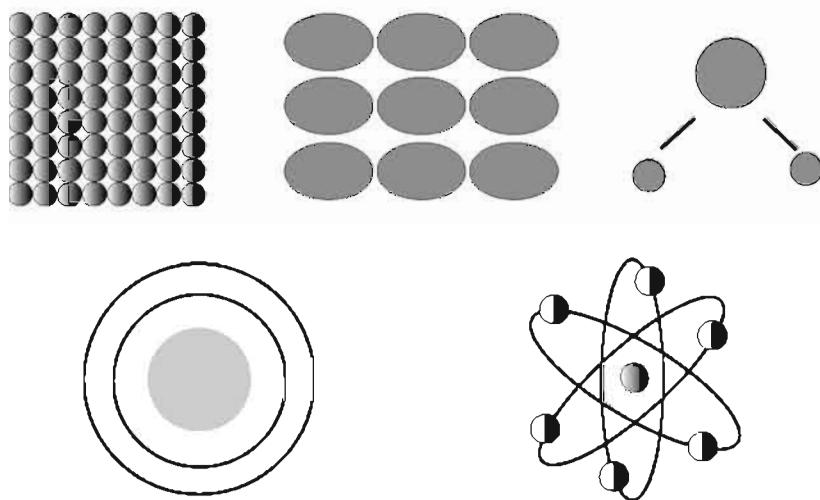
১. ভূমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন কীভাবে পরীক্ষা করবে? ব্যায়াম করার পর তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছো কি? পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. তোমরা দলগতভাবে মানব পরিপাকতন্ত্রের একটি চার্ট তৈরি কর এবং প্রতিটি অঙ্গের পাশে এর কাজ লিপিবদ্ধ কর।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# পদার্থের গঠন

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়ু, পানি, শোষা, খাদ্যস্রব্য, বইপুস্তক, চক ইত্যাদি নানা রূপে জিনিস বা পদার্থ ব্যবহার করি। এদের মধ্যে কোনোটি মৌলিক পদার্থ, কোনোটি ঘোষিক পদার্থ আবার কোনোটি বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ। প্রতিটি পদার্থ কী দিয়ে তৈরি বা এদের গঠন কেমন ও কীভাবে তৈরি হয় তা কি তোমরা জান?



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- মৌলিক, ঘোষিক ও মিশ্র পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- প্রতীক ও সংকেত থেকে নির্বাচিত মৌলিক ও ঘোষিক পদার্থ চিনতে পারব।
- সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।

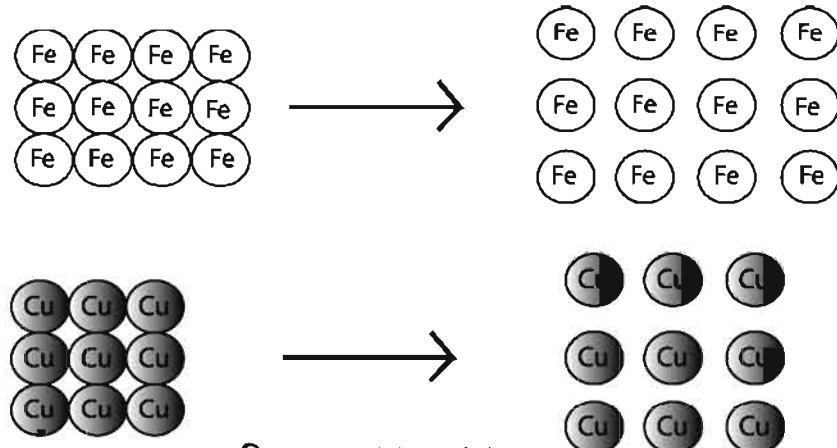
## পাঠ ১-২ : পদার্থের গঠন

আমাদের চারপাশে সবসময়ই কোনো না কোনো পদার্থ দেখতে পাই। এগুলো আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। সকল ক্ষেত্রে স্থূল খেকে উঠেই আমরা হাতমুখ ধোয়ার কাজে পানি ব্যবহার করি। এই পানি একটি পদার্থ। একই ভাবে চক, চিনি, লবণ, লোহা, তামা ইত্যাদি সবই পদার্থ। এসব পদার্থ কী দিয়ে গঠিত?

**পদার্থের ভিন্নতার কারণ কী?**

পদার্থের ভিন্নতার কারণ হলো এদের গঠন। একেকটি পদার্থের গঠন একেক রকম বলেই তারা দেখতে ভিন্ন রকম হয় ও তাদের ধর্মও ভিন্ন রকম হয়। সে কারণেই ধর্ম অনুযায়ী তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

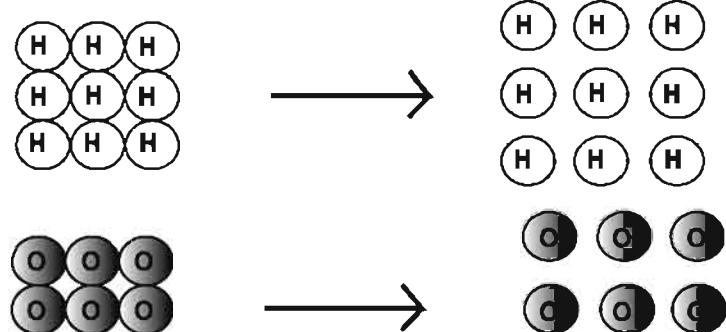
এবার আমাদের বহুল ব্যবহৃত করেকটি পদার্থের গঠন দেখা যাক। প্রথমে লোহা ও তামার কথাই ধরি। আমরা যে লোহা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি, তা মূলত ছেট ছেট লোহার কশা দিয়ে গঠিত। তামার ক্ষেত্রেও তাই। এটি ছেট ছেট তামার কশা দিয়ে গঠিত। লোহাকে ভাঙলে শুধু লোহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কশা পাওয়া যাবে অর্থাৎ লোহাতে একটি মাত্র উপাদান বিদ্যমান। একই ভাবে তামাকে ভাঙলে শুধু তামারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কশা পাওয়া যাবে এবং এতেও একটি মাত্র উপাদান বিদ্যমান।



চিত্র-৬.১ : লোহা ও তামা

লোহা ও তামার মতো যে সকল পদার্থ একটি মাত্র উপাদান দিয়ে তৈরি, তাদেরকে আমরা বলি মৌলিক পদার্থ।

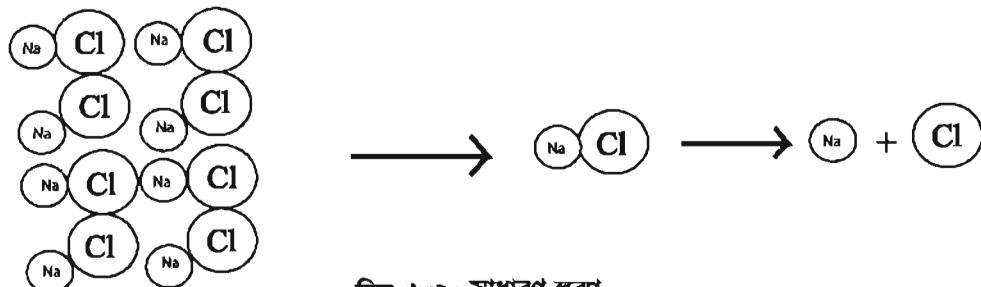
লোহা ও তামার মতো আমাদের পরিচিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একটি করে উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এরাও মৌলিক পদার্থ।



চিত্র-৬.২ : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুটি অত্যাৰ্থকীয় পদাৰ্থ হলো লবণ ও চিনি। লবণ হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামের দুই রকম উপাদান দিয়ে তৈরি একটি পদাৰ্থ। আৱ চিনি হলো কাৰ্বন, হাইড্ৰাজেন ও অক্সিজেন নামের তিনটি শিল্প উপাদান দিয়ে তৈরি।

আমৱা যদি শবণকে অৰ্ধাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডকে ভাঙতে থাকি, তবে প্ৰথমে শবণেৰ বড় দানা থেকে ছোট বা ক্ষুদ্ৰ দানা, প্ৰাপ্ত ছোট দানাগুলি থেকে আৱও ক্ষুদ্ৰ দানা এবং একপৰ্যায়ে একেবাৱে ক্ষুদ্ৰতম দানায় পৱিণত হবে, যখন এটিকে খালি ঢাকে আৱ দেখা যাবে না। যদিও এটি শবণেৰ একটি অতি ক্ষুদ্ৰতম অংশ, যেখনে একটি মাত্ৰ সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। এই অংশ তেজে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সোডিয়াম ও ক্লোরিন হয়ে যায়। অৰ্ধাৎ দুটি শিল্প উপাদান পাওয়া যায়।



চিত্ৰ- ৬.৩ : সাধাৱণ লবণ

একই ভাবে চিনিকে ভাঙলে শেষ পৰ্যন্ত কাৰ্বন, হাইড্ৰাজেন ও অক্সিজেন তিনটি উপাদানই পাওয়া যাবে।

লবণ ও চিনিৰ মতো যে সব পদাৰ্থ একেৱে অধিক শিল্পৰ্যামী উপাদান দিয়ে তৈৱি তাদেৱকে আমৱা বলি যৌগিক পদাৰ্থ।

লোহায় মৱিচা ধৰাৱ কথা আমৱা কে না জানি। ধূসৱ কালচে রঞ্জেৰ লোহাৱ তৈৱি রড (যা একটি মৌলিক পদাৰ্থ) কিছুদিন বাইৱে ঋখে দিলে এৱ উপৱ লালচে বাদামী রঞ্জেৰ একটি আস্তৱন পড়ে, যাৱ নাম মৱিচা। এখানে আসলে একটি মৌলিক পদাৰ্থ (লোহা) জলীয়বাক্ষেৰ উপস্থিতিতে অপৱ একটি মৌলিক পদাৰ্থ অক্সিজেনেৰ সাথে বিক্ৰিয়াৰ মাধ্যমে মৱিচাৰ সৃষ্টি কৱে, যা আয়ৱন অক্সাইড নামেৰ একটি যৌগিক পদাৰ্থ। তাহলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদাৰ্থ মিলে একটি যৌগিক পদাৰ্থ তৈৱি হয়।

**মিশ্র পদাৰ্থ:** একটি প্লাসে পানি নিয়ে তাতে সমান্য একটু লবণ যোগ কৱে নাড়া দাও। লবণ ও পানিৰ এই মিশ্রণ যেখানে একেৱে অধিক পদাৰ্থ বিদ্যমান সেটি হলো মিশ্র পদাৰ্থ। একই ভাবে, বায়ু এক ধৱনেৰ মিশ্র পদাৰ্থ যেখানে নাইট্ৰোজেন, অক্সিজেন, জলীয়বাক্ষসহ অন্যান্য পদাৰ্থ থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে, বায়ু এমন একটি মিশ্র পদাৰ্থ যেখানে মৌলিক ও যৌগিক উভয় ধৱনেৰ পদাৰ্থ রয়েছে। আবাৱ লবণ পানিৰ মিশ্রণে উপস্থিত লবণ ও পানি দুটিই যৌগিক পদাৰ্থ।

### পাঠ ৩: ক্ষুদ্ৰতম কণাৱ মতবাদ

আগেৰ পাঠে আমৱা দেখেছি, মৌলিক বা যৌগিক পদাৰ্থকে ক্রমাগত ভাঙতে এক পৰ্যায়ে এটি ক্ষুদ্ৰতম কণাৱ পৱিণত হয়। এই ক্ষুদ্ৰতম কণাৱ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নানা রকম মতবাদ ব্যক্ত কৱেছেন। শ্রীক দার্শনিক ডেমক্ৰিটাস (Democritus) খ্রিস্টপূৰ্ব ৪০০ অন্দে সৰ্বপ্ৰথম পদাৰ্থেৰ ক্ষুদ্ৰতম কণা নিয়ে মতবাদ পোষণ কৱেন। তাৱ মতে সকল পদাৰ্থই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অবিভাজ্য (যা আৱ ভাঙা যায় না) কণা দিয়ে

তৈরি। তিনি এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন পরমাণু বা এটম। এটম কথাটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রিক শব্দ এটমস (Atomos) থেকে, যার অর্থ হলো অবিভাজ্য (Indivisible) বা যা ভাঙা যায় না। তাঁর সমসাময়িক আরও দুজন দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং আরিস্টটল (Aristotle) তাঁর মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। আরিস্টটলের মতে, পদার্থসমূহ অবিচ্ছেদ্য (Continuous) এবং ভাঙ্গনের কোনো সীমা নেই। অর্থাৎ যতই ভাঙা হোক না কেন, পদার্থের কণাগুলো ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।

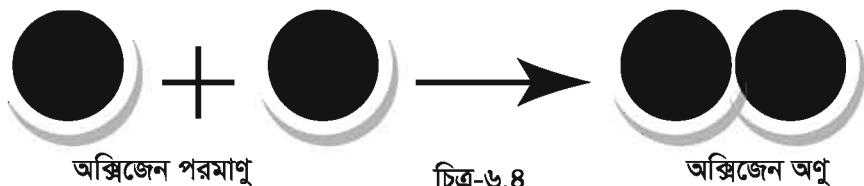
১৮০৩ সালে জন ডাল্টন (John Dalton) নামের ইংরেজ বিজ্ঞানী পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ দেন। তাঁর এই মতবাদ ডাল্টনের পরমাণুবাদ নামেই পরিচিত। ডাল্টনের মতে-

- ১। মৌলিক পদার্থসমূহ পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত।
- ২। একটি মৌলের বা মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই রকম। একটি মৌলের সকল পরমাণুর আকার, ভর ও রাসায়নিক ধর্ম একই।
- ৩। একটি মৌলের পরমাণুসমূহ অপর মৌলের পরমাণুসমূহ হতে ভিন্ন রকম। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর আকার, ভর ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন।
- ৪। যৌগিক পদার্থসমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ সরল অণুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ তৈরি করে।
- ৫। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুসমূহের স্থিতি বা ধ্বনি হয় না। শুধু একে অপরের সাথে যুক্ত হয় বা একে অন্য থেকে আলাদা হয়।

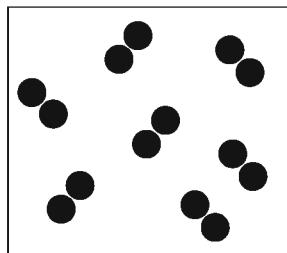
## পাঠ ৪ ও ৫: পরমাণু ও অণু

আমরা ডাল্টনের মতবাদ থেকে জানলাম যে, পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। এ ক্ষুদ্র কণাদেরকে পরমাণু বলা হয়। তবে পরমাণু স্বাধীন বা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না। এরা একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। অণুরা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

মৌলিক পদার্থের বেলায় শুধু এই পদার্থের পরমাণুরা যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। যেমন দুটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি অক্সিজেন অণু গঠন করে।



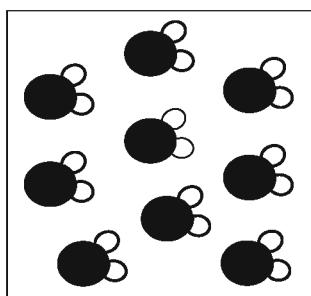
অন্যভাবে বলা যায়, অক্সিজেন নামের মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত। আবার অক্সিজেনের একটি অণুকে ভাঙ্গলে অক্সিজেনের দুটি পরমাণু পাওয়া যাবে।



চিত্র-৬.৫ : একটি পাত্রে অক্সিজেন গ্যাস। অঙ্গলো মুক্ত অবস্থায় আছে

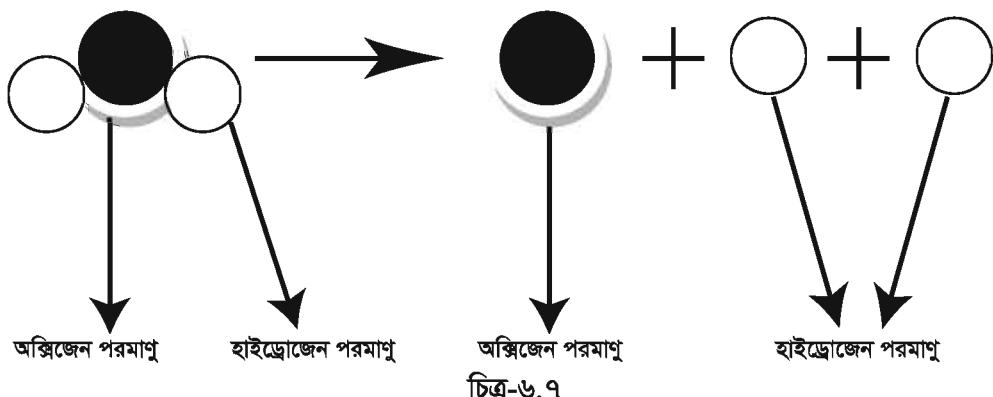
এবার একটি যৌগিক পদার্থ পানির কথা বিবেচনা করি। একটি পাত্রে কয়েক ফেঁটা পানি নিয়ে একে ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করতে থাকি। ধরা যাক, এক পর্যায়ে আমরা ছোট্ট এক ফেঁটা পানি পাবো। সেই এক ফেঁটা পানিও অসংখ্য কণার সমষ্টি।

এক পর্যায়ে হয়তো আমরা একটিমাত্র পানির কণা পাবো যেটি যুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে এরকম কণাতে পানির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এই ক্ষুদ্র কণাটি হলো পানির অণু।



চিত্র-৬.৬ : পানি আসলে পানির অণুর সমষ্টি

একটি পানির অণুকে ভাঙলে আরও ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায়, তবে সেগুলো স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। সেগুলো পানির বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে না। আসলে তারা আর পানির কণা থাকে না। একটি পানির অণুকে ভাঙলে একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি পানির অণু গঠন করেছে।



চিত্র-৬.৭

কাজ: গোলাকার সহজলভ্য কোন বস্তু বা কাঁদামাটির তৈরি মার্বেল ও কাঠি দিয়ে পানি ও অক্সিজেন অণুর মডেল তৈরি কর।

তাহলে পরমাণু ও অণুর পার্থক্য ও সম্পর্ক বোঝা গেল?

পরমাণু নামক ক্ষুদ্র কণা দ্বারা পদার্থ গঠিত। এরা স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারে না। দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে অণু গঠন করে। একই ধরনের পরমাণু মিলে মৌলিক পদার্থের অণু গঠন করে। আর দুই বা ততোধিক পদার্থের পরমাণু মিলে যৌগিক পদার্থের অণু গঠন করে। অণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে।

### পাঠ ৬: পরমাণু ও প্রতীক

আগের পাঠে তোমরা জেনেছ যে, ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখন প্রশ্ন হলো, সর্বমোট কতগুলি মৌল বা মৌলিক পদার্থ আছে অথবা কত রকমের পরমাণু আছে? এ পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে ৯৮টি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় আর বাকী ২০টি কৃত্রিমভাবে তৈরি মৌলিক পদার্থ। প্রতিটি মৌলিক পদার্থেই একটি নাম আছে। আর এদেরকে সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনকভাবে প্রকাশের জন্যই আমরা প্রতিটির জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করি। প্রতীক সাধারণত মৌলের ল্যাটিন, গ্রীক বা ইংরেজি নামের একটি বা দুটি আদ্যক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত প্রতীকের ক্ষেত্রে সর্বদাই বড় হাতের অক্ষর আর দুটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত প্রতীকের ক্ষেত্রে প্রথমটি বড়

হাতের অক্ষর এবং পরেরটি ছোট হাতের অক্ষর হয়। নিচে কয়েকটি পরমাণুর প্রতীক ও তাদের ইংরেজী, গ্রীক বা ল্যাটিন নাম দেয়া হলো।

পরমাণু	প্রতীক	ইংরেজী, গ্রীক বা ল্যাটিন নাম
হাইড্রোজেন	H	Hydrogen
হিলিয়াম	He	Helium
লিথিয়াম	Li	Lithium
বেরিলিয়াম	Be	Beryllium
বোরন	B	Boron
কার্বন	C	Carbon
নাইট্রোজেন	N	Nitrogen
অক্সিজেন	O	Oxygen
ফ্লোরিন	F	Fluorine
লোহা	Fe	Ferrum

### পাঠ ৭ ও ৮ : অণু ও সংকেত:

আমরা শিখেছি যে, দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে অণু তৈরি করে। একটি অণুতে কী কী পরমাণু আছে সেটা জানা যায় সংকেত থেকে।

আসলে অণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশই হলো সংকেত। একটি অণু যে যে মৌলের পরমাণু দিয়ে গঠিত সেসব মৌলের প্রতীক দিয়ে সংকেত লেখা হয়। আমরা এখন সংকেত লেখার নিয়ম ও সংকেত থেকে কী বোঝা যায় সে সম্পর্কে জানবো।

**মৌলিক পদার্থের সংকেত :** কঠিন বা তরল মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় অনেক পরমাণু একসাথে থাকে, কোন অণু গঠন করে না। তাই এ ধরনের মৌলের ক্ষেত্রে অণুর সংকেত লেখা হয় না। যেমন, সোডিয়াম, লোহা, কগার ইত্যাদি। তবে গ্যাসীয় মৌলসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে অণু গঠন

করে। এজন্য তাদের সংকেত লেখা হয় প্রতীকের নিচে ডানপাশে ছোট করে ২ লিখে। যেমন অক্সিজেনের সংকেত  $O_2$ , নাইট্রোজেনের সংকেত  $N_2$ । তবে কিছু কিছু তরল ও কঠিন মৌলের ক্ষেত্রে দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে আগু গঠন করে। তাদেরও সংকেত লেখা হয় প্রতীকের নিচে ডানপাশে ছোট করে ২ লিখে। যেমন ব্রোমিন (তরল) এর সংকেত  $Br_2$ । নিচে কিছু মৌলের সংকেত দেয়া হলো।

মৌল	প্রতীক	সংকেত
হাইড্রোজেন	H	$H_2$
নাইট্রোজেন	N	$N_2$
অক্সিজেন	O	$O_2$
ফ্লোরিন	F	$F_2$
ক্লোরিন	Cl	$Cl_2$
ব্রোমিন	Br	$Br_2$
আয়োডিন	I	$I_2$

**যৌগিক পদার্থের সংকেত :** যৌগিক পদার্থের সংকেত থেকে বোঝা যায় যোগাটি কী কী মৌল ও পরমাণুগুচ্ছ দিয়ে এবং কী অনুপাতে তৈরি। যেমন পানির সংকেত  $H_2O$  থেকে বোঝা যায় একটি পানির অণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু থেকে তৈরি। নিচের ছক থেকে আমরা দেখবো কীভাবে সংকেত থেকে বোঝা যায় যোগাটি কী কী দিয়ে তৈরি।

যৌগের নামের বৈশিষ্ট্য	সংকেত	নাম	যে যে মৌলের পরমাণু ও পরমাণুগুচ্ছ দিয়ে তৈরি
ধাতুর (কিছু ক্ষেত্রে অধাতু) সাথে একটি অধাতু যুক্ত হলে যৌগের নামের শেষে আইড থাকে।	NaCl CaO KI $SO_2$ $CO_2$	সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড	সোডিয়াম ও ক্লোরিন ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন পটাশিয়াম ও আয়োডিন সালফার ও অক্সিজেন কার্বন ও অক্সিজেন
একটি অধাতু ও কয়েকটি অক্সিজেন মিলে একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে যা একটিমাত্র পরমাণুর মত কাজ করে। ঐ পরমাণুগুচ্ছ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করলে তাদের নামের শেষে আইট বা এট থাকে।	$CaSO_4$ $CaSO_3$ $KNO_3$ $KNO_2$ $Na_2(CO_3)$ $AlPO_4$	ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফাইট পটাশিয়াম নাইট্রাইট পটাশিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম কার্বনেট অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট	ক্যালসিয়াম ও সালফেট ক্যালসিয়াম ও সালফাইট পটাশিয়াম ও নাইট্রাট পটাশিয়াম ও নাইট্রাইট সোডিয়াম ও কার্বনেট অ্যালুমিনিয়াম ও ফসফেট

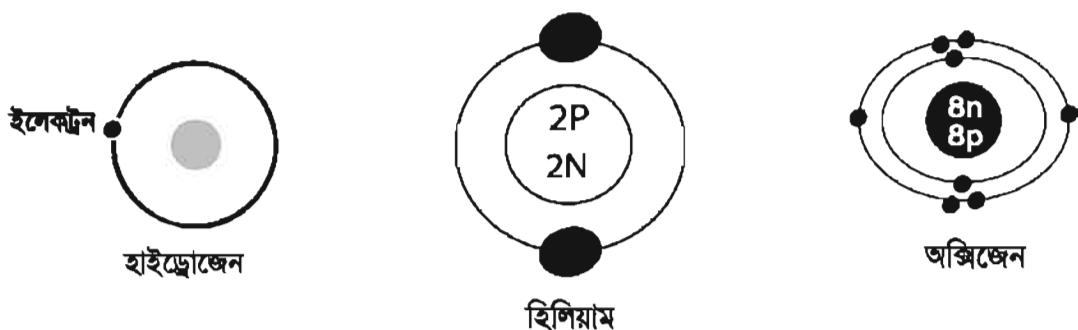
### পাঠ ৯ : পরমাণুর কণা

পরমাণু আকারে খুবই ছোট। এতই ছোট যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এমনকি সাধারণ মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যেও না। তবে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরমাণু দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে কোনো জিনিসকে তার আকারের তুলনায় কয়েক মিলিয়ন গুণ বড় দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, এত ছোট পরমাণুকে ভেঙ্গে কি আরও স্ফুর্দ্ধতর কোনো কণা পাওয়া যায়?

ডাল্টনের পরমাণুবাদ অনুযায়ী, পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ একে আর ভাঙা যায় না। ডাল্টনের এই মতটি অনেকদিন পর্যন্ত সবাই সমর্থন করতেও এখন এটি প্রমাণিত সত্য যে, পরমাণুকে ভেঙ্গে আরও স্ফুর্দ্ধ কণায় পরিণত করা যায়। পরমাণু ভেঙ্গে যে তিনটি কণা পাওয়া যায় তা হলো ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউটন। আধুনিক গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউটন ও প্রোটন আর কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেক্ট্রন ঘূরতে থাকে। সাধারণত একই ধরনের একটি পরমাণুতে সমানসংখ্যক ইলেক্ট্রন ও প্রোটন থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে কোনো নিউটন থাকে না, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু ভাণ্ডে এর কেন্দ্রে একটি প্রোটন ও বাইরে একটি ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়। অন্যদিকে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ২টি প্রোটন ও দুটি নিউটন আর বাইরে থাকে ২টি ইলেক্ট্রন। আবার অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউটন আর বাইরে থাকে ৮টি ইলেক্ট্রন।



চিত্র-৬.৮ : পরমাণুর গঠন

### পাঠ ১০ ও ১১ সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার:

ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা জেনেছ যে, পানি একটি সার্বজনীন দ্রাবক। কারণ, এটি জৈব ও অজৈব অনেক দ্রবককে দ্রবীভূত করে যা অন্য দ্রবকের পক্ষে সম্ভব নয়। এবার তাহলে দেখা যাক পানি সত্ত্বিকার অর্থেই সার্বজনীন দ্রাবক কিম।

**কাজ:** সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** পানি, টেস্টটিউব, নানা রকম পদার্থ ( যেমন- খাবার লবণ, খাবার সোডা, টেস্টিং সল্ট, বিট লবণ, ফিটকিরি, চিনি, ভিনেগার, স্পিরিট, ভিটামিন সি ট্যাবলেট, গ্লুকোজ ইত্যাদি)

**পদ্ধতি:** টেস্টটিউবে ৫ মিলিলিটারের মতো পানি নাও। কিছু খাবার লবণ যোগ করে ভালোভাবে ঝাকাও। লবণ কি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেল? হ্যাঁ, ঠিক তাই। একই ভাবে একে একে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি দ্রব নিয়ে দেখ এরা পানিতে দ্রবীভূত হয় কিনা। প্রতিটি দ্রব বা পদার্থই পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে। উল্লেখিত পদার্থের মধ্যে খাবার লবণ, খাবার সোডা, টেস্টিং সল্ট, বিট লবণ, ফিটকিরি হলো অজৈব পদার্থ কিন্তু চিনি, ভিনেগার, স্পিরিট, ভিটামিন সি ট্যাবলেট, গ্লুকোজ হলো জৈব পদার্থ। তাহলে এটি প্রমাণিত হলো যে, পানি জৈব ও অজৈব অনেক পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে অর্থাৎ পানি একটি সার্বজনীন দ্রাবক।

এবার তোমরা পানির বদলে অন্য একটি দ্রাবক যেমন-স্পিরিট নিয়ে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি দ্রব নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ। এগুলো স্পিরিটে দ্রবীভূত হয় কিনা। সবগুলো দ্রব কি স্পিরিটে দ্রবীভূত হচ্ছে? না, হচ্ছে না। পানি ছাড়া বেশির ভাগ দ্রাবকই স্পিরিটের মতো কম সংখ্যক দ্রবকে দ্রবীভূত করে। তাই সেগুলো সার্বজনীন দ্রাবক নয়।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয় আর তাই এদের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- মৌলিক পদার্থসমূহ একই ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি হয়।
- যৌগিক পদার্থসমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়।
- মৌলিক পদার্থসমূহ পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত।
- ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর আকার, ভর ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন।
- বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ সরল অণুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ তৈরি করে।
- যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে অণু বলা হয়।
- পরমাণু ভাঙলে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাওয়া যায়।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মৌলিক পদার্থ \_\_\_\_\_ উপাদান দিয়ে তৈরি।
২. লবণ ও চিনি \_\_\_\_\_ পদার্থ।
৩. মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম \_\_\_\_\_।
৪. \_\_\_\_\_ হলো যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা।
৫. পরমাণুর কেন্দ্রে \_\_\_\_\_ থাকে।

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বলতে কী বোঝা?
২. অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. ডাল্টনের পরমাণুবাদের মূল বক্তব্য কী?
৪. পরমাণু ভেঙে কী কী কণা পাওয়া যায়? এরা পরমাণুর কোথায় অবস্থান করে?

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মৌলিক অণু?

ক. Na                      খ. Ne                      গ. N<sub>2</sub>                      ঘ. NO

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

পদার্থ	প্রতীক	সংকেত
১		Cl <sub>2</sub>
২	Al	
৩		O <sub>3</sub>
৪	F	
৫		NH <sub>3</sub>
৬		NaOH
৭	Cu	

২. উপরের ছকে প্রতীক ও সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশিত একই ধর্মের মৌল কোনগুলো?

- ক. ২, ৪  
 খ. ১, ৩  
 গ. ১, ৪  
 ঘ. ২, ৬

৩. কোন পদার্থগুলোর পরমাণুর সংখ্যা সমান?

- ক. ২, ৩  
 খ. ৩, ৮  
 গ. ৪, ৫  
 ঘ. ৩, ৬

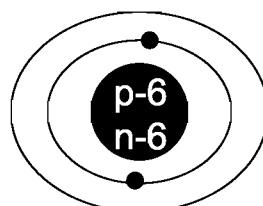
#### সূজনশীল প্রশ্ন:

১. নিচের ছকে তিনটি পদার্থ এবং তাদের গঠনকারী পরমাণু সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

পদার্থ	পরমাণুর সংখ্যা
১	Na - ১টি Cl - ১টি
২	F - ২টি
৩	C - ১টি O - ২টি

- ক. হিলিয়ামের প্রতীক কী?  
 খ. কার্বন কেন মৌলিক পদার্থ? বর্ণনা কর।  
 গ. ১ নং পদার্থটির সংকেতসহ রাসায়নিক নাম লেখ এবং গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. ছকের ২ নং পদার্থ মৌলিক এবং ৩নং পদার্থ যৌগিক-ব্যাখ্যা কর।

২.



- ক. পরমাণু কী?  
 খ. O এবং O<sub>2</sub> এর মধ্যে পার্থক্য কী?  
 গ. দ্বিতীয় কক্ষ পথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে তা বসিয়ে চিত্রটি আঁক।  
 ঘ. তোমার আঁকা চিত্রটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

## সপ্তম অধ্যায়

# শক্তির ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। কাজের সাথে সম্পর্ক রয়েছে শক্তি ও ক্ষমতার। এছাড়া রয়েছে শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এদের এক রূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। পাশাপাশি রয়েছে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপার। তেমনিভাবে শক্তির সংকট নিরসনে আমাদের শক্তির সংরক্ষণের পাশাপাশি বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হচ্ছে।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- শক্তি ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির রূপান্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অনবায়নযোগ্য শক্তির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির সংরক্ষণশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির সংকট নিরসনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে শক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- শক্তি ব্যবহারে নিজে সচেতন হবো এবং অন্যদের সচেতন করব।

### পাঠ-১ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

আমরা প্রথমে নিচের চিত্রগুলোর দিকে লক করি।



চিত্র-৭.১ : একজন শিক্ষার্থী পড়ছে



চিত্র-৭.২ : একজন ফুটবল খেলছে



চিত্র-৭.৩ : একজন মাধ্যার একটি  
বোরা নিয়ে দাঢ়িয়ে আছে

উপরের চিত্রগুলো দেখে কী মনে হচ্ছে? প্রথম ছবিতে যে শিক্ষার্থী পড়ছে, আসলে সে কি কোনো কাজ করছে? হিজীয় ছবিতে যে ফুটবল খেলছে, সে কি কোনো কাজ করছে? আর তৃতীয় ছবিতে যে মাধ্যার বোরা নিয়ে দাঢ়িয়ে সে কি কোনো কাজ করছে? সাধারণ অর্থে আমদের কাছে উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণকেই কাজ করা মনে হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাবার কাছের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। সহজ কথায়, কাজ তখনই  
হবে যখন কোনো বস্তুর উপর কল প্রয়োগে তার অবস্থানের পরিবর্তন হবে। তাহলে উপরের উদাহরণ থেকে  
দেখা যাব, যে শিক্ষার্থী পড়ছে তার কোনো অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না বা যে মাধ্যার বোরা নিয়ে দাঢ়িয়ে আছে,  
তারও কোনো অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে বিজ্ঞানের ভাবার এই সূই ক্ষেত্রে কোনো কাজ সংযোগিত  
হচ্ছে না। এখানে যে ফুটবল খেলছে তার অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে, ফলে সে কাজ করছে। বিজ্ঞানের ভাবায়  
আমরা বলতে পারি কোনো বস্তুর উপর কল প্রয়োগ করে কস্তুরীকে বলের দিকে এক স্থান  
থেকে অন্য স্থানে সরানো হলে কাজ সম্পন্ন হয়। কাজের সাথে দুটি বিষয় সম্পর্কসূত্র, একটি হলো কল  
এবং অপরটি হল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন। বিজ্ঞানের ভাবার কাজ হলো কল ও বস্তু কর্তৃক বলের দিকে  
অভিক্রম সূর্যদের গুণবল।

একজন রিকশাচালককে রিকশা চালিয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে কাজ করতে হয়। বরা যাক, একই  
সূর্যত্ব যেতে একজন রিকশাচালকের ১০ মিনিট লেগেছে, আবার অন্যস্থানের লেগেছে ১৫ মিনিট। এখানে  
সুইজসের ঘণ্টে কাজ করার হার বেশি কার? তাড়াতাঢ়ি কাজ করার সাথে 'ক্ষমতা' ব্যাপারটি জড়িত। কোনো  
কাজ কে কত তাড়াতাঢ়ি করতে পাই তা দিয়ে তার ক্ষমতা বুবো যাব। যে রিকশাচালকের কোন জায়গায়  
যেতে সময় কম লাগে, তার ক্ষমতা বেশি। অর্থাৎ আমরা ক্ষমতা পাই মেটি কাজকে যোটি সময় দিয়ে তাল করে।

কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ব্যাপার দেখা যাক। দুইজন শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত নিল যে তারা স্কুলের খেলার মাঠটিকে মোট পাঁচবার প্রদক্ষিণ করবে। শুরু করার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একজন দুইবার প্রদক্ষিণ করে বসে পড়ল, আরেকজন পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করল। এখানে আমরা কাজ করার সামর্থ্যকে বিবেচনা করব। এদের মধ্যে যে দুইবার প্রদক্ষিণ করার পর বসে পড়ল, সে কাজ করার সামর্থ্য ফুরিয়ে ফেলল। আর যে পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করল, তার কাজ করার সামর্থ্য বেশি। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ করার এই সামর্থ্যই হল শক্তি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাজের সাথে শক্তি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

শক্তি ও কাজ মূলত ভিন্ন কিছু নয়। কাজ করার জন্যই প্রয়োজন হয় শক্তির। যার যত বেশি শক্তি সে তত বেশি কাজ করতে পারে। এই কাজ এর পরিমাণ দিয়েই শক্তিকে পরিমাপ করা হয়। কাজের এককই হল শক্তির একক। শক্তির একক হলো জুল।

## পাঠ-২ ও ৩ : শক্তির রূপ

আমাদের কাজ করার সামর্থ্যের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা আমরা কোথা থেকে পাই? এটা আমরা সকলেই হয়তো জানি যে পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎসই হল সূর্য। তাছাড়া আমাদের চারপাশে রয়েছে শক্তির বিভিন্ন উৎস। যেমন তোমরা নিচয় গ্যাস দিয়ে রান্না করতে দেখেছ। আবার দেখেছ কিভাবে তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। মূলত উভয় ক্ষেত্রেই আমরা গ্যাস বা তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে শক্তির জোগান দিয়েছি। এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার শক্তির রূপ নিয়ে কথা বলব।

### যান্ত্রিক শক্তি

মনে কর তুমি দৌড়াচ্ছ বা একটি গাড়ি চলছে। এই দুই ক্ষেত্রেই গতি আনতে কাজ করতে হচ্ছে। আবার তুমি একটি ইট নিচ থেকে উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে অথবা গুলতি দিয়ে একটি আম পাড়ার চেষ্টা করছ। এখানে তুমি ইটটিকে উপরে উঠানোর পর এতে যে শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তার দ্বারা ইটটি আপনা আপনি নিচে পড়ে গেল। আবার গুলতিকে প্রথমে পিছনে টানার পর যে শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তা দিয়েই গুলতির পাথরটি দ্রুত গিয়ে আমটিকে আঘাত করে। এই যে দৌড়ানো, গাড়ি চলা, ইট উঠানো বা গুলতি দিয়ে আম পাড়া এর প্রত্যেকটির সাথেই এক ধরনের শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এই বিশেষ ধরনের শক্তিই হল যান্ত্রিক শক্তি। যদিও এতে স্থিতি শক্তি ও গতি শক্তি ব্যাপারটি আলাদাভাবে জড়িত। গতির জন্য কাজ করার সামর্থ্য হল গতি শক্তি। যেমন, দৌড়ানো বা গাড়ি চালানো। আবার কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য সঞ্চিত শক্তি হল স্থিতি শক্তি। যেমন ইট উপরে উঠানো বা গুলতি দিয়ে আম পাড়া।

### রাসায়নিক শক্তি

খাদ্যে বা জ্বালানিতে যে শক্তি জমা থাকে তাকে রাসায়নিক শক্তি বলে। আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও গতি শক্তি আমরা খাদ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি থেকে শসনের মাধ্যমে পাই। পেট্রোল, গ্যাস, কাঠ, কয়লা ইত্যাদি সব কিছুরই রয়েছে রাসায়নিক শক্তি। আমরা টর্চ বাতি বা রেডিওতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি তার মধ্যেও রয়েছে রাসায়নিক শক্তি।

### তাপ শক্তি

রান্না করতে, মোটর গাড়ি বা রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাতে যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তাকে বলে তাপ শক্তি। কয়লা, গ্যাস, কাঠ, পেট্রোল বা ডিজেল পুড়িয়ে এই শক্তি পাওয়া যায়। আবার সূর্য থেকেও সরাসরি তাপ আসে। এই তাপ শক্তি পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। তাপ শক্তি ছাড়া কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারতো না।

### চুম্বক শক্তি

শক্তির আরেক রূপ হচ্ছে চুম্বক শক্তি। এই শক্তি দিয়েই কোনো চুম্বক একটি লোহার বস্তুকে আকর্ষণ করে।

### আলোক শক্তি

তাপ শক্তির সাথে সূর্য থেকে সরাসরি আর যে শক্তিটি আসে তা হচ্ছে আলোক শক্তি। আলোক শক্তি ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পারি না। সূর্য আলোক শক্তির প্রধান উৎস। আগুন ও বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালালেও আমরা আলোক শক্তি পাই।

### শব্দ শক্তি

আমরা যখন কথা বলি, গান করি বা বাঁশি বাজাই, তখন এক ধরনের শক্তি উৎপন্ন করি। এর নাম শব্দ শক্তি। শব্দ শক্তির সাহায্যেই আমরা একে অপরের কথা শুনতে পাই। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশনে শব্দ শক্তি ব্যবহার করা হয়। পদার্থের কম্পন থেকে শব্দের উৎপন্নি হয়।

### বিদ্যুৎ শক্তি

শক্তির একটি অতি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় রূপ হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি। বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে আমরা বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই। কল-কারখানা বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে চলে। অনেক দেশে রেলগাড়িও বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। বিদ্যুৎ শক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া যায়।

### পারমাণবিক শক্তি

আমরা জানি যে, পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে কণিকাসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী বল দ্বারা একত্রে অবস্থান করে। শক্তি প্রয়োগে কণিকাসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে পাওয়া যায় পারমাণবিক শক্তি। এরা পরমাণুর অভ্যন্তরে অত্যন্ত শক্তিশালী বল দিয়ে একত্রে বাঁধা রয়েছে। এই শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে কাজে লাগানো যায়।

### পাঠ-৪ ও ৫ : শক্তির মূলভূত

আমরা আসেই সেসেই যথাক্ষিতে শক্তি বিভিন্ন রূপে বিবৃজ্জ করে এবং এই বিভিন্ন রূপ পদ্ধতির সম্পর্ক আমরা নিচের চিত্রটি দ্বারা করি।



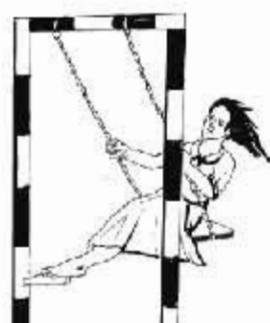
চিত্র-৭.৪

উপরের চিত্রসমূহে একজন ভার উত্তোলক বিভিন্ন খাবার প্রক্ষেপের ফলে তার খাবারপুলো প্রথমে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। প্রয়োগে তিনি যখন ভারটিকে উঠাতে চেষ্টা করছেন তখন সক্ষিত রাসায়নিক শক্তি গতি শক্তিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। এরপর তিনি যখন ক্রমশ ভারটিকে যাবার ভূমালেন তার পতিশক্তি ক্রমশ: খিড়ি শক্তিতে পরিণত হতে থাকে। আবার যখন তিনি ভারটিকে নিচে ফেলে দিছেন তখন খিড়ি শক্তি গতি, শব্দ ও তাপ শক্তিতে মুগাভাসিত হয়েছে। কারণ তার যাটিতে পড়ার সাথে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং ভারটিকে ছাত দিয়ে সৰ্ব করলে দেখা যাবে সেটি গরম লাগছে। অর্থাৎ আমাদের শারীরিকভূতীয় কার্যক্রমে নানাবিধ শক্তির মূলভূত ঘটে।

এতাবেই শক্তির বিভিন্ন রূপ পদ্ধতির সম্পর্ক হাতে। নিম্নে শক্তির মূলভূতের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

### যাঞ্চিক শক্তির মূলভূত

হাত দিয়ে শরীরের অন্য কোনো অংশ অবলে পরম অনুসৃত হয়। এতে যাঞ্চিক শক্তি ভাগ শক্তিতে মুগাভাসিত হয়। যাচি বাজালে যাঞ্চিক শক্তি শব্দ শক্তিতে মুগাভাসিত হয়। এক ধরণ গাথত্রের উপর একটি ধাতব দণ্ড ধাজা কোরে আঘাত করলে অগ্রিমভূলিঙ্গ বেয়ে হতে দেখা যায় এবং এক ধরনের শব্দেরও সূচি হয়। ধাতব দণ্ড ও গাথন খভটি ধানিকটা উভভাবে হয়। একেতে যাঞ্চিক শক্তি ভাগ, শব্দ ও আলোক শক্তিতে মুগাভাসিত হয়। টেকি দিয়ে ধান তানার সময় এতে যাঞ্চিক শক্তি শব্দ ও তাপ শক্তিতে মুগাভাসিত হয়। একইভাবে দোলনার ক্ষেত্রে খিড়ি ও গতিশক্তির ক্ষেত্রের ঘটে থাকে।



চিত্র-৭.৫: দোলনার দোল খাওয়া

### তাপ শক্তির মূলভূত

বাস্তীয় ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করে মেলগাড়ি চালানো হয়। এখানে তাপ শক্তি বাণিক শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়।



চিত্র-৭.৬ : ইঞ্জিনসহ মেলগাড়ি

### আলোক শক্তির মূলভূত

ফটোগ্রাফিক কাগজের উপর আলোর ক্ষেত্রে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়। সূর্যের আলোকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রগতি বেমন পকেট ক্যালকুলেটর, ডেডিউ ও ইলেক্ট্রনিক সৌর প্যানেলকে ভড়িৎ শক্তিতে মুগাড়িরিত করে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৭.৭ : ডিজিটাল ক্যামেরা



চিত্র-৭.৮ : ক্যালকুলেটর চিত্র-৭.৯ : সোলার প্যানেল



### শব্দ শক্তির মূলভূত

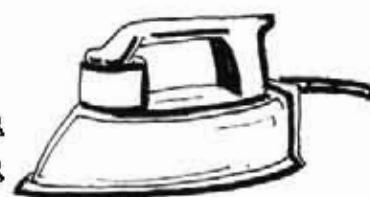
শব্দেভূত তরঙ্গ দ্বারা আবা কালচোর যন্ত্রণা পরিষ্কার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে শব্দ শক্তি বাণিক শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়। অনুনাদের সময় শব্দ শক্তি বাণিক শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়। আবার টেলিফোন ও মেডিওফ প্রেরক বর্তে শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করে।



### চৌম্বক শক্তির মূলভূত

লোহাকে মৃত ও বায়বাল চুম্বক এবং বিচুম্বকজনকালে তাপ উৎপন্ন হয়।

এতে চৌম্বক শক্তি তাপ শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়। ভাষাড়া ভড়িৎ চুম্বকের সাহায্যে তারী জিনিসপত্র উঠানো যায়। এতে চৌম্বক শক্তি বাণিক শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়।



চিত্র-৭.১১ : ইঞ্জি

### বিদ্যুৎ শক্তির মূলভূত

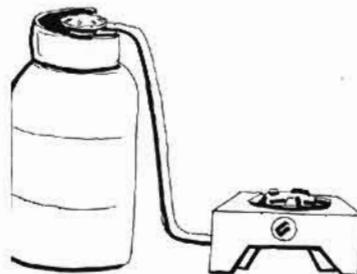
বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে বিদ্যুৎ চালনা করলে তাপ উৎপন্ন হয়। একেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়। বৈদ্যুতিক পাথার মধ্যস্থিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে পাথা সুরক্ষে থাকে। একেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি বাণিক শক্তিতে মুগাড়িরিত হয়। বিদ্যুৎ শক্তি হতে আবরা আলো পাই।

### রাসায়নিক শক্তির বৃপ্তির

কয়লা পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও তা ঘটে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে বৃপ্তিরিত হয়। সাধারণত বিদ্যুৎ কোষে রাসায়নিক প্রব্যোর বিক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে বৃপ্তিরিত হয়। এছাড়া কয়লা, পেট্রোল, ক্রোসিন, গ্যাস ইত্যাদি পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপ ও আলোক শক্তিতে বৃপ্তিরিত করা হয়।

### পারমাণবিক শক্তির বৃপ্তির

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে বৃপ্তিরিত করা হয়।



চিত্ৰ- ৭.১২ : গ্যাস চুল্লি

### পাঠ-৬ : শক্তির সংরক্ষণীয়তা

মনে কর তুমি স্কুলের মাঠে দাঢ়িয়ে একটি টেনিস বলকে উপরের দিকে ছুড়ে মারলে। কী দেখছ? টেনিস বলটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠার পর এটি আবার নিচে নামতে থাকে। এখানে টেনিস বলটি উপরে উঠতে থাকার সময় এর গতিশক্তি কমতে থাকে এবং স্থিতিশক্তি বাঢ়তে থাকে। যখন এর গতিশক্তি শূন্য হয়ে যায় তখন এটি পুনরায় এর মধ্যে স্থিতিশক্তির কারণে নিচে নামতে থাকে। দেখা যাবে, বস্তু যতই নিচের দিকে নামতে থাকে ততই এর স্থিতিশক্তি কমে গতিশক্তি বাঢ়তে থাকে এবং স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। টেনিস বলটি যখন মাটি স্পর্শ করে এবং স্থির হয় তখন তার সমস্ত গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি শব্দ, তাপ, আলোক ইত্যাদি শক্তিতে পরিণত হয়। আমরা তাপ বা আলোকের তেমন প্রিমাণ বুঝতে না পারলেও বলটি মাটিতে স্পর্শ করায় যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা শুনতে পাই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টেনিস বলের পরিবর্তে একটি পাথর উপরে ছুড়ে মারলে এটি যদি কোনো মাঠে পড়ে তবে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে পাথরটি গরম অনুভূত হতে পারে।

এতক্ষণ তোমরা জেনেছ যে শক্তি কীভাবে একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়। তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, এই বৃপ্তিরের সময় শক্তির কি কোনো অপচয় হয় না? বিশ্বাস কর হলেও এটা সত্য যে শক্তির বৃপ্তিরের পূর্বে বা পরে মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে পারিনা, এমনকি শক্তি ধৰণ করতেও পারিনা। অর্ধাৎ বিশ্বের সামগ্রিক শক্তির কোনো তারতম্য ঘটে না। এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি ছিল, আজও সেই পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এটাই হলো শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণীয়তা।

### পাঠ-৭, ৮ ও ৯ : নবায়নযোগ্য শক্তি

আমরা বিভিন্ন শক্তির উৎস থেকে শক্তি পাই। এসব শক্তির উৎস দু'ধরনের: নবায়নযোগ্য ও অনন্বায়নযোগ্য। নবায়নযোগ্য নাম থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে এর অর্থ কী বুবায়। যা কিছু নবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে কোনো জিনিস ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে পুনরায় ঐ জিনিসটি দ্বারা আবার শক্তি উৎপাদন

করা যায়। অর্থাৎ যে শক্তির উৎসকে বারবার ব্যবহার করা যায় তাই হলো নবায়নযোগ্য শক্তি। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সূর্যরশ্মি, বায়োগ্যাস, পানি, বায়ুপ্রবাহ, পানির জোয়ার ভাটা ইত্যাদি।

নিম্নে আমরা বায়োগ্যাস, সৌর শক্তি, পানির জোয়ার-ভাটা এবং বায়ুপ্রবাহ হতে নবায়নযোগ্য শক্তির উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

### **বায়োগ্যাস (উষ্ণিজ ও প্রাণীজ)**

গরু, ছাগল, ঘোড়া ও মহিয়ের বিষ্ঠা জ্বালানি হিসাবে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাণীর এসব বিষ্ঠা শক্তির এক প্রকার উৎস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুকনো গোবর পুড়িয়ে তাপশক্তি উৎপন্ন করা হয়। বায়োগ্যাসে যে সকল উপাদান বা বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো গরু, শুকর এবং মূরগী হতে প্রাপ্ত বর্জ্য, শস্য পরিত্যক্ত উষ্ণিদ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাণিজ বা কেবলমাত্র উষ্ণিজ উপকরণ অথবা উভয় প্রকারের মিশ্রণও ব্যবহার করতে পার। শুকর বা মূরগি রাখার জায়গা থেকে মলমিশ্রিত যে কাঁচা খড় পাওয়া যায়, সেগুলো বয়োগ্যাস তৈরির উপযুক্ত প্রাণিজ সার ও উষ্ণিজ উপকরণের ভালো মিশ্রণ। তবে এগুলো ব্যবহারের সময় ছেট ছেট টুকরা করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আরম্ভ করার সময় ব্যবহারের আগে শুকনো উষ্ণিজ উপকরণগুলো খুব ছেট ছেট করে কেটে অথবা পিষে খোসা বের করে নিতে হয়। আর টাটকা উষ্ণিজগুলো অস্তত দশদিন বাইরে পঁচতে দিতে হবে।

### **বায়ুপ্রবাহ**

আদিম মানুষ তার পেত বায়ুপ্রবাহ। সভ্যতার বিকাশ ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে এই বায়ু প্রবাহকে মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। আদিম মানুষ চার-পাঁচটা পাখার সাহায্যে চক্র বানিয়ে বাতাসের সাহায্যে চক্র ঘুরাত। চক্রের ঘর্ষণ কাজে লাগিয়ে মানুষ কুয়া থেকে পানি তোলা, কৃষিসেচ, যব অথবা গম ভাঙানো, আখ মাড়াই, ধানকাটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজ করত। পরে মানুষ বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত কঠিন কাজও সম্পন্ন করেছে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলের মানুষ আগে এ ধরনের কাজে বড় বড় চক্রকার এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করত। যা বর্তমানে হাওয়া বা বায়ুকল বা উইন্ডমিল নামে পরিচিত। উইন্ডমিল চালিয়ে বহুদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

### **পানির জোয়ার ভাটা**

নদী বা সমুদ্রের পানির জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালনার ব্যাপারটি অনেক দিন আগেই উষ্ণাবিত হয়েছে। কিন্তু জোয়ার-ভাটার শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের ব্যাপারটি খুব বেশি দিনের নয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

### সৌরশক্তি

সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সৌরশক্তি। আমরা জানি সূর্য সকল শক্তির উৎস। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার সবই কোনো না কোনোভাবে সূর্য থেকে আসা বা সূর্য ক্রিএ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে। যেমন আধুনিক সভ্যতার ধারক জীবাণু জ্বালানি আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি।

**কাজ:** সৌরশক্তি থেকে তাপ শক্তি উৎপন্ন করা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** আতশি কাঁচ/ধাতব ঢাকতি

**পদ্ধতি:** প্রথমে একটি আতশি কাঁচ নাও। আতশী কাঁচে সাধারণত একটি উভঙ্গ শেল থাকে। শেলের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কাগজের টুকরার উপর ফোকাস কর। দেখবে যথাযথ ফোকাস করলে আগুন জ্বলে উঠবে।



চিত্র-৭.১৩

এছাড়া সৌর শক্তিকে শীতের দেশে ঘৰবাড়ি গরম রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। শস্য, মাছ, সবজি ইত্যাদি শুকানোর কাজে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। মাছ শুকিয়ে শুটকি তৈরি করে তা বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। সৌর শক্তি দ্বারা বয়লারে বাষ্প তৈরি করে তার দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনের জন্য টার্বাইন সুরানো হয়। আধুনিক ফৌলেল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে সৌরকোষ। সৌরকোষের বৈশিষ্ট্য হলো এর উপর সূর্যের আলো পড়লে তা থেকে সরাসরি তড়িৎ পাওয়া যায়। এছাড়া সৌরকোষের রয়েছে নানা রকমের ব্যবহার। যেমন: কৃত্রিম উপর্যুক্তি সরবরাহের জন্য সৌরকোষ ব্যবহৃত হয়।

### নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা-বাস্তাদেশ প্রেক্ষাপট

নবায়নযোগ্য শক্তির অনেক রকম সুবিধা পাওয়া যায়। বিশ্বের অন্যস্থানে বৃক্ষের সাথে সাথে শক্তির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই শক্তি এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বায়োগ্যাস পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি উন্নতমানের জৈব সার পেতে সাহায্য করে। দুষ্পণ্যমুক্ত পরিবেশের সহায়ক হয়। স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি যেমন: পকেট ক্যালকুলেটর, পকেট রেডিও, ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি ইত্যাদি সৌরশক্তির সাহায্যে চালানো যায়। মূলত নবায়নযোগ্য শক্তির প্রধান সুবিধা হলো এটি নবায়নযোগ্য, এটি কখনো শেষ হয়ে যাবে না। নিচে এর সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

- বায়ুপ্রবাহ ও সৌরশক্তি একটি অফ্রান্স শক্তির উৎস। কারণ বায়ু ও সূর্য সর্বদাই বিদ্যমান।
- পানির ক্রোতকে ব্যবহার করে বেশি পরিমাণে শক্তির উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে স্রোতকে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরি ব্রিজ বা ব্যারেজ সড়ক যোগাযোগকে উন্নত করে। টাংড যেহেতু পানির জোয়ার-ভাটাকে প্রভাবিত করে এবং এটি সর্বদাই বিদ্যমান তাই পানির জোয়ার-ভাটা থেকে প্রাঙ্গ শক্তি সর্বদাই ব্যবহার সম্ভব।
- নবায়নযোগ্য শক্তি সাধারণত পরিবেশবন্ধব, কারণ এরা বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ায় না।

নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন আমাদের দেশে অনস্বীকার্য, তেমনি এর প্রাপ্যতা অনেকটা সহজ। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চল আছে যেখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌছেনি। সেখানে আমরা সহজেই সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ পেতে পারি। তাছাড়া বায়োগ্যাস উৎপাদনে রয়েছে আমাদের বিপুল সম্ভাবনা। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সীমিত থাকায় আমাদের এই বিকল্প শক্তির সম্মান অবশ্যই করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে আমাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরবরাহ করাতে প্রচুর খরচ হয়। তবে আমরা যদি বায়োগ্যাস প্ল্যাট গড়ে তুলতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা দৈত সুবিধা পাব। প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমরা জমির চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হব। এছাড়া কৃষিনির্ভর এই দেশে নিঃসন্দেহে বায়োগ্যাসের উপাদান খুবই সহজলভ্য। সুতরাং আমাদেরকে ভবিষ্যৎ চিন্তায় এখনই এই শক্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হলো।

### নবায়নযোগ্য শক্তি : সীমাবদ্ধতা

বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপক চাহিদা আছে। তবে কিছুক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে অসুবিধা দেখা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

- বায়োগ্যাস থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তার পরিমাণ কম এবং সীমিত।
- বায়ুপ্রবাহ ও স্ন্যোত থেকে যে নবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় তার উৎস সীমিত। কারণ এর জন্য যে প্ল্যাট তৈরি করতে হয়, তার জন্য সুবিধাজনক জায়গা লাগে। বায়ুর মাধ্যমে উৎপাদনের অন্যতম সমস্যা হলো সবসময় বায়ু প্রবাহ থাকে না।
- সূর্যের আলো থাকলে সৌরশক্তি নির্ভর নবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু বৃষ্টির জন্য এর উৎপাদন ব্যতৃত হতে পারে।
- অনেক সময় পানির জোয়ার-ভাটাকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহারের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। এছাড়া নদীর উপর ব্রিজ বা ব্যারেজ নির্মাণে জাহাজ চলাচলও বাধাপ্রস্ত হয়।
- সৌর, বায়ু ও পানির দ্রোত থেকে উৎপন্ন নবায়নযোগ্য শক্তি সাধারণত ব্যবহৃত।

### পাঠ-১০ : অনবায়নযোগ্য শক্তি

অনবায়নযোগ্য মানেই হলো, যে শক্তি একবার ব্যবহার করা হলে তা থেকে পুনরায় শক্তি উৎপন্ন করা যায় না। এটি হলো মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ, যা পুনরায় উৎপন্ন করা যায় না। প্রকৃতিতে এদের তৈরি করতে যত সময় লাগে, তার চেয়ে কম সময়ে ব্যায়িত হয়। অনবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে অন্যতম হলো কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি।

### অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা

অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা মূলত দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়—দাম ও প্রাচুর্য। বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বা যানবাহন অনবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে চলে, এদের নবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে চালাতে অনেক বেশি খরচ লাগে। যেমন: সাধারণ গ্যাস বা তেলে কম খরচে এসব যানবাহন বা যন্ত্রপাতি চলে। অপরপক্ষে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যেমন সৌরশক্তি দ্বারা কোনো যানবাহন চালানো কষ্টসাধ্য ও ব্যবহৃত। অনবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্ভা, এদের অল্প পরিমাণ থেকে বেশি শক্তি পাওয়া যায়, যেমন অল্প ইউরেনিয়াম থেকে অনেক বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়।

### অনবায়নযোগ্য শক্তির সীমাবদ্ধতা

অনবায়নযোগ্য জ্বালানির অসুবিধা হলো –

- এটি অনবায়নযোগ্য ও দ্রুত ফুরিয়ে যায়; এরা মূলত নিঃশেষ হয়ে যায়।
- পরিবেশকে বেশ উচ্চমাত্রায় দূষিত করে।
- এদের দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছড়ায়, ফলে প্রোবাল ওয়ার্মিং তৈরি করে।

### পাঠ-১১ : শক্তির ব্যবহার ও সংকট

মানুষ জীবন ধারণে ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যা কিছু করে তাতেই শক্তির প্রয়োজন হয়। দিন দিন বেড়েই চলছে শক্তির ব্যবহার, ফলে তৈরি হচ্ছে শক্তির সংকট। নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য শক্তির সংকট ঘটে–

- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক হারে শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে।
- উন্নয়নশীল দেশসমূহ ব্যাপক হারে দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করছে এবং যানবাহন ব্যবহার করছে। এ সকল নির্মাণ কাজে ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে অধিক শক্তি ব্যয় করছে।
- মানুষ উন্নত জীবনযাপনের জন্য বিলাসবহুল বাড়ির নির্মাণ করে। রেডিও, টিভি, ভিসিআর, কম্পিউটার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি অধিক হারে ব্যবহার করার ফলে শক্তির সংকট বাঢ়ে।
- মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম ও যোগাযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে অধিক শক্তি ব্যয় হচ্ছে।

উপরোক্ত কারণসমূহের পেছনে প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দিতে ব্যর্থ হলে তৈরি হয় শক্তির সংকট। তাই আমাদেরকে বিকল্প শক্তির সম্মতান করতে হচ্ছে।

### পাঠ-১২ : শক্তির বিকল্প উৎসের সম্মতানে

এ যাবৎ প্রাঙ্গ প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে তেল, গ্যাস, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অবিরত ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হলেও এর প্রারম্ভিক খরচ বেশি। শক্তি সরবরাহে রয়েছে অনিচ্ছয়তা ও বিপদের ঝুঁকি।

আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস অমূল্য সম্পদ, কিন্তু এটা নবায়নযোগ্য নয়। নবায়নযোগ্য নয় এমন কোনো শক্তির উৎসের উপর আর নির্ভর করা যায় না। আমাদের দেশের প্রায় ১৬ কোটি লোকের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য রান্না-বান্নার কাজে বছরে প্রচুর জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সব জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কাঠ, খড়কুটো, গোবর প্রভৃতি পচনশীল পদার্থ। এগুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু রান্নার কাজে ব্যয় হয়ে যাওয়ায় জৈব সার হিসেবে ব্যবহার সীমিত হচ্ছে। ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। রান্নার কাজে প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার সর্বাধিক। ফলে দেশের শুধু বনজ সম্পদই ধ্বংস হচ্ছে না, আমাদের পরিবেশেও নেমে আসছে বড় ধরনের বিপর্যয়।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করে জ্বালানির এ বিরাট খাতে বিকল্প উৎসের সম্মতি করা হচ্ছে অবিরত। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা বায়োগ্যাস প্রযুক্তি উন্নয়ন করেছেন। সৌরশক্তিকে আধিক্যভাবে হলেও কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। সৌরশক্তি, সমুদ্রস্তোত ও বায়ুশক্তিও এক একটা উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জৈব গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে সুন্দর পট্টিঅঞ্চলে জ্বালানি ছাড়াও বাতি ও টিভি চালানোর মতো বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এ প্রযুক্তি গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের উপর চাপ কমবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করে অধিক ফসল ফলানো যাবে। সর্বোপরি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রেখে যেতে পারব। সুতরাং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি অবলম্বন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

### পাঠ-১৩ : আমাদের জীবনে শক্তির প্রভাব ও এর সাধারণ ব্যবহার

প্রায় ঘোল কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের বাংলাদেশ। প্রতিবছর রান্না-বান্নার কাজে প্রচুর জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অধিকাংশ কাঠ, খড়কুটা, নাড়া, শুকনো গোবর ইত্যাদি। প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে এগুলো ব্যবহারের ফলে দেশের বনজ সম্পদ কমছে, মাটি উর্বরতা হারাচ্ছে এবং পরিবেশ বিগ্রহ হচ্ছে। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। ফলে আগামী দিনে বর্ধিত জনসংখ্যার জ্বালানি চাহিদা পূরণে আমাদেরকে হিমশিম খেতে হবে। জ্বালানি সংকট মোকাবিলার বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শক্তির ব্যবহার করছি। আমাদের বাঁচার জন্য যেমন শক্তির প্রয়োজন, তেমনি জীবনমান উন্নয়নের জন্যও শক্তির প্রয়োজন। শক্তি না হলে আমাদের জীবন চলে না। তাই শক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা দেখেছি যে, জীবশা জ্বালানি আমাদের শক্তির এক বিরাট উৎস। কিন্তু এ শক্তি সীমিত এবং এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই মানুষ শক্তির বিকল্প উৎসের সম্মতি সচেতন। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কিছুটা সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে। যতক্ষণ আমরা অফুরন্ত শক্তির কোনো উৎস হাতের কাছে না পাচ্ছি ততক্ষণ প্রাণ শক্তি ব্যবহারে আমাদের অবশ্যই সচেতন ও মিতব্যযী হতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

- শক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পদ না ভেবে সমষ্টিগত সম্পদ বিবেচনা করার মানসিকতা সৃষ্টি।
- রেডিও, টিভি, বাতি, এয়ারকন্ডিশন প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রয়োজনে ব্যবহার করে অন্য সময় ব্যবহার।
- ত্বরিতপূর্ণ যানবাহন বা যন্ত্রপাতি বেশি শক্তি ব্যয় করে। এ জন্য এ সকল সরঞ্জামাদির সঠিক সংরক্ষণ অপরিহার্য।
- বিনা কারণে/অপ্রয়োজনে যানবাহনের ইঞ্জিন চালু না রাখা।
- শক্তির সংরক্ষণ আমাদের ব্যক্তিগত খরচ কমায়।

#### নতুন শব্দ:

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি, শক্তির রূপান্তর, নবায়নযোগ্য শক্তি, অনবায়নযোগ্য শক্তি, বায়োগ্যাস, শক্তির সংকট ও বিকল্প শক্তির উৎস।

## ଏ ଅଧ୍ୟାର୍ଯେ ଆମରା ଯା ଶିଖିଲାମ

- কাজ করার সামর্থই হলে শক্তি।
  - আমাদের চারপাশে রয়েছে শক্তির বিভিন্ন উৎস।
  - শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।
  - নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন আমাদের দেশে অনস্বীকার্য, তেমনি এর প্রাপ্যতা অনেকটা সহজ।
  - দিন দিন বেড়েই চলছে শক্তির ব্যবহার, ফলে তৈরি হচ্ছে শক্তির সংকট।
  - দৈনন্দিন জীবনে শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা আমাদের নেতৃত্ব দায়িত্ব।

ଅନୁଶୀଳନୀ

শুন্যস্থান পূরণ কর

১. কাজ করার \_\_\_\_\_ হলো শক্তি।
  ২. জেনারেটর মূলত \_\_\_\_\_ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
  ৩. বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা যায় \_\_\_\_\_ ও \_\_\_\_\_ উপাদান থেকে।

সংক্ষিপ্ত উভয় প্রশ্ন

১. ক্ষমতা ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?
  ২. শক্তির নিত্যতা ব্যাখ্যা কর।
  ৩. শক্তির সংকট সৃষ্টির কারণগুলো উল্লেখ কর।
  ৪. অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা কীভাবে পাওয়া যায়?

ବ୍ୟାକନିର୍ଦ୍ଦାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. ii ও iii      গ. i ও iii      ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একজন ব্যায়ামবিদ ২০০ কেজির ভার উভোলন করেন এবং ভারটি নিচে নামান। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খাবার খেতে খেতে গান শুনতে লাগলেন।

৩. ভার উভোলন থেকে ভার নিচে নামানো পর্যন্ত শক্তির রূপান্তরের সঠিক ক্রম কোনটি?

- |                    |   |                 |   |                 |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| ক. রাসায়নিক শক্তি | → | যান্ত্রিক শক্তি | → | স্থিতি শক্তি    | → | যান্ত্রিক শক্তি |
| খ. যান্ত্রিক শক্তি | → | স্থিতি শক্তি    | → | যান্ত্রিক শক্তি | → | শব্দ শক্তি      |
| গ. স্থিতি শক্তি    | → | যান্ত্রিক শক্তি | → | শব্দ শক্তি      | → | তাপ শক্তি       |
| ঘ. যান্ত্রিক শক্তি | → | স্থিতি শক্তি    | → | যান্ত্রিক শক্তি | → | স্থিতি শক্তি    |

৪. ভার উভোলকের খাদ্য গ্রহণ ও গান শোনার সাথে কোন শক্তি দুইটির সম্পর্ক রয়েছে।

- ক. তাপ ও শব্দ  
 খ. তাপ ও বিদ্যুৎ  
 গ. রাসায়নিক ও শব্দ  
 ঘ. স্থিতি ও তাপ

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামিহার গ্রামের বাড়ি বিজয়নগরে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌছায়নি। তাই গ্রামবাসির অনেকেই সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। আবার গত ছুটিতে মামার সাথে সে কাঙাই বেড়াতে গিয়ে দেখে পানি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

- ক. শক্তির প্রধান উৎস কী?  
 খ. প্রাকৃতিক গ্যাস অনবায়নযোগ্য শক্তি কেন? ব্যাখ্যা কর।  
 গ. সামিহার দেখা কাঙাইয়ের পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. সামিহার গ্রামে ব্যবহৃত উদ্দীপকে উল্লিখিত শক্তির উপযোগিতা আলোচনা কর।

২. মুমিন সাহেব ইদানীং তাঁর হাঁস-মুরগী ও গরুর খামারের বিষ্টা আবর্জনা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের গ্যাস উৎপন্ন করছেন। এতে খামারের বিভিন্ন কাজে শক্তি ও গ্যাসের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত গ্যাস বিক্রি করতে পারছেন।

- ক. ক্ষমতা কী?  
 খ. শক্তি রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।  
 গ. উদ্দীপকে উৎপন্ন গ্যাস কোন ধরনের শক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. শক্তি সংরক্ষণে রাশেদ সাহেবের কার্যকর্মের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

## অষ্টম অধ্যায়

# শদের কথা

তোমার ঘরের দরজায় ঠক্ঠক শব্দ হলে ভূমি বুঝতে পার তোমার দরজায় কেট অপেক্ষা করছে। দরজার কলিকেল বাজলেও আমরা বুঝতে পারি কেট এসেছে। কারণ পাইর শব্দ শুনে ভূমি বুঝতে পার যে, কেট আসছে। আমরা যা কিছু শুনি, তাই হলো শব্দ। শব্দ আমাদের জীবনে খুবই পুরুষগুরু ভূমিকা পালন করে। এটা অনেকের সাথে বোগাবোগে সহজে করে। আমরা আমাদের চারপাশে নানা রকম শব্দ শুনতে পাই। বালির সুর, গাঢ়ির হর্ষ, কৃকুলের ঘেট ঘেট, ছাণদের ব্যা ব্যা, মুরগির কুকুরে, পাখির কলতান ইত্যাদি। শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা আমাদের শুনার অনুভূতি জন্মায়। শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়, কীভাবে সঞ্চালিত হয়, কীভাবে আমরা বিভিন্ন রকম শব্দ চিনতে পারি ইত্যাদি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।



### এ অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা

- শদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- শব্দ সঞ্চালন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কঠিন, তরল ও বাল্বীয় মাধ্যমে শদের বেগের ফুলনা করতে পারব।
- পাশী কীভাবে শব্দ শুনতে পাই ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রায়ত্তির সীমা ও নজেজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রে শব্দ সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে (নয়েজ ও দূরব) শদের ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।
- সলগত কাজে সহসাঠিদের বক্তব্য শুনব, সঙ্গির অন্তর্ভুক্ত করব এবং সিদ্ধান্ত গ্রন্থে সহযোগিতা করব।

### পাঠ-১: শব্দ ও এর ধরন

আমরা যা কিছু শুনি তাই হলো শব্দ। একটি সিলের বাটিকে ঘেঁষেতে ফেল, শব্দ শুনতে পাবে। তুমি যখন কথা বল তখন মুখ থেকে শব্দ শুনতে পাও। আরিয়ান তার গাড়ির এলার্মের শব্দে শুম থেকে উঠে। সে তার স্কুলে বাবার পথে নানা রকম শব্দ শুনতে পায়। পাখির কাকলি, রাস্তায় রিকশার বেলের টুট্টাং শব্দ, গাড়ির হর্ন, মানুষের হৈচৈ ইত্যাদি নানা রকম শব্দ। বস্তুর যখন কথা বলে তখন গলার স্বর থেকে সব রকম শব্দই তুমি চিনতে পার এবং বলতে পার কে কথা বলছে। আমরা যে সকল শব্দ শুনতে পাই তার মধ্যে কিছু আছে যা শুনিমধুর। এদের মধ্যে সুর আছে এবং শুনতে ভাল লাগে। এরকম শব্দ হলো বাঁশির সুর ও হারমোনিয়ামের শব্দ। কিছু আছে গোলমেলে, সুরহীন ও বিরক্তিকর। এ-রকম শব্দ হলো গাড়ির হর্নের শব্দ, লোহ কাটার শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ইত্যাদি।

**কাজ :** সুরযুক্ত ও সুরহীন শব্দ শনাক্ত করা।

**পদ্ধতি:** ৫/৬ জন করে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাও। তোমরা যে নানা রকম শব্দ শুনতে পাও, তাদের মধ্যে কোনগুলো সুরযুক্ত ও কোনগুলো সুরহীন তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করো। আলোচনা থেকে পাওয়া সুরযুক্ত ও সুরহীন শব্দের একটি তালিকা তৈরি কর। দলের একজন প্রেরিতে উপস্থাপন কর।

শব্দ সুরযুক্ত বা সুরহীন যাই হোকনা কেন সকল শব্দেরই একটি উৎস আছে। শব্দ কোনো না কোনো উৎসে উৎপন্ন হয়। শব্দের ধরন থেকে আমরা বুঝতে পারি শব্দের উৎস কী? যেমন ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনলে না দেখেই আমরা বুঝতে পারি কুকুর ডাকছে, টেলিফোন উঠালেই আমরা কষ্টস্বর শুনে বুঝতে পারি অপর থাক্কে কে কথা বলছে।

### পাঠ-২ ও ৩ : শব্দের উৎপত্তি

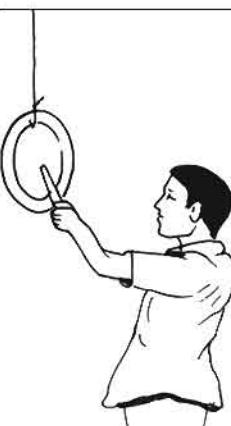
শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা আমাদের শ্রবণের অনুভূতি জন্মায়। এখানে আমরা কিছু কাজ করবো যা থেকে বোবা যাবে শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়। তোমাদের স্কুলের ঘন্টা যখন বাজানো হয়, তখন তা স্পর্শ করে দেখ। ঘন্টাটি যে কাপে তা কি অনুভব করতে পার?

**কাজ :** শব্দের উৎপত্তির কারণ জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি ধাতব পাত্র, কিছু দড়ি ও একটি লাঠি।

**পদ্ধতি :** ধাতব পাত্রটি (সিল বা অ্যালুমিনিয়ামের কোনো পাত্র হতে পারে) দড়ির সাহায্যে সুবিধাজনক স্থানে বুলিয়ে দাও। খেয়াল রাখতে হবে, এটা বেন কোনো কিছুকে স্পর্শ না করে। এবার লাঠি দিয়ে পাত্রটিকে আঘাত কর। তোমার হাতের আঙুল দিয়ে পাত্রটি আলতোভাবে স্পর্শ কর। তুমি কি পাত্রের কম্পন টের পাইছ? লাঠি দিয়ে পাত্রটিকে আবার আঘাত করো এবং সাথে সাথে তোমার হাত দিয়ে পাত্রটি শক্ত করে ধরে রাখ। এখনও কি শব্দ শুনতে পাইছ? না, শব্দ শোনা যায় না।

পাত্রটিকে আবার আঘাত কর, শব্দ শুনতে পাবে। শব্দ বস্থ হয়ে গেলে পাত্রটি স্পর্শ কর। এখনও কি পাত্রটি কাপছে? না, কাপছে না।



চিত্র-৮.১: শব্দের উৎপত্তি

**কাজ :** শব্দের উৎপত্তির কারণ জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি ধাতব (স্টিলের ধাতব),  
একটি চামচ ও কিছু পরিমাণ পানি।

**পদ্ধতি :** ধাতব পানি ঢালো। চামচ দিয়ে ধাতব এক  
পাত্তে আঘাত কর।

কৃষি কি শব্দ শুনতে পাই? ধাতাটিকে আবার আঘাত  
কর এবং সাথে সাথে ডোমার হাত দিয়ে ধাতাটি সুর্খ  
কর। ধাতাটি যে কাঁপছে, তা কি কৃষি টের পাই?

এখনও কি শব্দ শুনতে পাই? না, শব্দ শোনা যাবে না। ধাতাটিকে আবার আঘাত কর এবং পানির দিকে তাকাও।  
পানিতে কি কেনো চেউ দেখছ? ধাতা কাঁপার ফলে পানি কাঁপছে এবং পানিতে চেউরের সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র-৮.২: ধাতব শব্দের উৎপত্তি

উপরের কাঙ্গুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, কেনো বন্ধুর কল্পনের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়। কল্পনশীল  
যে বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো শব্দের উৎস।

#### পাঠ-৪: শব্দের সংকলন

আমরা জানি কল্পনশীল বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে। শ্রোতৃর নিকট এ শব্দ কী করে শোঝায়? একটি উদাহরণ  
বিবেচনা করা যাক। কেনো বাদ্যযন্ত্রের কল্পনশীল ভার বা কেনো সুরশাকুর কল্পনশীল বাহু এদের  
চারপাশের বাহুর অঙ্গুলোকে কল্পিত করে। বাস্তব এই কল্পিত অঙ্গুলো এদের কল্পনকে পার্শ্ববর্তী বাস্তব  
অঙ্গুলোতে স্থানান্তর করে দেয়। পর্যবর্ত্যে এভাবেই শব্দ চেউরের ঘটো উৎস থেকে  
শ্রোতৃর নিকট শোঝায়। কেনো মাধ্যমের কাঙ্গুলোর কল্পনের ফলে সৃষ্টি যে আলোকল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে  
চলে বা সংকলিত হয়, তাকে চেউ বলে। একটি শব্দ স্থির নিয়ে এর এক পাত্তে আঘাত করলে দেখবে শ্রীটির  
সংকেচন ও প্রসারণের ফলে শক্তি সংকলিত হচ্ছে। শব্দের চেউ ঠিক এভাবেই সংকলিত হয়। শব্দের এক  
স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতকে শব্দ সংকলন বলে।



চিত্র-৮.৩: শ্রীটের সংকেচন ও প্রসারণের ধারা শক্তি সংকলন

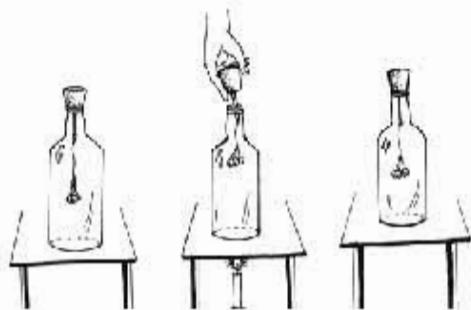
শব্দ সংকলনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। এই মাধ্যম হতে পাও কঠিন, তরল ও বারীয়। শব্দ সবচেয়ে মূল চলে  
কঠিন মাধ্যমে, তরল মাধ্যমে, এবং বারীয় মাধ্যমে। প্রয়োজনীয়তে কাজের মাধ্যমে আমরা তা প্রয়োজন করব।

শব্দ কি মাধ্যম ছাড়া চলতে পাও? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা একটি কাজ করব।

**কাজ :** মাধ্যম ছাড়া শব্দ সঞ্চালিত হয় না তা জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি ধাতব বুনবুনি, একটি সুরু কাঠি, একটি বড় মুখওয়ালা বোতল ও একটি কর্ক।

**পদ্ধতি :** কাঠির এক মাথায় বুনবুনিটিকে সূতা দিয়ে বাঁধ। কাঠির অপর মাথাটি কর্কের ডিক্ষেত্রে মুখে ঢুকাও। এবার পুরো ঘ্যবস্থাটিকে বোতলের ডিক্ষেত্রে অবস্থানে ঢুকাও কর্কটি বেন ছিপিয়ে কাজ করে। ভালো করে ছিপিটি বন্ধ কর এবং বোতলটি বাঁকাও। খেয়াল রাখবে বুনবুনি যেন বোতলের দেহাল ঝর্ণ না করে।



চিত্র-৮.৪ : মাধ্যম ছাড়া শব্দ সঞ্চালিত হয় না তা জানা

বাইরে থেকে বুনবুনির শব্দ শুনতে পাবে। এবার কর্কটি খুলে একটু উচু করে গ্রাহে বোতলের নিচে একটি মূলত মোমবাতি দিয়ে তাপ দাও। পরামে বোতলের সব বাতাস বেরিয়ে যাবে। বোতলের ছিপিটি বন্ধ কর। বোতলটি ঠাঙ্গা হওয়ার পর আবার বাঁকাও। কোনো শব্দ শুনতে পাই কি?

না, কোনো শব্দ শোনা বাছে না বা খুব কীর্তি শব্দ শোনা যাবে। এর অর্থ কী? এর অর্থ শব্দ মাধ্যম ছাড়া সঞ্চালিত হয় না।

#### পাঠ- ৫ : তরল পদার্থে শিশুর সংরক্ষণ ও শিশুর বেগ

আমরা আপেই বলেছি যে, শব্দ সংরক্ষণের অন্য মাধ্যম দরকার। মাধ্যম ছাড়া শব্দ সঞ্চালিত হয় না। শব্দ সরচেয়ে মৃত চলে কঠিন মাধ্যমে, ভারপুর তরল মাধ্যমে, অবশ্য বায়বীয় মাধ্যমে। পরবর্তীতে কাজের মাধ্যমে আমরা তা প্রয়োগ করব।

**কাজ :** তরল পদার্থে শিশুর সংরক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি কেজুন ও কিছু পরিমাণ পানি।

**পদ্ধতি :** কেজুনটিতে পানি ভর্তি কর। কেজুনের একমিক তোয়ার

কানের সাথে ধর এবং অপর দিকে আস্তে করে কেজুনে ওঁচড় কাট।

তুমি কি ওঁচড়ের শব্দ শুনতে পাইছো?

তুমি ওঁচড়ের শব্দ জোরে ও স্বচ্ছ শুনতে পাবে।



চিত্র- ৮.৫ : তরল পদার্থে শিশুর সংরক্ষণ

### পাঠ- ৬ : কঠিন পদাৰ্থে শব্দেৱ সংৰাজন ও শব্দেৱ বেগ

কঠিন যাধ্যমে শব্দ বায়ু ও তরল যাধ্যমেৰ চেয়ে হৃত ও ভালভাৱে সংৰাজিত হয়।

**কাজ:** কঠিন পদাৰ্থে শব্দেৱ সংৰাজন।

**শায়োভীৰ উপকৰণ:** একটি ধাতব স্কেল বা দস্তা ধাতব দণ্ড।

**প্ৰক্ৰিয়া:** স্কেল বা দণ্ডেৱ এক পাত্ৰ তোমার কানেৱ সামৰে  
ধৰ এবং অন্য পাত্ৰ তোমার কোনো বস্তুকে আমেত আমেত  
আঁচড় কৰিবলৈ বলো। ভূমি কি আঁচড়েৱ শব্দ শুনতে পাইছো?  
তোমার আলোগাণে সৌভাগ্যে আকাৰ বৰ্ণনেৱ জিজ্ঞাসা কৰ  
কোনো শব্দ শুনতে পাইছ কি না?



চিত্ৰ ৮.৬ : কঠিন পদাৰ্থে শব্দেৱ সংৰাজন

এৱেক্ষণ একটি পৰীক্ষা তোমৰা একটি কাস্টেৱ বা ধাতব টেবিল নিয়ে কৰিবলৈ পাই। কাজটি কৱে দেখ এবং  
কাজটি থেকে কী পেলে তা তোমাদেৱ খাত্তার শিখ। কাজটি থেকে জানতে পাৱবে বৈ, শব্দ কোনো ধাতু বা কঠ  
দিয়েও চলাচল কৱে বা সংৰাজিত হয়। বিভিন্ন কঠিন পদাৰ্থে শব্দেৱ বেগ বিভিন্ন ব্রহ্ম।

**ছক :** বাবুবীয়, তৰল ও কঠিন যাধ্যমে শব্দেৱ বেগেৰ ফুলনা

বাযুতে শব্দেৱ বেগ ৩৪৩ মিটাৰ/সেকেণ্ট

পানিতে শব্দেৱ বেগ ১৪৯৬ মিটাৰ/সেকেণ্ট

আলুমিনিয়ামে শব্দেৱ বেগ ৬৪২০ মিটাৰ/সেকেণ্ট

সুতৰাং বিভিন্ন যাধ্যমে শব্দ বিভিন্ন বেগে সংৰাজিত হয়। কঠিন যাধ্যমে শব্দ বাযু ও তরল যাধ্যমেৰ চেয়ে  
হৃত ও ভালভাৱে সংৰাজিত হয়। আবাৰ শব্দ বাযু যাধ্যমেৰ চেয়ে হৃত ও ভালভাৱে তরল যাধ্যমে সংৰাজিত হয়।

### পাঠ- ৭ : প্ৰাণীৰা কীভাৱে শব্দ শুনতে পায়

আমৰা জনি কল্পনীৰ কম্ভু শব্দ উৎপন্ন কৱে এবং সেই শব্দ যাধ্যম দিয়ে সকল দিকে সংৰাজিত হয়। এখন  
প্ৰশ্ন হলো, আমৰা কী কৱে শব্দ শুনতে পাই?

আমাদেৱ কানেৱ বাইত্তেৰ অংশেৱ আকৃতি দেখতে অনেকটা ফালেজেৱ মতো। শব্দ বৰ্ধন এৱ ডিতৰ প্ৰৱেশ  
কৱে; তখন শব্দ একটি ছিন্পথে যাব যাৰ শেষ পৰি আজো একটি টানটান পাৰ্শ্বাৰ্থী পৰ্মা থাকে। একে বলা হয় কানেৱ  
পৰ্মা। এই পৰ্মা একটি পুৰুষপূৰ্ণ কাজ কৱে। কাজটি হলো, শব্দেৱ কল্পন কানেৱ পৰ্মাকে বৰ্গায়।

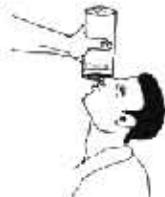
পৰ্মা এই কল্পনকে কানেৱ বিভিন্নেৱ অংশে শৌচে দেয়। সেখান থেকে শব্দ অস্তিত্বকে শৌচায়। এভাৱেই  
আমৰা শব্দ শুনতে পাই। কানেৱ পৰ্মা যে পুৰুষপূৰ্ণ কাজ কৱে, তা জনাব জন্য আমৰা একটি পৰীক্ষা কৰিব।

**কাজ :** শব্দের কল্পনা বীভাবে কানের পর্যায় কল্পনা সৃষ্টি করে।

**শব্দোচ্চনীয় উপকরণ :** চিনের একটি পাত্র (সহ্য ছিলেন ক্যান নিতে পার) ও একটি রবারের বেগুন।

**পদ্ধতি:** ক্যানের দুই মাথা কেটে সাও। কেনুন্টি টাইটাস করে শাশিয়ে রাখার ব্যাক বা সূতা দিয়ে বেঁধে ক্যানের এক মাথা বন্ধ করে দাও। টাইটাস করা কেনুন্টের উপর ৪/৫ টা গমের দালা বা চাল রাখ। কোয়ার কোনো বস্তুকে ক্যানের খেলা সুন্দর সামনে ‘কুয়ার’ ‘কুয়ার’ শব্দ করতে বলো। খেলার ক্ষেত্রে সেখ গম বা চাল এর কী ঘটছে? গম বা চাল উপরে নিতে লাকাছে কেন?

তোমার কল্পনা সৃষ্টি শব্দের কল্পনা কেনুন্টে কল্পনা সৃষ্টি করছে, তাই গম বা চাল লাকাছে।



চিত্র-৪.৭: শব্দের কল্পনা কানের পর্যায় কল্পনা সৃষ্টি করে

## পাঠ ৮ ও ৯ : আব্যাকার সীমা ও নিরেজ

আমরা জানি যে, কোনো বস্তুর কল্পনার ক্ষেত্রে শব্দের উৎপত্তি হয়। সকল কল্পনালীল কল্পনার শব্দ কি আমরা শুনতে পাই? না, সকল কল্পনালীল কল্পনার শব্দ আমরা শুনতে পাই না। যে শব্দ প্রতি সেকেতে ২০ সিরি ক্ষম কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি হয়, তা আমরা মানুষেরা শুনতে পাই না। এরকম শব্দ প্রবণ উপরোক্তি নয়। এরকম শব্দকে প্রতিশূর্ণ শব্দ বলা হয়। আবার অনেক বেশি কল্পনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি শব্দকে আমরা শুনতে পাইনা। প্রতি সেকেতে ২০,০০০-এর বেশি কল্পনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি শব্দকেও শুনতে পাই না। একে প্রতি-উভয় শব্দ বলা হয়। সূত্রাং মানুষের অন্য আব্যাকার সীমা হলো ২০ থেকে ২০,০০০ কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি শব্দ। প্রতি সেকেতে কোনো বস্তু ঘটটা কল্পনা দেখ তাকে বলা হয় এই কল্পনার কল্পনা। এই কল্পনাক প্রকাশের একক হলো হার্জ। কোনো বস্তু সেকেতে ২০ বার কাঁপলে তার কল্পনাক ২০ হার্জ, ২০,০০০ বার কাঁপলে ২০,০০০ হার্জ। সূত্রাং মানুষের কানের আব্যাকারের সীমা ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ। এই সীমার মধ্যে কল্পনারের শব্দকে আব্যাক শব্দ বলে।

কোনো কোনো প্রাণী ২০,০০০ হার্জ কল্পনারের চেয়ে বেশি কল্পনারের শব্দ শুনতে পায়। কুকুরের এই ক্ষমতা আছে। পুরুষ অতি উচ্চ কল্পনার ছাইসেল ব্যবহার করে যা কুকুর শুনতে পায় কিন্তু মানুষ শুনতে পায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক অঙ্গসমূহ (প্রতি-উভয় শব্দ ব্যবহারকারী) বজ্রের সাথে আমরা পরিচিত। এরকম বজ্রের একটি হলো আল্ট্রাসেন্সেরিয়াম। এ বজ্র ২০,০০০ হার্জের চেয়ে বেশি কল্পনারের শব্দের সাহার্যে কাজ করে।

**সুরোধ শব্দ ও নিরেজ:** আমাদের চারপাশে আমরা নানারকম শব্দ শুনতে পাই। এদের মধ্যে অনেক শব্দ শুনতে তালো শালে, সুরক্ষা ও আনন্দদায়ক। এরকম শব্দ হলো গানের সুর, বাঁশির সুর, হারমোনিয়ামের শব্দ, সেতারের বাজনা ইত্যাদি। এরকম শব্দ সুরোধ বা সুজ্ঞে। অনেক শব্দ শুনতে কষ্ট লাগে, ব্যর্থাদায়ক ও বিপ্রিত্বকর। এরকম শব্দ হলো পেরেক ঠোকার শব্দ, নির্মাণ কর্জের শব্দ, বোর্ড সেখার সময় চক্রের বিচ্ছিন্ন

শব্দ ইত্যাদি। যে শব্দ শুনতে ভাল লাগে, সুখকর, মধুর ও আনন্দদায়ক তাদের সুগামী বা সুরেলা শব্দ বলে। বস্তুর নিয়মিত বা সুষম কম্পনের ফলে সুগামী শব্দ উৎপন্ন হয়। যে শব্দ শুনতে কষ্ট লাগে, যন্ত্রনাদায়ক ও বিরক্তিকর তাদের নয়েজ বা গোলমাল বলে।

**শব্দ দূষণ:** আমরা সবাই পানি দূষণ ও বায়ু দূষণের সাথে পরিচিত। পানিতে যা যা থাকা উচিত তা না থেকে যদি অন্য কিছু থাকে, তা হলে তাকে আমরা পানি দূষণ বলি। বায়ুতে যা যা থাকা উচিত তা না থেকে যদি অন্য কিছু থাকে তা হলে তাকে আমরা বায়ু দূষণ বলি। এরকম আমাদের পরিবেশে যদি অতিরিক্ত বা অবাস্থিত শব্দ থাকে, তখন তাকে বলি শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণের প্রধান প্রধান কারণ হলো গাড়ির শব্দ, কোনো বিষ্ফোরণের শব্দ (পটকা বা বোমা ফাটার শব্দ), কোনো যন্ত্রের শব্দ, মাইক্রো শব্দ, নির্মাণ কাজের শব্দ। এছাড়া টেলিভিশন ও রেডিও জোরে বাজানোর শব্দ, রান্না ঘরের জিনিসপত্রের শব্দ, এয়ারকুলারের শব্দ ইত্যাদি শব্দ দূষণের কারণ।

**কাজ :** তোমার এলাকায় শব্দদূষণের কারণগুলো চিহ্নিত কর এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কারণগুলো খাতায় লেখ। ৫/৬ জনের দল করে এ কাজটি করতে পার।

**শব্দ দূষণের ফলে কী ক্ষতি হয়?**

তোমরা কি জান, চারপাশের অতিরিক্ত শব্দ নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা হলো, অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, বিরক্তি, দুর্ভাবনা ও আরো অনেক রকম সমস্যা। কোন মানুষ অনেক দিন অতিরিক্ত জোরালো শব্দ শুনলে কানে কম শুনতে পারে বা নাও শুনতে পারে।

**শব্দ দূষণ কীভাবে রোধ করা যায়?**

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শব্দের উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা কীভাবে করা যায়? কোনো আবাসিক এলাকায় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে—

- নয়েজ সৃষ্টিকারী সব কিছুকে এলাকার বাইরে রাখতে হবে।
- নয়েজ সৃষ্টিকারী কোনো কলকারখানা আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাবে না।
- যানবাহনের হর্ন যতটা সম্ভব কম বাজাতে হবে।
- রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র উচ্চ শব্দে বাজানো যাবে না।
- রাস্তার পাশে, ঘরবাড়ির চার দিকে গাছপালা লাগাতে হবে, যাতে ঘরবাড়িতে শব্দ কম পৌছায়।

এছাড়া শব্দ দূষণ রোধ করতে বিমানের ইঞ্জিন, যানবাহনের ইঞ্জিন ও কলকারখানার মেশিনে সাইলেনসার লাগাতে হবে। সাইলেনসার হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যা উৎপন্ন শব্দকে বাইরে যেতে দেয় না।

## পাঠ- ১০ ও ১১: শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র

শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র দুরক্ষের—সুরেলা যন্ত্র ও বেসুরো যন্ত্র। সুরেলা যন্ত্র হলো, বাঁশি, হারমোনিয়াম, একতারা, দোতারা, সেতার ইত্যাদি। বেসুরো যন্ত্র অনেক তবে আমাদের অতি পরিচিত দুটি হলো, গাড়ির হর্ন ও সাইকেল বা রিকশাৰ বেল।

**বাঁশি :** বাঁশির ডিত্তরকার বাজাসের কল্পনের ফলে সুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু দিয়ে বাঁশির নলে বাজাস চুকানো হয়। বাঁশির দৈর্ঘ্য ও ছিপ সংখ্যার উপর শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে।

**কাঞ্জ :** একটি খোলা নলের দৈর্ঘ্যের সাথে শব্দের তীক্ষ্ণতার

পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি পান করার নল ও একটি কৌচি।

**প্রক্রিয়া :** নলটির এক প্রান্ত চেপ্টা করে নাও। অধিন চেপ্টা

প্রান্তটি টিপ্পের মতো সমৃ করে কাট। কাটা প্রান্তটি মুখে দিয়ে কিন্তু দাও।

কী নম্বর শব্দ হয় লক কর। এবার নলের অপর প্রান্তটি কেটে খাটো কর। উৎপন্ন শব্দের তীক্ষ্ণতার কোনো পার্শ্বক্য শুনতে পাই কি?

খাটো নলে শব্দের তীক্ষ্ণতা বেশি।



চিত্র-৮.৮: নলের দৈর্ঘ্যের সাথে

শব্দের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন দেখা

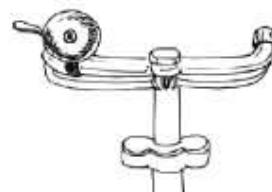
**একতারা ও দোতারা :** একতারা তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। এসব যন্ত্রে তারের কল্পনের ফলে সুরাব্য বা সুরেলা শব্দ সৃষ্টি করা যায়। এসব বাদ্যযন্ত্রের তারকে টেনে ছেড়ে দিলে বা কোনো কিন্তু দিয়ে নাড়াচাঢ়া করলে তা কৌগে এবং সুরেলা শব্দ উৎপন্ন করা যায়। তারের দৈর্ঘ্য ও পুরুত্ব বাড়িয়ে বা কমিয়ে এবং বেশি শক্ত করে টানটান করে শব্দের তীক্ষ্ণতা পরিবর্তন করা যায়।



চিত্র-৮.৯: একতারা ও দোতারা



**সাইকেল বা রিকশার বেল :** আমরা সাইকেল বা রিকশার বেলের টুটোঁ শব্দের সাথে পরিচিত। কিন্তু এই বেল কী করে শব্দ উৎপন্ন করে তা তোমরা জান কি? এই বেলে পোলাকার একটি ধাতব বাটি উপস্থ করে আঁথা হয়। বাটিটি নিচে একটি ধাতব হাতুড়ি লাগানো হয়। একটি হাতলের সাহায্যে হাতুড়ি নাড়াচাঢ়া করলে তা বাটিকে আঁথাক করে। বাটিটি কল্পনের ফলে টুটোঁ শব্দ বাজে।



চিত্র-৮.১০: সাইকেলের বেল

এই অধ্যাতে শেখা নতুন শব্দ

শ্রাব্য, অশ্রাব্য, কানের পর্ণা, ধূতি-গুর্ব শব্দ, ধূতি-উজ্জ্বল শব্দ, সুরাব্য শব্দ, নঞ্জের শব্দ দূরণ।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়।
- শব্দ সংগ্রালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। ভ্যাকুয়াম বা শূন্য মাধ্যমে শব্দ চলতে পারে না।
- মানুষের কানের শ্রাব্যতার সীমা ২০-২০,০০০ হার্জ।
- কুকুর ২০,০০০ হার্জের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্গের শব্দ শুনতে পায়।
- ২০ হার্জ কম্পাঙ্গের নিচের শব্দকে শুন্তি-পূর্ব শব্দ বলে।
- ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্গের শব্দকে শুন্তি-উভয় শব্দ বলে।
- শব্দের বেগ কঠিন পদার্থে সবচেয়ে বেশি এবং বায়বীয় পদার্থে সবচেয়ে কম।
- বিরক্তিকর শব্দ হলো নয়েজ।
- পরিবেশে অতিরিক্ত বা অবাস্তুত শব্দের উপস্থিতি হলো শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- শব্দ দূষণ থেকে অনিদ্রা, মাথাব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, কানে কম শোনা, বিরক্তি ইত্যাদি রোগ হতে পারে।
- রাস্তা বা বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগিয়ে শব্দ দূষণ কমানো যায়।

### অনুশীলনী-৮

#### শূন্যস্থান পূরণ কর

১. শব্দ কোনো \_\_\_\_\_ ছাড়া সঞ্চালিত হয় না।
২. মানুষের কানের শ্রাব্যতার সীমা \_\_\_\_\_ হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ।
৩. অবাস্তুত ও বিরক্তিকর শব্দ হলো \_\_\_\_\_।
৪. শব্দের বেগ বায়বীয় পদার্থে সবচেয়ে \_\_\_\_\_।
৫. ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্গের শব্দকে \_\_\_\_\_ শব্দ বলে।

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শ্রাব্য ও অশ্রাব্য শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী?
২. শুন্তি-পূর্ব ও শুন্তি-উভয় শব্দ কাকে বলে?
৩. নয়েজ ও সুশ্রাব্য শব্দের পার্থক্য কী?
৫. সকল কম্পাঙ্গের শব্দ কি আমরা শুনতে পাই? আমাদের শ্রাব্যতার সীমা কত?

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি?

ক. শূন্য মাধ্যম      খ. কঠিন মাধ্যম      গ. বায়বীয় মাধ্যম      ঘ. তরল মাধ্যম

নিচের অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পঢ়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উভয় দাও:

চন্দ্র পৃষ্ঠে প্রচন্ড বিস্ফোরণ এবং পৃথিবী পৃষ্ঠে বড় মাঠের দূরপ্রান্তে বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হলো। উভয় ক্ষেত্রে স্ফট আলোর বলকানি দেখা গেল।

২. চম্পুঁটে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে হলে পৃষ্ঠিবী থেকে—

- i. চম্পের দূরত্ব কম হতে হবে
- ii. পৃষ্ঠিবী ও চম্পের মাঝে মাধ্যম থাকতে হবে
- iii. শব্দের কম্পাক্ষ ২০ থেকে ২০০০০ হার্জ হতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i      খ. ii      গ. iii      ঘ. ii ও iii

৩. উভয় ঘটনা একইসাথে সংঘটিত হয়ে থাকলে কোনটি সবশেষে পর্যবেক্ষণ করা যাবে?

- ক. বন্দুকের গুলির শব্দ      খ. বন্দুকে সৃষ্টি আলো      গ. বিস্ফোরণের শব্দ      ঘ. বিস্ফোরণের আলো

৪. ভিতরের বাতাসে কম্পনের ফলে সূর সৃষ্টি হয় কোন বাদ্যযন্ত্রে?

- ক. সেতার      খ. একতারা      গ. গিটার      ঘ. বাঁশি

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. শব্দের বেগ ৩০০ মি/সে (বাস্তুতে) সম্মুদ্রের  
পানিতে শব্দের বেগ ১৫০০ মি/সে তীরে  
দাঁড়ানো লোকটি ও ছবুরি বোমা ফাটার  
হান থেকে ৩০০০ মিটার দূরে আছে।



ক. শব্দ কী?

- খ. রেল লাইনের পাতে কান রাখলে দূর থেকে রেলগাড়ি চলার শব্দ শুনা যায় কেন?  
গ. বোমা ফাটার স্থান থেকে তীরে অবস্থিত লোকটি কতক্ষণ পর শব্দ শুনবে।  
ঘ. বোমা ফাটার শব্দ ভূমির কি একই সময়ে শুনতে পারবে? তোমার উভয়ের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. এতদিন যাবৎ তপনের বাসা থেকে স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনির শব্দ শোনা যেত না। সম্প্রতি ঘণ্টাটির উজ্জ্বল  
ঠিক রেখে গঠনে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে এখন সে বাসা থেকেই ঘণ্টাধ্বনির শব্দ শুনতে পারে।

ক. সুন্দর শব্দ কী?

- খ. বাঁশির বাঁশির নলের দৈর্ঘ্য কম হলে শব্দের তীক্ষ্ণতার ক্ষীরূপ পরিবর্তন আসবে?  
গ. স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনি তপনের কানে পৌছার কৌশল বর্ণনা কর।  
ঘ. ঘণ্টায় কোন ধরনের পরিবর্তনের কারণে তপন বাসা থেকেই এখন ঘণ্টার শব্দ শুনতে পায়। উপর্যুক্ত  
কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

## ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

# ତାପ ଓ ତାପମାତ୍ରା

ତାପ ମାନୁଷେର ଜ୍ଞାନ ଅପରିହାର୍ୟ ଏକଟି ଶକ୍ତି । ତାପ ଆମାଦେର ଗୁରୁମେର ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ । ଆର କତୁକୁ ଗୁରୁମ ଅନୁଭୂତି କରିଛି ତା ପ୍ରକାଶ କରା ହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଦିଯେ । ବେଣି ତାପମାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ ଥେକେ କମ ତାପମାତ୍ରାର ସ୍ଥାନେ ତାପ ତିନଟି ପ୍ରକିଳ୍ପାୟ ସଞ୍ଚାଲିତ ହ୍ୟ । ତାପ ଦିଲେ ବା ସରିଯେ ନିଲେ ଅର୍ଥାଏ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଫଳେ ବାୟୁର ଚାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହ୍ୟ । ତାପେର ଏମନ ପ୍ରଭାବ ଆମାଦେରକେ ନାନା ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

### ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଶେଷେ ଆମରା

- ତାପ ଓ ତାପମାତ୍ରାର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ କରତେ ପାରିବ ।
- ଫାରେନହାଇଟ୍ ଓ ସେଲସିଆସ ସ୍କେଲେର ମଧ୍ୟେ ସଞ୍ଚାର ସ୍ଥାପନ କରତେ ପାରିବ ।
- ଥାର୍ମୋମିଟାର ବ୍ୟବହାର କରେ ସୂଚନାବେ ତାପମାତ୍ରା ପରିମାପ କରତେ ପାରିବ ।
- ବାୟୁର ଚାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ ।
- ବାୟୁର ଚାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଉପର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନେର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାରିବ ।
- ପଦାର୍ଥର ତାପୀୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ ।
- ତାପ ସଞ୍ଚାଲନେର ପ୍ରକିଳ୍ପା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ ।
- ଚାରପାଶେ ସଂଘଟିତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟନାର ତାପ ସଞ୍ଚାଲନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ ।
- ବିକିରିକ ଓ ଶୋସକେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ କରତେ ପାରିବ ।

### পাঠ ১ : তাপ

এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগে আছে পদার্থ যাদের ওজন বা ভর আছে, জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা দেয়। অন্যভাগে আছে শক্তি। এদের কোনো ওজন নেই, জায়গা দখল করে না বা বল প্রয়োগে কোনো বাধা দেয় না। এদের আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি। তাপ এমন এক ধরনের শক্তি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাপকে কেবল ত্বক দ্বারা অনুভব করা যায়।

**কাজ :** প্রথমে দুটি প্লাস নাও। প্লাস দুটিকে ধরে দেখ কেমন ঠাণ্ডা বা গরম। এবার একটি প্লাসে গরম পানি ও অন্যটিতে বরফের টুকরা নাও। দুই মিনিট অপেক্ষা কর। প্লাস দুটি থেকে পানি ও বরফ ফেলে দাও। এবার পালা করে দুটি প্লাস ধর। কোন প্লাসটি কেমন অনুভব করলে? একটি প্লাস গরম অন্যটি ঠাণ্ডা। এবার তোমরা আলোচনা কর, গরম প্লাসটিতে কী এমন আছে যার কারণে গরম লাগল? অন্য প্লাসটি কেন ঠাণ্ডা লাগল? এটাতে কী আছে বা নেই?

**সাবধানতা:** গরম পানি এমনভাবে ঢালবে, যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা প্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না।

আমরা বলতে পারি, কোন কিছু ঠাণ্ডা না গরম তার পেছনে রয়েছে তাপ। তাপের কারণে কোন কিছুকে আমাদের ঠাণ্ডা বা গরম বোধ করি। বস্তু যখন তাপ গ্রহণ করে তখন তা গরম হয়। আবার বস্তু যখন তাপ বর্জন করে তখন সেটি ঠাণ্ডা হয়। গরম প্লাসটি গরম পানি থেকে তাপ গ্রহণ করেছে। তাই এটাকে গরম লাগছে। আবার অন্য প্লাসটি বরফকে কিছু তাপ দিয়ে দিয়েছে। তাই এটাকে ঠাণ্ডা মনে হয়েছে।

### পাঠ ২ : তাপমাত্রা

তোমরা জানলে তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো বস্তুকে গরম বা ঠাণ্ডা লাগে। এবার আরেকটি কাজ করা যাক

**কাজ :** একটি স্টিলের প্লাস হাত দিয়ে ধরে দেখ। এটা কি ঠাণ্ডা না গরম তা মনে রাখ। এবার প্লাসটিতে গরম পানি ঢেলে পূর্ণ কর। এবার দুই মিনিট পর পর কয়েকবার প্লাসটি ধর। অনুভব করছ কি প্লাসটি আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাচ্ছে? এবার পানি ফেলে দিয়ে এক মিনিট পর পর প্লাসটি ধর, প্লাসটি ঠাণ্ডা হচ্ছে।

**সাবধানতা:** গরম পানি এমনভাবে ঢালবে যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা প্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না। হাত দিয়ে গরম পানিপূর্ণ প্লাস বেশিক্ষণ ধরে রাখবে না।

তোমরা দেখলে গরম পানিতর্কি প্লাসটি ধীরে ধীরে গরম হয়েছে। আবার গরম পানি ফেলে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। কতটুকু গরম বা ঠাণ্ডা তা বোঝাতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা ব্যবহার করা হয়। বেশি গরম হলে তাপমাত্রা বেশি, কম গরম হলে তাপমাত্রা কম। এভাবে তাপমাত্রা কোনো কিছুর তাপীয় অবস্থাকে প্রকাশ করে।

তাহলে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য কী বুবলে?

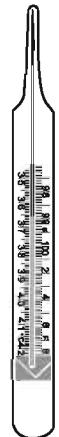
তাপ হলো এক ধরনের শক্তি, যার কারণে কোনো কিছুকে ঠাণ্ডা বা গরম লাগে। অন্যদিকে কতটুকু ঠাণ্ডা বা গরম লাগছে তা প্রকাশ করার মাত্রাকে তাপমাত্রা বলে।

### পাঠ ৩- ৫ : তাপমাত্রার পরিমাপ

আমরা আগের কাজটিতে দেখেছি গরম পানিপূর্ণ গ্লাসটি দুই মিনিট পরপর হাত দিয়ে ধরলে গরম ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কোনোদিন সকালে কম গরম থাকে কিন্তু দুপুরে গরম বেশি থাকে। আমরা কোনো কিন্তু ধরলে বা আমাদের ভুকের স্পর্শে কিছুটা বুঝতে পারি গরম বেড়েছে না কমেছে। কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে বলা যায় না কতটা গরম বেড়েছে। সঠিকভাবে বলার জন্য আমরা যত্নের সাহায্যে তাপমাত্রা মেপে থাকি। তাপমাত্রা পরিমাপের যত্নের নাম হলো থার্মোমিটার। থার্মোমিটার ব্যবহার করে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হয়। আবহাওয়াবিদগণ বাস্তুর তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করেন। শিল্পকারখানায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। সেজন্য কলকারখানায়ও থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়।

তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে তরল পদার্থের আয়তন বাড়ে বা কমে। তরল পদার্থের আয়তন কতটুকু বাড়ে বা কমে তা মেপে তাপমাত্রা কতটুকু বাড়ে বা কমে গেল তা বের করা হয়। থার্মোমিটারে পারদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি তরল ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়। নিচে একটি পারদ থার্মোমিটারের বর্ণনা দেওয়া হলো।

**পারদ থার্মোমিটার :** যে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়, তাই পারদ থার্মোমিটার। আমরা সবাই জ্বর মাপার থার্মোমিটার দেখেছি। এটি একটি পারদ থার্মোমিটার। পাশের চিত্রের মতো এ থার্মোমিটারে সরু ও সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাঁচনল থাকে। নলটির একপাশে পাতলা দেয়ালসহ একটি বাল্ব থাকে। বাল্বটি পূর্ণ করে ফাঁপা নলটির কিছু অংশে পারদ ভরা হয়। নলের বাকি অংশে খুব সামান্য পরিমাণ পারদ বাস্প থাকে। নলটির গায়ে তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা হয়। থার্মোমিটারের নলের ছিদ্রটি খুব সরু। তাই বাল্বের তাপমাত্রা একটু বাড়লেই সরু ছিদ্র দিয়ে পারদ অনেকখানি উপরে চি-১.১: থার্মোমিটার উঠে যায়। পারদ নলের কোন দাগ পর্যন্ত উঠল তা দেখে বোবা যায় তাপমাত্রা কতটুকু বেড়েছে।



**নিজেরা কর :** থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর নির্ণয়।

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এর চেয়ে তাপমাত্রা বেশি হলে জ্বর হয়েছে বলে ধরা হয়। একটি ডাক্তারি থার্মোমিটার ব্যবহার করে তোমার শ্রেণির পাঁচজন শিক্ষার্থীর শরীরের তাপমাত্রা মেপে খাতায় লিখ। এ থেকে সিদ্ধান্ত নাও কারো জ্বর হয়েছে কিনা?

#### তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল

কোনো কিছু পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শমান ঠিক করে নেওয়া হয়। তারপর সেই আদর্শ মানের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো কিছুর পরিমাপ বের করা হয়। তাপমাত্রা পরিমাপের এ রকম আদর্শ মান আছে। এক্ষেত্রে দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবধানের একটি অংশকে আদর্শমান ধরে নেওয়া হয়। এই দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থিরাঙ্ক বলে। একটিকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ও অন্যটিকে উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে।

**নিম্ন স্থিরাঙ্ক:** স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বলে।

**উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক:** স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে।

উর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করা যায়। এ ব্যবধানকে কয়টি সমান অংশে ভাগ করা হলে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায়। তাপমাত্রা পরিমাপের দুইটি স্কেল প্রচলিত। নিচে এ দুটি স্কেল ব্যাখ্যা করা হলো।

**সেলসিয়াস স্কেল:** এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে  $0$  ডিগ্রি ( $0^{\circ}$ ) এবং উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে  $100$  ডিগ্রি ( $100^{\circ}$ ) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান একশত ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ( $1^{\circ}$  সে.) বলা হয়।

বিজ্ঞানী সেলসিয়াস এ স্কেল উজ্জ্বল করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলটিকে সেলসিয়াস স্কেল বলা হয়। বৈজ্ঞানিক কাজে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কাজেও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। যেমন আবহাওয়ার খবরে বলা হয়, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল  $32$  ডিগ্রি সেলসিয়াস।  $0^{\circ}$  থেকে  $100^{\circ}$ -এর মধ্যবর্তী দূরত্বকে  $100$  ভাগে ভাগ করা হয় বলে একে সেন্টিগ্রেড (Centi অর্থ একশত এবং grade অর্থ ভাগ) স্কেলও বলা হয়।

**ফারেনহাইট স্কেল :** এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে  $32$  ডিগ্রি ( $32^{\circ}$ ) এবং উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে  $212$  ডিগ্রি ( $212^{\circ}$ ) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান  $180$  ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি ফারেনহাইট ( $1^{\circ}$  ফা.) বলা হয়।

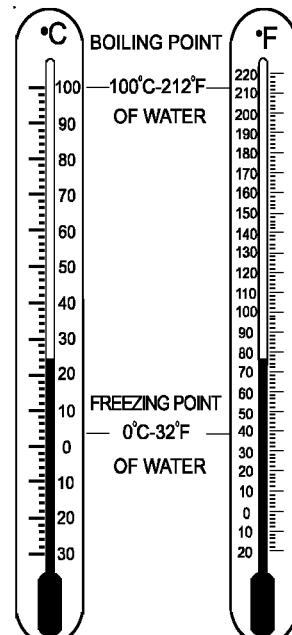
বিজ্ঞানী ফারেনহাইট এ স্কেল উজ্জ্বল করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলকে ফারেনহাইট স্কেল বলা হয়। যেমন জ্বর হলে কেউ হয়তো বলে থাকেন যে, জ্বর  $101$  ডিগ্রি। আসলে গায়ের তাপমাত্রা ছিল  $101$  ডিগ্রি ফারেনহাইট।

### সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্ক

সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা জানা থাকলে আমরা তাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করতে পারি। আবার উল্টোটাও করা যায়। এর জন্য আমাদের একটি সমীকরণ জানতে হবে। সমীকরণটি হল  $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$  যেখানে  $C$  হলো সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা এবং  $F$  হলো ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা।

এবার একটি উদাহরণ দেখা যাক।

**উদাহরণ :** বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো। সেখানকার ডাক্তার তার গায়ের তাপমাত্রা মেপে বললো তাপমাত্রা  $38$  ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফারেনহাইট স্কেলে এই খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা কত?



চিত্র-৯.২: সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল

আবরা জানি

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

এখালে  $C = 38$ 

$$\text{সূত্রাঃ } \frac{38}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{বা, } 5 \times (F-32) = 9 \times 38$$

$$\text{বা, } F-32 = 342/5$$

$$\text{বা, } F = 68.4 + 32 = 100.4$$

**অর্থাৎ ফাইলহাইট স্কেলে এই খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা ১০০.৪ ডিগ্রি ফাইলহাইট।**

**কাজ :** একটি সেলসিয়াস স্কেল ও সাথের সূর মাপার একটি ফাইলহাইট স্কেল নাও। ক্লাসের ক্ষেত্রে কল্পনা পদ্ধতির তাপমাত্রা ফাইলহাইট স্কেল ব্যবহার করে পরিমাপ কর। পরিমাপকৃত তাপমাত্রা সূর ব্যবহার করে সেলসিয়াস স্কেলে মুগাড়র করে নিচের হক (নিচের খাতার ছকটি করে নিতে হবে) পূরণ কর।

পিছবীর মাপ	ফাইলহাইট স্কেলে তাপমাত্রা	সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা	মন্তব্য
১।			
২।			

#### পাঠ ৬, ৭ : তাপের প্রভাবে পদার্থের প্রসারণ

তাপ প্রয়োগ করলে অধিকাংশ পদার্থের আয়তন বাঢ়ে। কঠিন পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে বাঢ়ে। বেশিরভাগ জরুর পদার্থকে তাপ দিলে তা খুব বেশি প্রসারিত হয় না। তবে বাস্তবীয় পদার্থকে তাপ দিলে তা অনেকটা প্রসারিত হয়।

**কঠিন পদার্থের প্রসারণ:**

**কাজ :** কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রমাণ।

**কঠোরণীয় উপকরণ :** পিতলের তৈরি বল ও রিং, মোমবাতি, সিয়ালগাই, চিমটা ও স্ট্যান্ড।

পিতলের একটি বল ও রিং এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে বলটি কোনো ক্ষণমে রিং-এর ডিজে দিয়ে চলে যাব। চিমের ঘণ্টা করে স্ট্যান্ডে রিং ও বল সূজ কর। এবার বলটি রিং-এর ডিজে দিয়ে চলে পেছে। এবার বলটি কেব করে নিয়ে আস। মোমবাতি ঝুলিয়ে বলটিকে গরম করো। সাথে চিমটার সাহায্যে উচ্চত বলটিকে রিং-এর ডিজে নেরার চেষ্টা কর।

বলটি কি রিং-এর ডিজে দিয়ে চলে যাচ্ছে? যাচ্ছে না, আটকে পেছে। **চিহ্ন-১.৩: কঠিন পদার্থের প্রসারণ**

**সতর্কতা :** উচ্চত বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় সাথানতা অবস্থান করতে হবে।



গরম করার ফলে পিতলের বলটি কেন রিং এর ভিতরে ঢুকছে না? এর কারণ বলটি কিছুটা বড় হয়েছে। তাপ পাওয়ার ফলে বলটি কিছুটা বড় হয়ে গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ প্রসারিত হয়। কিন্তু এ প্রসারণ খুব বেশি নয় বলে আমরা সহজে বুঝতে পারি না। কঠিন পদার্থের মধ্যে তাপ প্রয়োগে সাধারণত ধাতব পদার্থ বেশি পরিমাণে প্রসারিত হয়।

### দৈনন্দিন জীবনে কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রভাব

নিচের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে পদার্থের প্রসারণকে কীভাবে কাজে লাগাই।

(১) কখনো কি দেখেছ জ্যামের, সসের বা অন্য কোনো কিছুর কাচের বোতলের বা শিশির ধাতব মুখটি খোলা যাচ্ছে না? এরকম অবস্থায় সাধারণত বোতলের ধাতব মুখটি গরম করা হয়। তারপর তা মোচড় দিলে সহজেই খুলে আসে। কেন সহজে মুখটি খুলে আসে? কারণ ধাতব মুখটি তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়ে বোতল থেকে কিছুটা আলগা হয়ে যায়। তাই এটি সহজে খুলে আসে।

(২) তোমরা কী রেল লাইন দেখেছ? দুটি সমান্তরাল লোহার পাতের উপর দিয়ে রেল চলে। খেয়াল করবে, দুটি লোহার পাতই কিছু দূর পরপর কাটা। আসলে ইচ্ছে করেই লোহার পাতের অংশের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রাখা হয়েছে। রেলগাড়ি চলার সময় রেলের লোহার চাকার সাথে ঘর্ষণে লোহার পাত গরম হয়ে যায়। এতে লোহার পাত কিছুটা বেড়ে যায়। লোহার পাতের সংযোগস্থানে ফাঁক না থাকলে তা বেঁকে যেত। ফাঁক থাকায় লোহার পাত বেড়ে ফাঁকাটুকু পূরণ করে। এতে লোহার পাত বেঁকে যায় না।

**তরল পদার্থের প্রসারণ :** কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল আয়তনে বেশি বাড়ে। তরল ধাতু পারদের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। তোমরা এ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই জেনেছ। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে জানবে যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রের পানির আয়তন বেড়ে সমন্বয় পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

### বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ :

**উপকরণ :** একটি কাচের বোতল, দুটি পানির পাত্র, গরম ও ঠাণ্ডা পানি, বেলুন, সূতা।

**কাজ :** একটি শক্ত ও খালি কাচের বোতল নাও। বেলুনটি না ফুলিয়ে বোতলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে সূতা দিয়ে বেঁধে দাও। একটি পাত্রে ফুট্টত গরম পানি এবং অপরটিতে ঠাণ্ডা পানি নাও। এবার বোতলটি সাধারণে গরম পানিতে ডুবাও। কী দেখছো? বেলুনটি কিছুটা ফুলে উঠেছে? এবার বোতলটি ধরে ঠাণ্ডা পানিতে ডুবাও। বেলুনটি কি চুপসে গেছে? কেন এমন হচ্ছে?

**সতর্কতা :** ফুট্টত পানি ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।

বায়বীয় পদার্থ তাপ পেলে সবচেয়ে বেশি বাড়ে। বোতলটি গরম পানিতে ডুবালে বোতলের ভিতরের বায়ু তাপ পেয়ে প্রসারিত হচ্ছে। ফলে বোতলের বায়ু বেলুনে প্রবেশ করে কিছুটা ফুলে উঠেছে। আবার বোতলটি ঠাণ্ডা পানিতে ডুবানো হলে বোতলের ভিতরের বায়ু সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বেলুনের বায়ু বোতলের ভিতরে ফিরে আসছে। তাই বেলুনটি চুপসে যাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাপ পেলে বায়বীয় পদার্থ প্রসারিত হয়।

**বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব:** বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব প্রকৃতিতে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা কি রুটি সেঁকতে দেখেছ? এক পর্যায়ে রুটি বেশ ফুলে উঠে। রুটিটি একটু ছিদ্র করে দিলে শব্দ করে কিছু বেরিয়ে আসে। কেন এরকম হয়? তোমরা জানো আটার সাথে পানি মিশিয়ে রুটি তৈরি করা হয়। রুটির ভিতরের পানি গরম হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প আরও তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়। ফলে রুটিটি ফুলে উঠে।

তাপের ফলে গ্যাসের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন চালানো হয়। তোমরা বড় হয়ে আরও ভালোভাবে বুঝবে। ইঞ্জিন চালানোর জন্য জ্বালানি পুড়িয়ে তাপ দিয়ে বায়ুকে প্রসারিত করা হয়। প্রসারিত বায়ু যে ধাক্কা দেয় তাকে ব্যবহার করে ইঞ্জিন চালানো হয়।

তাপের ফলে বায়ু প্রসারিত হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিবর্তন হয়। নিচে এ সম্পর্কে আমরা জানবো।

### পাঠ-৮ : আর্দ্রতা ও বায়ুচাপের উপর তাপমাত্রার প্রভাব

বায়ুতে বায়ুকণগুলো ছুটোছুটি করতে থাকে। তাই তারা কোনো কিছুতে বাধা পেলে তাতে ধাক্কা দেয় বা বল প্রয়োগ করে। ফলে বায়ুর চাপ রয়েছে। একক ক্ষেত্রফলের উপর বায়ু যে বল প্রয়োগ করে তাই বায়ুচাপ। বায়ু সবদিকে চাপ দেয়। কোনো স্থানের বায়ুচাপ নির্ভর করে স্থানকার তাপমাত্রার উপর। তাপমাত্রা বাড়লে কোনো বন্ধ পাত্রে বায়বীয় পদার্থের চাপ বেড়ে যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুচাপ কমে যায়। এর কারণ বায়ুমণ্ডল বন্ধ পাত্র নয়; এটি খোলা। তাপ পেলে বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় ও বায়ুচাপ কমে যায়। তাই কোনো স্থানে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বায়ুচাপ কমে যায় অর্থাৎ নিম্নচাপের সূচিটি হয়। আর যেখানে তাপমাত্রা কম, স্থানে উচ্চচাপের সূচিটি হয়। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে দেখবে কীভাবে নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের ফলে বায়ুপ্রবাহের সূচিটি হয়।

**জলীয় বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা :** তোমরা জান যে, ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্প হয়ে বায়ুতে মিশে। বায়ুতে সব সময়ই এভাবে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হয়। জলীয় বাষ্প কম থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা কম। তাপমাত্রা বাড়লে পানি বেশি করে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুও বেশি করে জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশে শ্রাবণ ও তাদু মাসে ভ্যাপসা গরম পড়ে। কারণ তখন মৌসুমী বায়ু বক্ষোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প উড়িয়ে নিয়ে আসে। জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রতা বেশি থাকলে আমাদের গায়ে ঘাম হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেড়ে গেলে এক পর্যায়ে তা ঘনীভূত হয়ে মেঘ এবং শেষে বৃষ্টি হয়।

## পাঠ ৯-১০ : তাপ সংগ্রালন

তোমরা কী কখনো খেয়াল করেছ, গরম তরকারির বাটিতে স্টিলের চামচ রাখা থাকলে তা গরম হয়ে যায়? তরকারি থেকে তাপ কীভাবে তোমার হাত পর্যন্ত এলো? তাপ বেশি তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে যেতে পারে। তাপের এই স্থান পরিবর্তনকে তাপ সংগ্রালন বলে। তাপ সংগ্রালন তিন ভাবে হয়—পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ।

**তাপ পরিবহন :** গরম তরকারির বাটি থেকে চামচের মাধ্যমে তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সংগ্রালিত হয়। এ পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থে তাপ সংগ্রালিত হয়। তোমরা জান, কঠিন পদার্থের কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। তারা কেবল নিজেদের স্থানে থেকে দোল থেতে পারে। কঠিন পদার্থে গরম কণাগুলো দোল দেয়ে পাশের ঠাণ্ডা কণাকে তাপ দিয়ে দেয়। পাশের ঠাণ্ডা কণাটি গরম হয়ে তার পাশের ঠাণ্ডা কণাকে তাপ দেয়। এভাবে কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন না করে তাপকে গরম প্রাপ্ত থেকে ঠাণ্ডা প্রাপ্ত নিয়ে যায়।

**কঠিন পদার্থের মধ্যে ধাতব পদার্থগুলো** যেমন লোহা, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা এগুলো দ্রুত তাপ পরিবহন করে। তাই রান্নার জন্য ধাতুর তৈরি হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। অধাতু যেমন কাঠ, সূতি কাপড়, মাটি এসব তাপ পরিবহন করে খুবই কম। তাই গরম হাড়ি ধরার জন্য আমরা কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করি। একই কারণে রান্নার জন্য কাঠের নাড়ানি ব্যবহার সুবিধাজনক।

**তাপ পরিচলন :** তরল ও বায়বীয় পদার্থে এ প্রক্রিয়ায় তাপ সংগ্রালিত হয়। একটি পাত্রে পানি নিয়ে চুলার উপরে বসিয়ে তাপ দিলে পুরো পাত্রের পানিই গরম হতে থাকে। এক্ষেত্রে পানির কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে শক্তি অর্জন করে। শক্তি অর্জন করে গরম পানিকণা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। উপরের ঠাণ্ডা পানির কণাগুলো নিচে নেমে এসে তাপ গ্রহণ করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল কণা তাপ গ্রহণ করে উন্নত হয়, তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংগ্রালিত হয়। এভাবে কণাদের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সংগ্রালনের প্রক্রিয়ার নাম পরিচলন। তরল পদার্থের কণার মতো বায়বীয় পদার্থের কণারাও উন্নত হয়ে সহজেই স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সংগ্রালন করে। তোমরা কি কখনো শীতে আগুনের পাশে দাঁড়িয়েছ? শীতের সময়ে গ্রামে মানুষ কাঠ বা ডালপালা জ্বলে আগুন পোহায়। আগুনের পাশে দাঁড়ালে আমাদের কিছুটা গরম লাগে। কিন্তু তুমি যদি তোমার হাতটা সাবধানে আগুনের ঠিক উপরে নাও, তাহলে দেখবে বেশি তাপ লাগছে। কারণ পরিচলন পদ্ধতিতে বায়ুর কণা উন্নত হয়ে উপরের দিকে উঠে, পাশে আসে না। তাই আগুনের পাশের থেকে উপরে তাপ বেশি অনুভূত হয়।

**তাপ বিকিরণ :** সূর্য তাপের মূল উৎস। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে প্রায় সবচুকুই ফাঁকা। কোনো বায়বীয় পদার্থও নেই। তাহলে সূর্য থেকে তাপ কীভাবে আমাদের কাছে এসে পৌছায়? সূর্য থেকে তাপ আসে বিকিরণের মাধ্যমে। যেখানে কোনো জড় মাধ্যম নেই সেখানে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে সংগ্রালিত হয়। তোমরা উপরের শ্রেণিতে জানবে যে তাপ এক রকমের তরঙ্গ, যা কোনো মাধ্যম ছাড়া উন্নত স্থান থেকে শীতল স্থানে যেতে পারে। বিকিরণের সময় তাপ তরঙ্গাকারে সংগ্রালিত হয়। আসলে মাধ্যম থাকুক বা না থাকুক, উন্নত বস্তু বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ নির্গত করে।

কিছু পদাৰ্থ সহজে তাপ বিকিৰণ কৰে, এদেৱকে বলে বিকিৰক। বিকিৰক পদাৰ্থ তাপ বিকিৰণ কৰে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায়। বিকিৰক পদাৰ্থ তাপ শোষণও কৰে। আবাৰ কিছু পদাৰ্থ তাপ শোষণ কৰে নেয়, তাদেৱকে বলে শোষক। শোষক তাপ শোষণ কৰে উন্নত হয়। তৱল পানি, জলীয় বাষ্প, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, কাঁচ, প্লাস্টিক এসব পদাৰ্থ তাপ শোষণ কৰে নেয়।

সূৰ্য তাপ বিকিৰণ কৰে, তাই একে আমৱা বিকিৰক বলতে পাৰি। পৃথিবী সূৰ্যেৰ তাপ শোষণ কৰে উন্নত হয়। পৃথিবীকে শোষক বলতে পাৰি। কিছু পৃথিবী একইসাথে বিকিৰক। রাতেৰ বেলায় উন্নত পৃথিবী তাপ বিকিৰণ কৰে শীতল হয়। তোমৱা জলবায়ু পরিবৰ্তন অধ্যায়ে জানবে বায়ুমণ্ডলেৰ কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, মিথেন-এসব গ্যাস বিকিৰিত তাপেৰ শোষক হিসেবে কাজ কৰে আমাদেৱ জীবনকে প্ৰতিবিত কৰছে।

### এ অধ্যায়ে আমৱা যা শিখলাম

- তাপ হলো এক ধৰনেৰ শক্তি যাৱ কাৰণে কোনো কিছুকে ঠাণ্ডা বা গৰম লাগে। অন্যদিকে, তাপমাত্ৰা প্ৰকাশ কৰে কতটুকু গৰম বা ঠাণ্ডা লাগছে।
- সাধাৱণ কাজে তাপমাত্ৰা পৱিমাপেৰ জন্য পাৱদ থাৰ্মোমিটাৰ ব্যবহাৰ কৱা হয়। তাপমাত্ৰাৰ দুটি ক্ষেকল বেশি প্ৰচলিত – সেলসিয়াস ক্ষেকল ও ফাৰেনহাইট ক্ষেকল।
- তাপ প্ৰয়োগে পদাৰ্থ সাধাৱণত প্ৰসাৱিত হয়। কঠিন ও তৱল পদাৰ্থ কম পৱিমাণে প্ৰসাৱিত হয়, কিছু বায়বীয় পদাৰ্থ তাপে বেশি প্ৰসাৱিত হয়।
- তাপমাত্ৰাৰ পৱিবৰ্তনে বায়ুৰ চাপ ও আৰ্দ্ধতাৰ পৱিবৰ্তন হয়, যা আবহাওয়াৰ পৱিবৰ্তনে ভূমিকা রাখে।
- তাপ তিন প্ৰক্ৰিয়ায় সঞ্চালিত হয়- পৱিবহন, পৱিচলন ও বিকিৰণেৰ মাধ্যমে।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূৰণ কৰ

১. তৱল ও বায়বীয় মাধ্যমে তাপ \_\_\_\_\_ প্ৰক্ৰিয়ায় সঞ্চালিত হয়।
২. স্বাভাৱিক চাপে যে তাপমাত্ৰায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পৱিণত হয়, সেই তাপমাত্ৰাকে \_\_\_\_\_ স্থিৱাঙ্ক বলে।

৩. সেলসিয়াস স্কেলের নিম্ন স্থিরাত্মক ————— ডিগ্রি সেলসিয়াস।

৪. ফারেনহাইট স্কেলে নিম্ন স্থিরাত্মক ————— ডিগ্রি ফারেনহাইট।

৫. জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকলে বায়ুর ————— কম থাকে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কী?

২. রেশাইনের পাতের সংযোগস্থলে কিছুটা ফাঁকা রাখা হয় কেন?

৩. আগুনের পাশে দাঢ়ালে যতটা গরম লাগে, আগুনের ঠিক উপরে হাত রাখলে তার চেয়ে অনেক বেশি গরম লাগে। এ রকম হয় কেন?

৪. রান্না করার গরম হাতি খালি হাতে না ধরে কাপড়ের টুকরা দিয়ে ধরা হয় কেন?

৫. তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে যায় কেন?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি বায়ুমণ্ডলে ভালো শোষক হিসেবে কাজ করে?

ক. নাইট্রোজেন

খ. জলীয় বাষ্প

গ. অক্সিজেন

ঘ. ধূলিকণা

২. তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য হলো, এটি-

ক. অনুভব করা যায়

খ. পরিমাপ যোগ্য

গ. এক ধরনের শক্তি

ঘ. বল প্রয়োগে বাঁধা দেয়

নিচের ছবিটি ভালোভাবে শক্ত কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. ২ নম্বর চিত্রের ধার্মায়িটারের-

i. নিম্নস্থিরাত্মক  $32^{\circ}\text{F}$

ii. মৌলিক ভাগ ২০০

iii. উর্ধ্ব স্থিরাত্মক  $232^{\circ}\text{F}$

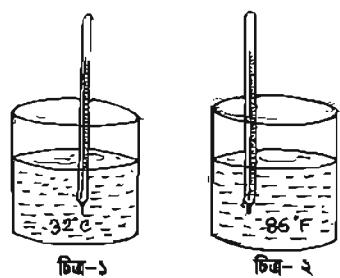
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii



চিত্র- ১

চিত্র- ২

৪. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর তরলকে তাপীয় সংসর্ণে রাখলে কী ঘটবে?

ক. তাপের প্রবাহ চিত্র ১ থেকে ২ এর দিকে হবে

খ. তাপের প্রবাহ চিত্র ২ থেকে ১ এর দিকে হবে

গ. তাপের প্রবাহ চলতেই থাকবে

ঘ. উভয়ের তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রায় পৌছবে

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. শারমিন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সন্ধ্যায় সে জ্বর জ্বর বোধ করল। পরে তার বাসায় রাস্তিত সেলসিয়াস থার্মোমিটার দিয়ে গায়ের তাপমাত্রা মেপে দেখল  $37^{\circ}$  সেলসিয়াস। শারমিন ফারেনহাইট স্কেলে জ্বরের তাপমাত্রা বুবতে পারলেও সেন্টগ্রেড স্কেলে এ তাপমাত্রা বুবতে পারল না। তাই চিন্তিত হয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে বলল যে তার জ্বর নেই।
- ক. তাপমাত্রা কী?
- খ. পারদ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা কর।
- গ. শারমিনের গায়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে কত ছিল?
- ঘ. ফারেনহাইট ও সেন্টগ্রেড স্কেলের সম্পর্ক জানা থাকলে শারমিনের কী ডাক্তারের কাছে যেতে হতো? যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।
২. আনিকা অল্লবয়সের হলেও দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা সে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। একদিন সে ভাত রান্নার সময় পাতিলের বুদবুদের ধাকায় ঢাকনাটি পড়ে যেতে দেখলো। অন্যদিকে তাদের কাঠের দরজায় গ্রীষ্মকালে কোনো ফাঁক না থাকলেও শীতকালে কিছু ফাঁক লক্ষ করল। উল্লিখিত দুটো ঘটনাই তাকে ভাবিয়ে তুলল।
- ক. কোন পদাৰ্থ তাপে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়?
- খ. রেললাইনের সংযোগ স্থলে ফাঁক রাখা হয় কেন?
- গ. ভাত রান্নার সময় আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত কাঠের দরজার শীত ও গ্রীষ্মে দৈত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

## দশম অধ্যায়

# বিদ্যুৎ ও চূম্বকের ঘটনা

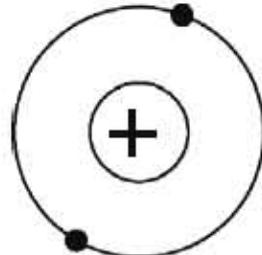
বিদ্যুৎ আমাদের বাড়ি, স্কুল বা অফিসকে আলোকিত করছে। চালাচ্ছে ফ্যান, রেডিও-টেলিভিশন, ইচ্ছা, হিটার, মোটর, কম্পিউটার ও আরও অনেক কিছু। বিদ্যুতের পাশাপাশি চূম্বকের ব্যবহারও আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বিদ্যুৎ ও চূম্বক-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- চার্জের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থির বিদ্যুৎ সৃষ্টির মাধ্যমে চার্জের ধর্ম প্রদর্শন করতে পারব।
- স্থির বিদ্যুৎ হতে চল বিদ্যুৎ সৃষ্টির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একটি সরল বর্তনী তৈরি করতে পারব।
- নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চূম্বকের ধর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে চূম্বকে ও অচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- চৌম্বক পদার্থকে চৌম্বকে পরিণত করার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
- বৈদ্যুতিক চূম্বকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পাঠ - ১ ও ২ আধান বা চার্জের উৎপত্তি

আমরা জানি পদার্থ কণাগুলো ক্ষয় ক্ষয় কণার সমন্বয়ে গঠিত, যার নাম পরমাণু। ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে পরমাণু গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রিনোস, যা প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ইলেক্ট্রন এই নিউট্রিনোসের চারপাশে প্রস্তীপ করে। প্রোটন ধনাত্মক (+) আধানযুক্ত, ইলেক্ট্রন ঋগাত্মক (-) আধানযুক্ত এবং নিউট্রন হলো নিরাপেক্ষ কণা। কিন্তু মজবুত ব্যাপার হলো পরমাণু নিজে কিন্তু নিরাপেক্ষ আচরণ করে। পরমাণু



চিত্র- ১০.১

ধনাত্মক বা ঋগাত্মক কোনোটিই নয়। পরমাণুতে কোনো চার্জ থাকে না। এর কারণ কী? কারণ হলো একটি পরমাণুতে বে কয়টি প্রোটন থাকে, সেই কয়টিই ইলেক্ট্রন থাকে। যার মধ্যে পরমাণু চার্জ বা আধান নিরাপেক্ষ হয়। কিন্তু বখনই দুটো পদার্থকে ঘর্ষণ করা হয়, তখন একটি পদার্থের ইলেক্ট্রন অন্য একটি পদার্থে চলে যেতে পারে। কলে একটি পদার্থ ইলেক্ট্রনের আধিক্য দেখা দিতে পারে। এবার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একটি কাতের বোতলকে এক টুকু সিকের কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করা হলো। এতে দেখা যাবে সিকের কাপড় কাচ থেকে ইলেক্ট্রনকে আকর্ষণ করে তার দিকে নিয়ে গেছে। এতে বোতলটি ধনাত্মক আধানযুক্ত এবং সিকের কাপড়টি ঋগাত্মক আধানযুক্ত হয়েছে। তাহলে একটা ব্যাপার এখানে সংক্ষেপে ঘর্ষণের ফলে নতুন কোনো আধানের সৃষ্টি হয় না বরং পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আধান এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে চলে যায়।

### আধান বা চার্জের ধর্ম

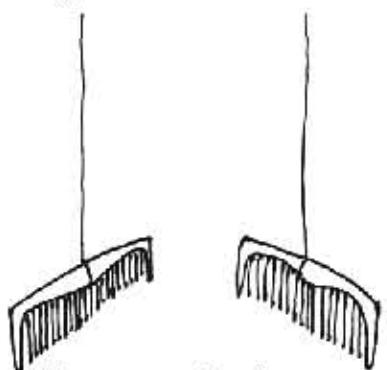
আমরা এখন নিচয় মুখতে পারছি, কীভাবে আধানের উৎপত্তি হয়। এবার আমরা দেখব এই আধানগুলো (ধনাত্মক ও ঋগাত্মক) কিন্তু ধর্ম প্রদর্শন করে। এজ অন্য আমরা নিচের কাজগুলো করবো।

**কাজ: চার্জের ধর্ম জানা।**

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** দুটি চিরুনি ও পশমি কাপড়।

**পদ্ধতি:** একটি হোট প্রাস্টিকের চিরুনিকে সূজা দিয়ে বেধে একটি শুকনো কাঠির মাধ্যমে ঝুলিয়ে দাও। এটি এমনভাবে ঝুলতে হবে যাতে আশেপাশে কোনো কিছু শৰ্ক না করে। এবার আকেরটি শুকনো কাঠির মাধ্যমে অন্য একটি প্রাস্টিকের চিরুনি ঝুলাও যাতে এটা মুক্তভাবে ঝুলতে থাকে। এবার উভয় চিরুনিকে কিছুক্ষণ পশমি কাপড় দিয়ে দ্বা। এখন চিরুনি দুটিকে কাছাকাছি আন। কী লক করছে? চিরুনি দুটি প্রস্তরকে বিকর্ষণ করছে।

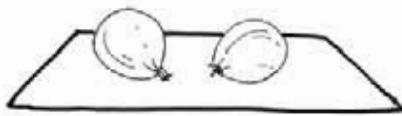
এবার পশমি কাপড়টি চিরুনির কাছে এনে দেখ এটি চিরুনির কাছে চলে আসবে।



চিত্র- ১০.২: চার্জের ধর্ম জানা

**কাজ:** চার্জের ধর্মের প্রদর্শন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** দুটি কেলুন, সূতা, উলের কাপড় অথবা গারের সোয়েটায় ও কালজের টুকরা।



চিত্র-১০.৩ : চার্জের ধর্মের প্রদর্শন

**পদ্ধতি:** দুটি কেলুনকে কুলিয়ে সূতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে নাও। এবার একটি কেলুনকে উলের কাপড় বা সোয়েটায় দিয়ে ববে কালজের টুকরায় কাছে থাকলে দেখা যাবে কেলুন কালজের টুকরাগুলো কাছে টেনে নিছে। শুধুমাত্র বিচীয় কেলুনটিকে উলের কাপড় বা গারের সোয়েটায়ের সাথে চেপে থাকলে দেখা যাবে কেলুনটি কাপড়ের পায়ে দেশে আছে। এর কারণ কী? কারণ ঘর্ষণের ফলে উলের কাপড় ও কেলুনে বিপরীতধর্মী আধানের সৃষ্টি হয়েছে। এবার যখন বিচীয় কেলুনকে প্রথম কেলুনের কাছে নেওয়া হবে তখন কী দেখবে? দেখবে যে চিত্রের ন্যায় দুটি কেলুন প্রস্তর থেকে দূরে সাঝে যাচ্ছে। কারণ ঘর্ষণের ফলে দুটি কেলুনেই একই ধরনের আধানের সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত কাজগুলো থেকে ভূমি কি কোনো সিকান্ত নিতে পার? ইঠা, এর থেকে দুটি সিকান্ত নেওয়া যায়:

- সমধীয়ী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে (দুটি কেলুন অথবা দুটি চিতুনির ক্ষেত্রে)।
- বিপরীত ধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে (উলের কাপড় ও কেলুন)।

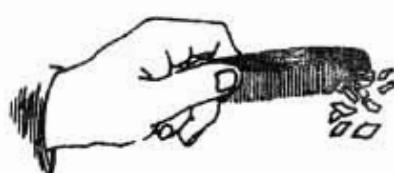
### পাঠ - ৩ চার্জের অভিক্ষেপ

এবার আমরা একটি সহজ কাজের মাধ্যমে আধানের অভিক্ষেপের প্রমাণ করব।

**কাজ:** আধানের অভিক্ষেপ প্রমাণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** একটি প্লাস্টিকের চিতুনি ও খবজের কালজের টুকরা।

**পদ্ধতি:** একটি খবজের কাপড়ের বিছু অংশ কেটে ছোট ছোট টুকরা কর। এবার কালজের টুকরাগুলোকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দাও। এবার বলতে গববে একটি প্লাস্টিকের চিতুনিকে খবজের কালজের টুকরাগুলোর কাছে আসলে কী ঘটবে? এবার চিতুনিকে পশম বা উলের কাপড় (এমনকি তোমার শুকনো চুলেও ক্ষেত্রে দেখতে পার) দিয়ে ঘবে আবর কালজের টুকরার সামনে ধর। বলতে গববে কি ঘটবে এবং কেন? দেখবে কালজের টুকরাগুলো লাকিয়ে চিতুনির কাছে চলে আসবে। এখানে প্লাস্টিকের চিতুনি ঘর্ষণের ফলে পশম বা উলের কাপড়ের পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে নিতে বিশেষক চার্জিত হয়েছে যাই ফলে সহজেই কালজের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করতে পারবে।



চিত্র-১০.৪ : চার্জের অভিক্ষেপ প্রমাণ

### পাঠ-৪ : পরিবাহী, অগ্রিবাহী ও অর্ধ-পরিবাহী

আমরা পরিবাহী ও অগ্রিবাহী শব্দ সূচির সাথে পরিচিত। পরিবাহী পদার্থের ইলেক্ট্রনসমূহ এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে সহজেই চলাচল করতে পারে। যেমন ধাতু; বিশেষ করে সিলিন্ডার ও কণার, অ্যালুমিনিয়াম। কার্বন অধাতু হলেও এর একটি বৃশ্চ প্রাক্তিক বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।

অগ্রিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে এর পরমাণুর ইলেক্ট্রন সহজে চলাচল করতে পারে না। তবে অগ্রিবাহী পদার্থকে যখে আহিত করা যায়। এছাড়া যদি ইলেক্ট্রন পৃষ্ঠীত বা বর্জিত হয়, তাহলেও অগ্রিবাহ পদার্থ আধাতুক হয়। যেমন: প্রাস্টিক, প্লাস ও রাবার।

নিম্ন তাপমাত্রার অর্ধপরিবাহী পদার্থ অগ্রিবাহীর মত আচরণ করে। তাপমাত্রা বাঢ়ালে এটি পরিবাহীর মত আচরণ করে। সাধারণত অর্ধপরিবাহী পদার্থ হলো কঠিন, বেমন-সিলিন্ড, জার্মেনিয়াম, গ্যালিয়াম ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী পদার্থের উদাহরণ।

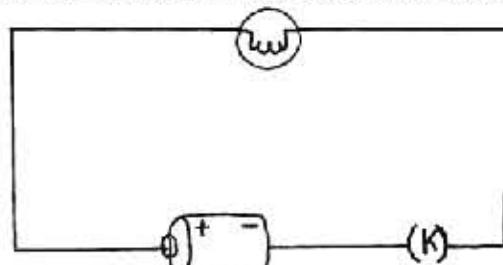
### পাঠ - ৫ : বিদ্র বিদ্যুৎ হতে চল বিদ্যুৎ সৃষ্টি

পূর্বের পরীক্ষার সাহায্যে আমরা দেখেছি, প্লাস্টিকের চিমুনিকে উলের কাপড় দিয়ে যখে ছেট কাপড়ের টুকরোর সামনে ধরলে এটি কাপড়ের টুকরোকে আকর্ষণ করে। এরপর হাত দিয়ে চিমুনিটি সর্ব করলে দেখা যাবে চিমুনিটি আর ছেট কাপড়ের টুকরোকে আকর্ষণ করছে না। এ থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, চিমুনিকে উৎপন্ন বিদ্র বিদ্যুৎ দেই। এই বিদ্র বিদ্যুৎ কোথায় দেল? হাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই বিদ্যুৎ চিমুনি থেকে মাটিকে চলে দেছে। এভাবে বে বিদ্যুৎ কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে চলে যায় তা হলো চল বিদ্যুৎ।

এখানে যদে রাখা প্রয়োজন যে, যর্দনের কলে কেনেো ক্ষেত্রে একটি নির্মিত ও সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ বা আধান উৎপন্ন হয়। হাত বা ধাতব পদার্থ দিয়ে সর্ব করলে এই আধান সাথে সাথে মাটিকে চলে যায়। আধান ফুরিয়ে বাবার কলে বিদ্যুৎ প্রবাহ কর্ম হয়ে যায়। সুতরাং যাতাবে সুন্দু কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ কলার রাখার অন্য কোনো উৎস থেকে অক্ষিয়াম বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হয়। এ বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় আরও অধিক ধারণা পাব।

### পাঠ - ৬ : সরল বর্তনী ও এর ব্যবহার

মানুষের চলার অন্য বেমন পথের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ প্রবাহের অন্যও প্রয়োজন নির্মিত গর্ত। বিদ্যুৎ প্রবাহ চলার এই নির্মিত গর্তকে বর্তনী বলে। সাধারণত বিদ্যুৎ উৎসের ধূমাত্মক প্রাণ থেকে ধূমাত্মক প্রাণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পূর্ণ পথকে বিদ্যুৎ বর্তনী বলে। সাধারণত এই বর্তনীতে বাস ও ব্যাটারি ভাজের সাহায্যে সংজ্র থাকে। এগুলো বর্ধন হুন্দ হয়, তখন বর্তনী তৈরি হয়। নিচের চিত্রে একটি সরল বর্তনী দেখালো হলো।



চিত্র-১০.৫: সরল বর্তনী

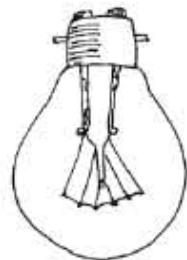
### পাঠ - ৭ ও ৮

#### চল বিদ্যুতের ব্যবহার

বিদ্যুৎ প্রয়োগ আরো আলো ও তাপ উৎপাদন করা যায়। এমনকি এর আরো যান্ত্রিক কাজ করে বিডিল কাজ সম্পন্ন করা যায়। অবার আমরা উদাহরণ হিসাবে বৈদ্যুতিক বাল, টর্চ লাইট, ইস্ত্র, হিটার, বৈদ্যুতিক গাঢ়া ও ফটোকলি মেশিনে কিছাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তার সাথে পরিচিত হয়।

#### বৈদ্যুতিক বাল

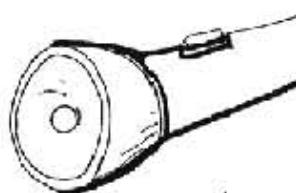
আমরা সবাই এই বালের সাথে পরিচিত। সুইচ মোটা তার একটি বাহুশূণ্য বা নিচিহ্নিত গোস-পূর্ণ বালের বাহুনিরুক্ত মুখের মধ্য দিয়ে তিচড়ে প্রবেশ করানো থাকে। বালের তিচড়ে তাঁজের সুইচ প্রাপ্তের সাথে সূত টাঙ্কেটসের তাঁজের কূচ্ছলী সংস্কৃত থাকে। এটিকে কিলামেট বলে। এই বালকে বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সংযোগ করলে কিলামেট প্রভৃতি তাপ উৎপাদন করে এবং বালের এই কিলামেট প্রকল্পিত হয়ে আলো বিকিরণ করতে থাকে।



চিত্র-১০.৬ : বৈদ্যুতিক বাল

#### টর্চ লাইট

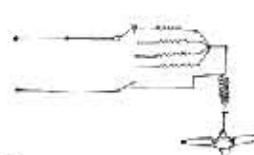
আমরা সবাই টর্চ লাইটের সাথে পরিচিত। টর্চ লাইটে মূলত ক্যাটারিন সাথে ষেট একটি বাল থাকে। সুইচ টিপ্পে বাল ঝলে। এই বালের আলো ছড়িয়ে দেবার অন্য সামানে একটি কাঁচ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-১০.৭ : টর্চ লাইট

#### বৈদ্যুতিক গাঢ়া

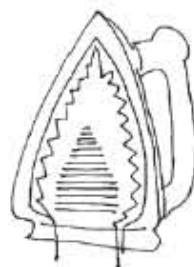
বৈদ্যুতিক গাঢ়াতে বিদ্যুৎ প্রয়োগ ব্যবহার করা হয় মূলত যান্ত্রিক কাজ করার জন্য। এতে বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্বয় করে গাঢ়াকে দুরানো হয়। গাঢ়ার পতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি রেগুলেটর ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-১০.৮ : বৈদ্যুতিক গাঢ়া

#### বৈদ্যুতিক হিটার

আমরা অনেকেই বৈদ্যুতিক হিটারের সাথে পরিচিত। হিটারের মধ্যে অগ্রিবাহী চার্লি সেল নির্মিত তাঁজের কূচ্ছলী সাজিয়ে গাঢ়া করা হয়। বিদ্যুৎ প্রয়োগ চালনা করলে তাঁজটি পর্য হয় এবং উজ্জ্বল হয়ে তাপ বিকিরণ করে। আমাদের বাসা বাড়িতে বৈদ্যুতিক হিটার চালিয়ে রাখা করা হয়।



চিত্র-১০.৯ : বৈদ্যুতিক ইস্ত্র

#### বৈদ্যুতিক ইস্ত্র

বৈদ্যুতিক হিটারের মতই ইস্ত্রের গঠন প্রথম। এ ক্ষেত্রে নাইজেরিয় তাঁজটি ইস্ত্রের নিচের ঘনূণ লোহ নির্মিত তলাটিকে উজ্জ্বল করে। এক্ষেত্রে তাপ উৎপাদন বিদ্যুৎ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। প্রয়োগ বেশি হলে ইস্ত্র বেশি উজ্জ্বল হয়।

### পার্ট - ৯ ও ১০ : চুম্বক কী?

প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন শীসে ম্যাগনেশিয়া নামক প্রদেশে ম্যাগনাস নামে এক রাখাল বালক বাস করত। সে সারা সিল মাঠে মাঠে মেৰ চড়াত ও সময়াবেৰো বাঢ়ি কৰিত। একসিল বাঢ়ি কৰৱার সময় ম্যাগনাস ভাৰ লাঠিটি মাটি থেকে স্ফূলতে পিয়ে দেখলো লাঠিটি উঠানো বাছে না, লাঠিৰ মাখা একটি পাখতেৰ সাথে আঠিকে আছে। সে কৈ কৈতে দেখলো লাঠিৰ মাখাৰ লোহাটিকে পাখতে ঠেনে থওয়া আছে। অৰ্থাৎ ম্যাগনাস দেখলো লোহা এই আচেনা পাখতে আকৰ্ষণ কৰাবে। ম্যাগনাসেৰ নামানুসৰে এই পাখতেৰ নাম কৰা হল ম্যাগনেট। ম্যাগনেটেৰ বালা প্রতিশব্দ হলো চুম্বক। আমোৱা এও দেখতে পেলাম, চুম্বকেৰ লোহাকে আকৰ্ষণ কৰাবৰ ক্ষমতা আছে। আকৰ্ষণ এক প্রকাৰ বল। বল দিয়ে কাছ কৰা যাব। অতএব, চুম্বকেৰ কাজ কৰাবৰ সামৰ্থ্য আছে। সুজৰাং চুম্বক এক শক্তিৰ শক্তি।

### চুম্বকেৰ ধৰ্ম

**কাজ:** চুম্বকেৰ ধৰ্ম।

**প্ৰযোজনীয় উপকৰণ:** সাধাৰণ কাগজ, লোহার পুড়া, আলপিন ও একটি সঞ্চ চুম্বক।

**প্ৰক্ৰিয়া:** টেবিলে উপৰ একটি সাধাৰণ কাগজে বিশুলেষণ পুড়া কৈ কৈতে ছিটিৰে দাও। লোহার পুড়া বা আলপিনেৰ উপৰ এবৰ সঞ্চ চুম্বকটিকে কৱেকৰাৰ নাড়াচাড়া কৈ কৈতে ছিটিৰে কেল। কী দেখতে পাই? দেখা যাছে, লোহার পুড়া বা পিন, চুম্বকেৰ পায়ে লোপে আছে। ভালোভাৰে

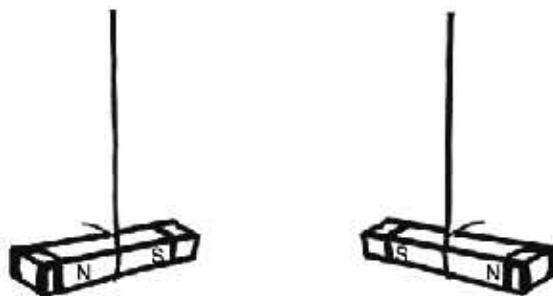


চি-১০.১০

লক কৰলৈ দেখতে পাৰে লোহার পুড়া বা পিন বেশিৰ ভাগই চুম্বকটিৰ কেবলমাৰ দুই পাণ্ডে আঠিকে আছে। প্ৰতি থেকে বৰ্তই মাৰেৰ দিকে বাঘোৱা বাবে, ভৰ্তই লোহার পুড়া বা পিনেৰ পৰিমাণ কমতে থাকে। হয়তো মাৰখানে কোনো পিন বা লোহার পুড়াকে দেখছ না। এয় থেকে বুৰো যায় চুম্বকেৰ আকৰ্ষণ ক্ষমতা দুই পাণ্ডে স্বচচেৱে বেশি।

এবাৰ সূটি একই জাতীয় সঞ্চ চুম্বককে পৰম্পৰাগত কাছাকাছি আৰ। সুধি জান সা কোস্টো কোন মেৰু। তাদেৱকে প্ৰথমে একটি সূতা দিয়ে মাৰখানে বৈধে মূলভাৱে ঝুলিয়ে দাও। কী দেখছ? চুম্বকটি মূলভাৱে বুলত অবস্থায় উত্তৰ-দক্ষিণ দিক কৈ কৈতে খিৰ হৱে আছে। অবাৰ চুম্বকটিকে একই ভাৱে ঝুলিয়ে দাও। দেখবে একই ভাৱে চুম্বকটিও মূলভাৱে উত্তৰ-দক্ষিণ দিক কৈ কৈতে খিৰ হৱে আসবে। এয় থেকে আমোৱা সিকাক নিতে পাৰি যে, মূলভাৱে বুলত চুম্বক সৰ্বদা উত্তৰ-দক্ষিণমুখী হয়ে খিৰ থাকে।

এবাৰ আমোৱা সঞ্চ চুম্বক দুটিকে N এবং S হাৰা যথাক্রমে উত্তৰ এবং দক্ষিণ মেৰু চিহ্নিত কৰি। এবাৰ প্ৰথম চুম্বকটিম উত্তৰ মেৰুকে বিলীয় চুম্বকেৰ উত্তৰ মেৰুৰ কাছে আৰ। কী দেখছ? বিকৰ্ষণ কৰাবে। একই ভাৱে প্ৰথম চুম্বকটিৰ দক্ষিণ মেৰু বিলীয় চুম্বকেৰ দক্ষিণ মেৰুৰ কাছাকাছি আৰ। একই ঘটনা ঘটছেঃ হ্যা, বিকৰ্ষণ কৰাবে। এয় থেকে আমোৱা সিকাক নিতে পাৰি যে, সূটি সমস্মেৰু গৱাঙ্গৰকে বিকৰ্ষণ কৰে।



চি-১০.১১: চুম্বকেৰ ধৰ্ম

এবার প্রথম চুম্বকের উভয় মেরুকে দ্বিতীয় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আন। কী দেখছ? একই ভাবে দ্বিতীয় চুম্বকের উভয় মেরুকে প্রথম চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আন। এরা পরস্পরকে খুব সহজেই কাছে টেনে নিয়েছে। এটা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সুতরাং চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

### পাঠ - ১১ : চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ

চুম্বক কী সকল পদার্থকেই আকর্ষণ করবে? না, চুম্বক সকল পদার্থকে আকর্ষণ করে না। চুম্বক প্রধানত লোহা, নিকেল, কোবাল্ট এবং অধিকাংশ ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। এই পদার্থগুলোকে চৌম্বক পদার্থ বলে। আবার অনেক পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না যেমন: কপার, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, কাঠ, সিলভার, প্লাস্টিক ইত্যাদি। এগুলো হলো অচৌম্বক পদার্থ।

**কাজ:** চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ চিহ্নিতকরণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** একটি চুম্বক ও নিজগুহের বিভিন্ন বস্তু।

**পদ্ধতি:** চুম্বকটি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বস্তুর সামনে ধর। দেখ কোনটিকে চুম্বক আকর্ষণ করে, কোনটিকে করে না। এবার নিচের ছকটি পূরণ কর।

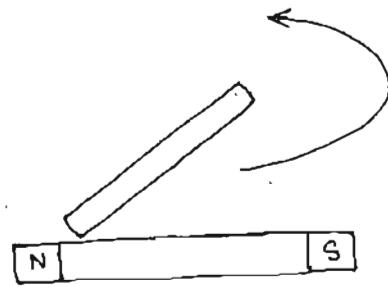
গুহের বিভিন্ন বস্তুর নাম	চুম্বক আকর্ষণ করে কিনা	কোন ধরনের পদার্থ?

### পাঠ - ১২ ও ১৩ চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে ঝুঁপান্তর

কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্নভাবে চুম্বক প্রস্তুত করা যায়। নিম্নে ঘর্ষণ পদ্ধতি ও বৈদ্যুতিক পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

### ষষ্ঠি পদ্ধতি

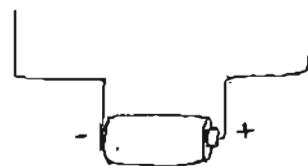
এই পরীক্ষাটির জন্য দরকার একটি দড় চূম্বক ও একটি লোহার দড়। দড় চূম্বকটি যে কোনো একটি মেরু দ্বারা লোহার দড়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘয়ে নাও। এভাবে বারবার করতে থাক। একটি পিনকে লোহার দড়ের কাছে স্পর্শ করলে এটা পিনকে আকর্ষণ করছে। এভাবেই ষষ্ঠি পদ্ধতি প্রক্রিয়ায় লোহার দড় চূম্বকে পরিণত করা হয়। যদি চূম্বকটির উভয় মেরু দ্বারা ঘর্ষণ করা হয় তবে দেখা যাবে, প্রথম যে প্রান্ত থেকে ঘর্ষণ শুরু হবে দড়ের সেখানে উভয় মেরু এবং শেষ প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সূক্ষ্ম হয়েছে।



চিত্র-১০.১২: ষষ্ঠি পদ্ধতি

### বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

একটি লোহার পেঁরেক নাও। এবার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন সাধারণ বৈদ্যুতিক তার দিয়ে লোহার পেঁরেককে পেঁচিয়ে কূঙলী তৈরি কর। এবার তারের দুই প্রান্তকে একটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে যুক্ত কর। এবার একটি আলপিন পেঁরেকের যে কোনো প্রান্তে আনলে দেখা যাবে পেঁরেকটি আলপিনকে আকর্ষণ করছে। তড়িৎ প্রবাহ বৰ্ধ করলে পেঁরেকটি আলপিনকে আকর্ষণ করে না। এটা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, পেঁরেকটি অস্থায়ী চূম্বকে পরিণত হয়েছে।



চিত্র-১০.১৩: বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

### পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র

একটি দড় চূম্বককে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় তা সব সময়ই উভয় দক্ষিণে মুখ করে থাকে। পৃথিবীর চৌম্বকত্বের জন্যই এ রকম হয়। পৃথিবীর সব জায়গাতেই ভূচূম্বকের প্রভাব বর্তমান। ঝুলস্ত অবস্থায় দড় চূম্বকের দুই মেরু পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুকে নির্দেশ করে। এখানে দড় চূম্বকের উভয় মেরু উভয় দিককে নির্দেশ করে। কিন্তু একটি উভয় মেরু সর্বদা দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। ফলে ভূচূম্বকের দক্ষিণ মেরু আসলে উভয় মেরু হিসাবে কাজ করে।

### নতুন শব্দ

চার্জ, স্থির বিদ্যুৎ, চলবিদ্যুৎ, পরিবাহী, অপরিবাহী, অর্ধপরিবাহী, সরল বর্তনী, চৌম্বক পদার্থ, অচৌম্বক পদার্থ ও ভূচূম্বক।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ঘর্ষণের ফলে নতুন কোনো আধানের সৃষ্টি হয় না বরং পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আধান এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়।
- সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
- বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য কোনো উৎস থেকে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হয়।
- একটি সরল বর্তনীতে বিদ্যুৎ সকল অংশে সমভাবে প্রবাহিত হয়।
- চুম্বকের দুই মেরুর আকর্ষণ ক্ষমতা বেশি।
- চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
- একটি দণ্ড চুম্বককে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় তা সব সময়ই উত্তর-দক্ষিণ মুখী হয়ে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকত্ত্বের জন্যই এ রকম হয়।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান প্ল্যান কর

১. \_\_\_\_\_ নিউক্লিয়াসের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে।
২. অর্ধপরিবাহী পদার্থ নিম্ন তাপমাত্রায় সাধারণত \_\_\_\_\_ মতো আচরণ করে।
৩. পৃথিবীর সব জায়গাতেই \_\_\_\_\_ প্রভাব বর্তমান।

#### সঠকিষ্ঠ উত্তর প্রশ্ন

১. আধানের উৎপত্তি হয় কীভাবে?
২. বৈদ্যুতিক বাহু কীভাবে আলো ছড়ায়?
৩. চোম্বক পদার্থকে কীভাবে চুম্বকে রূপান্তর করা যায়?

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক পাখায় রেগুলেটর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো-
 

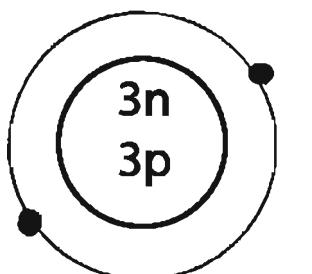
ক. পাখার আয়ুর্বকাল বৃদ্ধি	খ. শব্দ কমানো
গ. গতি নিয়ন্ত্রণ	ঘ. বিদ্যুৎ খরচ কমানো

২. চৌম্বক ধর্মের উপর ভিত্তি করে নিচের কোন মৌলসমূহ একই দলভুক্ত?

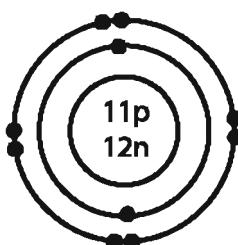
- ক. নিকেল, সিলভার, কপার  
গ. কোবাল্ট, লোহা, নিকেল

- খ. স্বর্ণ, কোবাল্ট, সিলভার  
ঘ. লোহা, পারদ, অ্যালুমিনিয়াম

নিচের চিত্র দুটো ভালোভাবে শক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র- A



চিত্র- B

- n → নিউট্রন  
p → প্রোটন  
• → ইলেক্ট্রন

৩. A চিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো— এটি

- i. চার্জ নিরপেক্ষ      ii. ধনাত্মক চার্জযুক্ত      iii. চার্জের ভারসাম্যহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i      খ. ii      গ. iii      ঘ. ii ও iii

৪. A ও B চিত্রের ক্ষেত্রে—

- ক. A ধনাত্মক চার্জযুক্ত  
গ. A ও B এর মধ্যে আকর্ষণ হয়

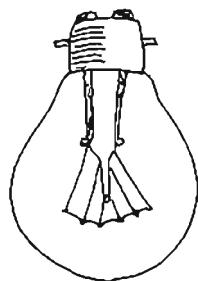
- খ. B ধনাত্মক চার্জযুক্ত  
ঘ. A ও B এর মধ্যে বিকর্ষণ হয়

### সূজনশীল প্রশ্ন

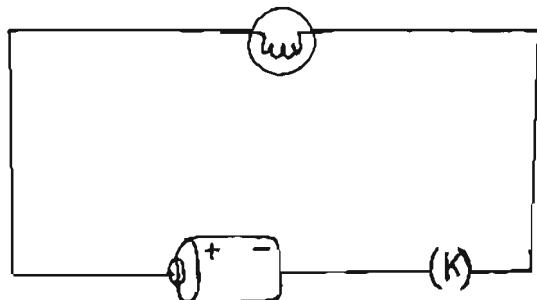
১. সামিহার নিকট একটি দড় চূম্বক আছে। সে দ্বর্ষণ প্রক্রিয়ায় একটি চূম্বক ও বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে আরেকটি চূম্বক তৈরি করল।

- ক. চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?  
খ. পৃথিবী একটি বিরাট চূম্বক, ব্যাখ্যা কর।  
গ. ১ম চূম্বক তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।  
ঘ. ২য় প্রকারের চূম্বকটি শক্তিশালী হলেও ক্ষণস্থায়ী— উল্লিটি বিশ্লেষণ কর।

২.



(১)



(২)

ক. স্থির বিদ্যুৎ কাকে বলে ?

খ. ধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় কেন ? ব্যাখ্যা কর।

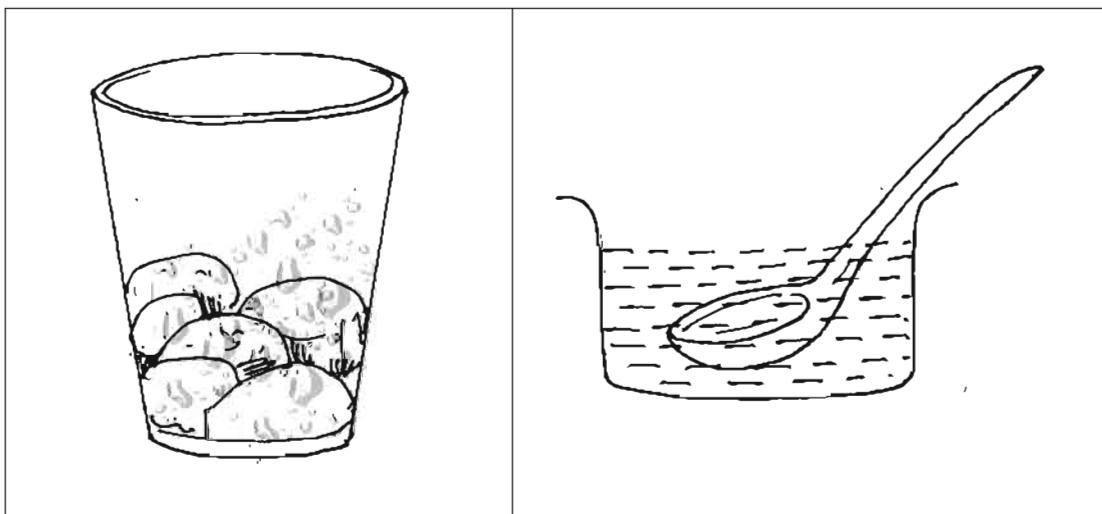
গ. ১ নম্বর চিত্রের যশেত্ত্বের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

ঘ. ২ নম্বর চিত্রে দুই ধরনের বিদ্যুতের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ক্ষেত্র উচ্চেষ্ঠপূর্বক বিশ্লেষণ কর।

## একাদশ অধ্যায়

# পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা

আমাদের চারপাশে প্রতি মুহূর্তে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এদের কোনো কোনোটি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় আবার কোনো কোনোটি হয়তো নানাবিধ ক্ষতির কারণও হতে পারে। প্রকৃতিতে ঘটা এ সকল নানা ঘটনায় বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রকৃতিতে সংস্থিত বিভিন্ন ঘটনার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব।
- রাসায়নিক ত্রিলোগি এবং পরিবর্তনের কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেতন ধাকব এবং অন্যদের সচেতন করব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহার করব।

### পাঠ-১: গলন ও স্ফুটন

**কজা:** একটি ছেট পাত্রে কিমু বরফের টুকরা যেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। কি ঘটছে? বরফ থীয়ে থীয়ে গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে। আজ্ঞা বলো তো, পানি ও বরফ কি একই পদার্থ না তিনি তিনি পদার্থ? পানি ও বরফ একই পদার্থ, এবং তিনি তিনি পদার্থ নয়। এদের অবস্থা শুধু তিনি। যখন পানির আকারে আছে, এটি তরল অবস্থা আর যখন বরফ আকারে আছে, এটি হলো কঠিন অবস্থা।



চিত্র-১১.১ : বরফসহ প্লাস

বরফ গলে পানি হওয়ার এই পরিবর্তন অর্থাৎ মেখানে শুধু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তাকে তৌক পরিবর্তন বলা হয়।

পানিতে তাপ দিলে কি হয়? পানির তাপমাত্রা বাঢ়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে পানি হটতে থাকে। তাহলে পানির স্ফুটন কি তৌক পরিবর্তন? হ্যা, অবশ্যই এটি একটি তৌক পরিবর্তন। কানপ এর ফলে পানি কেবলমাত্র তরল অবস্থা থেকে বাল্পে বা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হচ্ছে, এটি নতুন কোনো পদার্থে পরিণত হচ্ছে না।

আবার একটি বড় কালজ কেটে যদি আমরা কয়েকটি ছেট ছেট টুকরায় পরিণত করি, তাহলে এই পরিবর্তন কি তৌক পরিবর্তন কলব? হ্যা, এটিকেও তৌক পরিবর্তন বলব, কানপ এর ফলে কালজের আবার শুধু ছেট হয়েছে, কিমু এটি একই পদার্থই রয়ে গেছে এবং এর ধর্মের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।



চিত্র-১১.২ : বড় কালজ ও কালজের টুকরা

তাহলে বে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকসর-আকস্তির পরিবর্তন যাটো কিমু নতুন পদার্থের সূচি হয় না, তাদেরকে তৌক পরিবর্তন বলা হয়।

### পাঠ-২: খাড়ুর ক্ষয়

লোহার তৈরি রড তোমরা সবাই চেন। লোহার রড, কিমুদিন বাইয়ে কেলে রাখলে এর উপর মরিচা পড়ে ও রড থীয়ে থীয়ে কর হয়ে যায়। তোমরা কি জান মরিচা আসলে কি এবং কীভাবে এটি তৈরি হয়?

**কজা :** একটি পাত্রের অর্ধেক পরিমাণ পানি নাও। পেঁয়েকটি সাময়ানে আল্টে করে পাত্রের পানিতে দুবাগ। পাজাটি সূ-তিনি দিলের অন্য যেখে দাও। পেঁয়েকটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইঃ হ্যা, পেঁয়েকের উপরিভাগে মরিচা পড়েছে।

লোহার এই বে পরিবর্তন হলো অর্থাৎ মরিচা পড়ল, এটি কি ধরনের পরিবর্তন? এটি কি তৌক পরিবর্তন? এখানে লোহা বাতাসের অঙ্গিহেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে পানিযুক্ত ফেরিক অজাইড তৈরি করে। এই পানিযুক্ত ফেরিক অজাইডই হলো মরিচা। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোহা পরিবর্তিত হয়ে তিনি পদার্থ ফেরিক অজাইডে পরিণত হয়েছে বাব ধর্ম লোহার ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ তিনি।

এই সকল পরিবর্তন যেখানে এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

মরিচাতে একটু ঘষা লাগলেই এটি খসে পড়ে যায়। এভাবে মরিচ পড়ার ফলে লোহার ক্ষয় হয়।

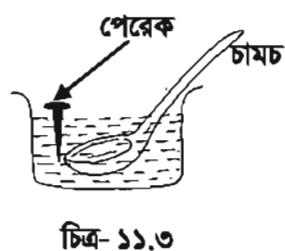
লোহার মতো অন্যান্য ধাতব পদার্থও (যেমন এলুমিনিয়াম ও তামা) বাতাসে ঝেঁকে দিলে ক্ষয় হতে পারে। তবে কিছু কিছু ধাতব পদার্থ যেমন— সোনা, প্রাচিনাম এগুলো খোলা বাতাসে রাখলেও ক্ষয় হয় না। সে কারণে এরা গহনা বা কখনো কখনো মৃদ্যা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

### পাঠ-৩ : স্টেইনলেস স্টিল

আচ্ছা তোমরা কি জান স্টেইনলেস স্টিল কি এবং এতে মরিচ পড়ে কিনা?

লোহার সাথে কার্বন, নিক্সেল ও ক্রোমিয়াম মিশালে স্টেইনলেস স্টিল তৈরি হয়। এটি মূলত এক ধরনের মিশ্রণ। স্টেইনলেস স্টিল লোহার চেয়ে অনেক গুন মজবুত ও শক্ত হয়। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এতে লোহার মতো মরিচাও পড়ে না। এবার পরীক্ষা করে তা দেখা যাক।

**কাজ:** একটি বিকারে দুই-তৃতীয়াংশ পানি নিয়ে তাতে স্টেইনলেস স্টিলের একটি চামচ ও একটি পেরেক বিকারের পানিতে ঢুবাও ও কয়েকদিন ঝেঁকে দাও। চামচে কি মরিচ পড়েছে? না, পড়েনি, কারণ স্টেইনলেস স্টিলে লোহা ধাক্কেও এর ধর্ম বিশুদ্ধ লোহা থেকে আলাদা। এটি অঙ্গিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে মরিচ তৈরি করতে পারে না। কিন্তু দেখ, পেরেকে মরিচ পড়েছে কারণ এটি লোহার তৈরি।



চিত্র- ১১.৩

তোমরা বাড়িতে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি নানা রকম জিনিসপত্রের তালিকা প্রস্তুত কর এবং দেখ এদের মধ্যে কোনগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আর কোনগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না। কেন এমনটি হচ্ছে তাও চিন্তা কর।

ধাতব পদার্থসমূহ ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকলে এক পর্যায়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি আমরা এ সকল ধাতব পদার্থ ব্যবহারে সচেতন হই এবং এদেরকে যথাপোয়ুক্তভাবে ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু এই ক্ষয় রোধ করা যেতে পারে। যেমন ধর লোহার তৈরি জিনিসপত্র যথা— হাতুড়ি, পেরেক ইত্যাদি পানি থেকে দূরে বা ব্যাসস্তব শুকনো জায়গায় রাখতে পারি। আবার অনেক সময় এদেরকে তৈল বা হিজেভিজেয়ে রাখলেও মরিচ পড়া বা ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যে সকল ধাতব পদার্থ ক্ষয় হয় তাদের ক্ষয় কিভাবে রোধ করা যায়?

ধাতুর ক্ষয় রোধ করার কয়েকটি উপায় হলো গ্যালভানাইজিং, পেইন্টিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং। এখন আমরা এসব উপায় সম্পর্কে জেনে নেই।

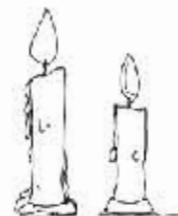
**গ্যালভানাইজিং :** আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে আমরা জিংক বা দস্তা ব্যবহার করে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম হলো গ্যালভানাইজিং। লোহার তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর উপর দস্তার পাতলা আস্তরণ দেওয়াকে গ্যালভানাইজেশন বলে। জিংক এর আবরণ লোহাকে বাতাসের অঙ্গিজেন ও পানি থেকে রক্ষা করে। ফলে মরিচ পড়তে পারে না লোহার ক্ষয়ও হয় না। দস্তার পরিবর্তে টিন দিয়েও অনেক সময় আবক্ষরন দিয়ে ধাতব পদার্থকে ক্ষয় হতে রক্ষা করা যায়।

**পেইচিং :** পেইচিং বা রং করেও খাতব পদার্থসমূহের কয় ঝোখ করা যায়। বাসায় অক্সিজেনেটর, আলমারি, গাঢ়ি, চিকিৎসের আসবাবপত্র এ সবই রং করা হয় পেইচিং সিঙ্গে, এসের কয় ঝোখ করা জন্য। এই পেইচিং সহজের সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেকেরে যত মুক্ত সম্ভব আবার পেইচিং করে নেওয়া ভাল।

**ইলেক্ট্রোপ্রেটিং:** ইলেক্ট্রোপ্রেটিং হলো ভাট্টিৎ বিলোবণের সাহায্যে একটি ধাতুর উপর আক্রমণ ধাতুর পাতলা আবরণ তৈরির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাধারণত নিকেল, ক্রোমিয়াম, টিন, সিলভার ও সোনা সিঙ্গে আবরণ তৈরি করা হয়। এতে একদিকে যেমন ধাতুর কয় ঝোখ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি আকর্ষণীয় ও চৰকচকে হয়। খাবাজের কৌটা, সাইকেল এণ্ডুসের কেঠে মোহায় উপর টিনের ইলেক্ট্রোপ্রেটিং করা হয়।

### পাঠ-৪: দহন

**কাজ :** ১টি দিয়াপশাই কাঠি দিয়ে মোমবাতি ঢুলাও। তামোগতাবে মুক্ত কর কি ঘটছে? মোমবাতির একটু অংশ আগুনে পৃষ্ঠে বাছে এবং অপর অংশটি গলে মোমবাতির গা বেয়ে নিচের দিকে নামছে এবং জমে বাছে। যে অংশ পৃষ্ঠে বাছে, সেটি কি ধরনের পরিবর্তন? আবার যে অংশ গলে নিচের দিকে পৃষ্ঠে জমে বাছে, সেটাই বা কি ধরনের পরিবর্তন?



চিত্র-১১.৪: মোমবাতির দহন

মোমের একটি অংশ গলে সমতোর মধ্যদিয়ে পিঙ্গে আগুনে পৃষ্ঠে বাছে। সেখানে মোমবাতি বাতাসের অঙ্গিজনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইক্ষেলাইট ও পানিতে পরিণত হচ্ছে এবং সাথে সাথে আলো ও তাপশক্তি উৎপন্ন করছে। উৎপন্ন কার্বন ডাইক্ষেলাইট বর্ণনান এবং পানি বাল্কীভূত হয়ে যায় বলে আমরা এসেরকে দেখতে পাই না। তাহলে মোমবাতির এই পরিবর্তন অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন। কর্তৃপক্ষ এর কলে মোমবাতির মোম সম্পূর্ণ তিনুখর্মা নতুন পদার্থ কার্বন ডাইক্ষেলাইট ও পানিতে পরিণত হচ্ছে। মোমের এই রাসায়নিক পরিবর্তন দেখানে এটি বাতাসের অঙ্গিজনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করেছে, এটিকে কোথা হয় মহল। অন্যদিকে যে অংশটি গলে নীচে পৃষ্ঠে জমে বাছে, সেটি কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন নয়, তোত পরিবর্তন, কর্তৃপক্ষ এখানে তাপে মোম গলে আবার আগের অবস্থায়ই কিন্তু এসেছে এবং এতে এর ধর্মের কোলোই পরিবর্তন হয়নি।

আমরা বাসাবাড়িতে চুলার প্রাকৃতিক গ্যাস পুঁতিরে বা খড়ি দিয়ে যে রান্না করি, সেটিও কিন্তু এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া। এখানে গ্যাস বা খড়ি বাতাসের অঙ্গিজনের সাথে বিক্রিয়া করে শুধু তাপশক্তি উৎপন্ন করে, বা দিয়ে আমরা আবার রান্না করি। একই ভাবে কচুলা বা কাঠ শোঁড়ানোও মহল।

তোমরা কি জান, আমরা যে নানা রকম কাজ করি তার জন্য এক শক্তি কোথা থেকে এবং কিভাবে পাই?

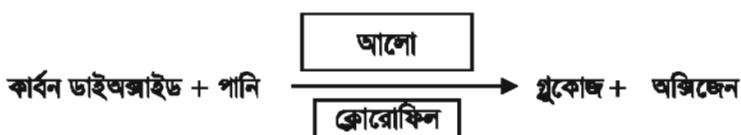
আমরা যে নানা রকম খাদ্য খাই, তা পরিপাকের পর খাদ্যসর দেহে শোষিত হয় এবং রজের মাথায়ে দেহের বিভিন্ন অংশে শোষায়। দেহকোষে এ খাবার তেজে প্রভু তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তিকে কাজে শালিয়েই আমরা নানা রকম কাজ করি। যদি তাপশক্তি উৎপন্ন না হতো, তাহলে আমরা শক্তিও পেতায় না, কোনো কাজও করতে পারতায় না। তাহলে স্পষ্ট যে, যে প্রক্রিয়ার আমরা খাবার থেকে শক্তি পাই, সেটি এক ধরনের মহল প্রক্রিয়া।

আমরা যদি শীর্ষ সময় খাবার না খাই, তাহলে কী ঘটে? আমরা শক্তিও পাই না কাজও করতে পারি না। কাজের খাবার না থেকে দেহকোষে মহল বন্ধ হয়ে যায়। কলে তাপশক্তি উৎপাদনও থেমে যায় আর আমরাও কোনো শক্তি পাই না।

সকল মহল প্রক্রিয়াই রাসায়নিক পরিবর্তন।

### পাঠ ৫-৬ : সালোকসংশ্লেষণ, পানি চক্র, কার্বন চক্র ও অক্সিজেন চক্র

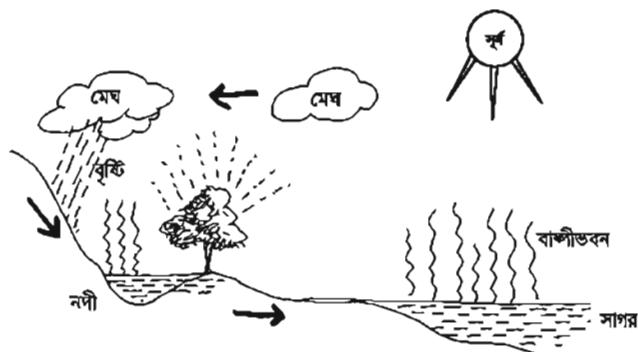
**সালোকসংশ্লেষণ :** তোমরা জান যে, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের ধাবার তৈরি করে। কিভাবে এটি ঘটে তা কি তোমরা জান ? এটি ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন ? সালোকসংশ্লেষণে গাছপালা আলোর সাহায্যে বাতাসে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির (জলীয় বাক্স) মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করে। উৎপন্ন ফুকোজ গাছপালার বেড়ে উঠার কাজে শাগে আর অক্সিজেন আমাদের প্রশাসে কাজে শাগে।



তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ ফুকোজ ও অক্সিজেন, বিক্রিয়ক পদার্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্নধর্মী। সে কারণে এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, তোত পরিবর্তন নয়। যদি সালোকসংশ্লেষণ না ঘটত তাহলে কি হতো ? আমরা প্রশাসের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন পেতাম না। তাহলে আমরা বলতে পারি সালোকসংশ্লেষণ এমন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

**পানি চক্র :** তোমরা জান, পানি নানা উৎস থেকে পাওয়া যায়। বেমন, আমরা বৃক্ষ থেকে আমাদের দেশে প্রচুর পানি পাই। বর্ষাকালে দেখ বন্যার পানিতে দেশের নানা জ্বালগা ছুবে যায়। আছ্ছা বলো তো, বন্যার পানি কোথা থেকে আসে ? বর্ষা শেষে আবার তা কোথায় চলে যায় ? পরের বছর আবার বর্ষাকালে কোথা থেকে বন্যার পানি আসে ?

পৃথিবীতে পানি তার এক উৎস থেকে অন্য উৎসে চক্রান্তে ঘোরে। বৃক্ষ কীভাবে হয় তা তোমরা জান। সূর্যতাপ ভূগূঠের অর্থাৎ পুরু, খাল, কিল, নদী ও সমুদ্রের পানিকে জলীয়বাক্সে পরিণত করে। জলীয়বাক্স বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্র পানিকণা একত্র হয়ে আকাশে যেখ হিসেবে সূর্যে বেড়ায়। মেঘের পানিকণাগুলো একত্রিত হয়ে আকাশে বড় হয়ে বৃক্ষিক্ষণে মাটিতে পড়ে। মেঘের পানিকণাগুলো খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃক্ষ হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে। বৃক্ষের পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর পানির সাথে মেশে। নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানিতে মেশে। এভাবে ভূ-গূঠের পানি থেকে জলীয়বাক্স, জলীয়বাক্স থেকে যেখ, যেখ থেকে বৃক্ষ হিসেবে পানি আবার ভূ-গূঠে ফিরে আসে। বৃক্ষের পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সবশেষে সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির চক্রান্তে সূর্যে আসাকে পানি চক্র বলে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার যে, বৃক্ষের পানি চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচে পিণ্ডে সঞ্চিত হয়। এ পানিকে আমরা ভূগর্ভস্থ পানি বলি। ভূগর্ভস্থ পানি আমরা গান করতে, দৈনন্দিন ও সেচকাজে ব্যবহার করার জন্য উভোলন করে থাকি।



চিত্র-১১.৫ : পানিচক্র

আবাস বায়ু প্রবাহের কারণে জলীয়বাল্প মেঘগুলি উক্ত পিয়ে পর্বতের চূড়ায় পৌছায়। দেখানে মেঘের পানিকণা ঠাণ্ডার বরকে পরিষ্ঠত হয়। এই বরক শীঘ্রকালে সূর্যের তাপে গলে পানি হয়ে পাহাড়ের পা মেঘে নেমে আসে। এভাবে ছোট পাহাড়ি নদীর উৎপন্নি হয়। এই পাহাড়ি নদী বৃক্ষের পানির সাথে মিলে সমতলে বড় নদীতে পরিষ্ঠত হয়। এই নদীর পানি সবলের সমন্বে পিয়ে মেঘে। পানি থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পর্বতের চূড়ায় বরফ, বরফ গলে নদী—এভাবেও পানি চক্রকার্যে মুৱে আসাটা কালোভাবে বুঝতে পারবে।

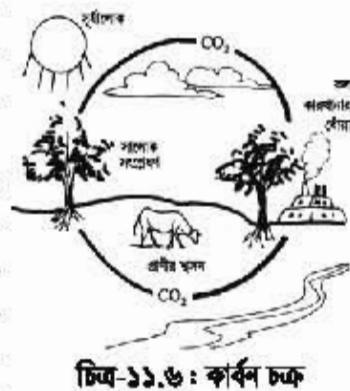
পানি চক্রে জড়িত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন হচ্ছে বাস্তীভবন, ঘনীভবন ও কঠিনীভবন। এদের কোনটি কি ধরনের পরিবর্তন দেখা যাক।

**বাস্তীভবন :** এ প্রক্রিয়ার নদ—নদী, খাদ—বিশ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের তাপে পানি বাস্তীভূত হয়ে জলীয়বাল্পে পরিষ্ঠত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তোমরা বলো তো বাস্তীভবন কি তোত না রাসায়নিক পরিবর্তন? এটি অবশ্যই একটি তোত পরিবর্তন। কারণ এতে পানি শুধু তরল অবস্থা থেকে বাল্পে পরিষ্ঠত হয়েছে, তিন্মধ্যমী কোনো নতুন গদার্থ তৈরি হয়নি।

**ঘনীভবন :** বাস্তীভবনের ফলে সৃষ্টি জলীয়বাল্প ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে, দেখানে কাপমাত্রা ফুলনামূলকভাবে কম। ফলে এক পর্যায়ে জলীয়বাল্প ঘনীভূত হয়ে পানির ছোট ছোট কণা বা মেঘে পরিষ্ঠত হয়। জলীয়বাল্প থেকে মেঘ তৈরির প্রক্রিয়াটিই হলো ঘনীভবন। এটিও একটি তোত পরিবর্তন এবং মূলত বাস্তীভবনের বিপরীত। এই প্রক্রিয়ার পানি কেবল মাঝ বাল্প থেকে তরলে পরিষ্ঠত হচ্ছে, এর ধর্মের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

**কঠিনীভবন :** পানিচক্রে মেঘের পানি কণা অসে কারকে পরিষ্ঠত হয়ে পর্বতের চূড়ায় জমা হয় ও শিলা হিসেবে মাটিতে নেমে আসে। পানি কারকে পরিষ্ঠত হওয়াটা কী ধরনের পরিবর্তন? এতে কী পানির ধর্মের পরিবর্তন হয়? পানির ধর্মের পরিবর্তন হয় না বলে এটি তোত পরিবর্তন।

**কার্বন চক্র :** কার্বন চক্রের মাধ্যমে আমরা মূলত দেখতে পাই কীভাবে কার্বন ভাইক্সেজাইট প্রক্রিয়তে এক মাধ্যম বা অবস্থা থেকে অন্য মাধ্যম বা অবস্থায় চক্রকার্যে মুৱাতে থাকে। পাশের চিত্রে কার্বন চক্র দেখানো হলো: তোমরা কি বুঝতে পারছ এখানে কী ধরনের প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন জড়িত? এখানে জড়িত পরিবর্তনসমূহের মধ্যে একটি হলো সালোকসংস্কৃত্য। তোমরা আসেই জেনেছ যে, এই প্রক্রিয়ার পাছপালা বাতাসের কার্বন ভাইক্সেজাইট ও পানি থেকে সূর্যের আলোর সাহায্যে কাদের আবার অর্ধৎ ফুকোল তৈরি করে এবং আমদের জন্য অঙ্গিজেন তৈরি করে। তোমদের কি মনে আছে এটি কী ধরনের পরিবর্তন? এই প্রক্রিয়ার মধ্যেমে কার্বন ভাইক্সেজাইট বায়ুমণ্ডল থেকে উড়িসের শরীরে প্রবেশ করে। কার্বন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো পাছপালা থেকে জীবাণু জ্বালানিতে মৃগাক্ত। উড়িস বা পাছপালা মতো গেলে এদের দেহবশেৰ ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেটে যাব এবং এক পর্যায়ে জীবাণু জ্বালানি হিসেবে ভূংতে জমা হয়। আমদের অতি ব্যবহৃত প্রক্রিয়ক গ্যাস, কমলা কেয়োলিন বা পেট্রোল—এসবই এই প্রক্রিয়া তৈরি হয়। তবে মৃত পাছপালা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ধূধন তাঢ়ে, তখন এর একটি অল্প সরাসরি কার্বন ভাইক্সেজাইটে



চিত্ৰ-১১.৬ : কার্বন চক্র

পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা রান্না থেকে শুরু করে গাঢ়িতে, শিক্ষকারখানায় দহন করে তিনি তিনি কাজে ব্যবহার করছি। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা দ্বারা শোষিত হচ্ছে।

দহন ছাড়া আর কোনো উপায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে কি?

হ্যা, মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে এবং তা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। গাছপালা ছাড়া আর কোন উপায়ে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে শোষিত হচ্ছে? আচ্ছা গাছপালা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে শুধুই খাবার তৈরি করে? এরা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় না? হ্যা, মানুষ বা অন্য প্রাণীর মতো গাছপালাও এদের নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়।

এখন তোমরা বলো তো গাছপালা বা প্রাণীদেহ থেকে যে জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হয়, সেটি কি ধরনের পরিবর্তন? এটি অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি গাছপালায় থাকা স্টার্চ, প্রোটিন ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নথর্মী।

**অক্সিজেন চক্র :** পাশের চিত্রে অক্সিজেন চক্র দেখানো হলো। এই চক্রে কৌ কী প্রক্রিয়া জড়িত? ভালোভাবে খেয়াল কর। গাছপালা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় ও নিজেদের জন্য খাবার (যেমন হুকোজ বা স্টার্চ) সংরক্ষণ করে রাখে। আবার অন্য দিকে মানুষসহ অন্য প্রাণীরা গাছের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং গাছপালা বা অন্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্য ঐ অক্সিজেনের সাহায্যে দহন করে শক্তি উৎপন্ন করে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় যা আবার গাছপালা ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য তৈরির কাজে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণ, কার্বন চক্র, পানি চক্র ও অক্সিজেন চক্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

**গাঠ-৭, ৮:**

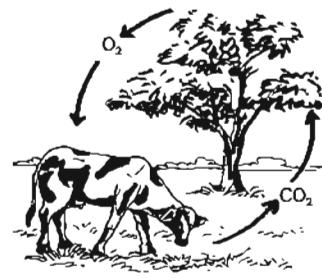
**কাজ :** ম্যাগনেসিয়াম ও বায়ুর দহন পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ম্যাগনেসিয়াম রিবন, চিমটা, লাইটার স্পিরিট স্যাম্প/ বুনসেন বার্নার।

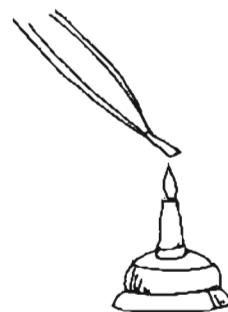
**পদ্ধতি:** ম্যাগনেসিয়াম রিবনের একটি ছোট টুকরার (৮ সেন্টিমিটার) এক মাথা চিমটা দিয়ে ধর। চোখে নিরাপত্তা চশমা পরে নাও। রিবনের অন্য মাথাটি বুনসেন বার্নারের শিখার উপর ধর। লাইটার দিয়েও এটি করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ কর কী ঘটছে!

**ম্যাগনেসিয়াম রিবনটি আগনের শিখার উপর ধরায় কী দেখলে?** রিবনে

আগুন ধরে গেল এবং অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত শিখাসহ ঝুলতে লাগল। এর চিত্র-১১.৮: ম্যাগনেসিয়াম ও বায়ুর দহন পর্যবেক্ষণ



চিত্র-১১.৭ : অক্সিজেন চক্র

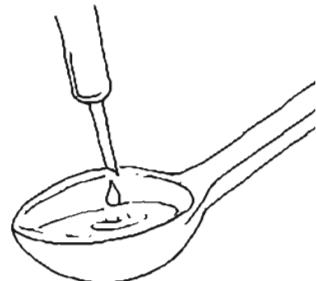


আমরা প্রচলিত শিখা দেখতে পাই। এভাবে যখন সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আগনা আগনি শিখা নিভে যায়। শেষে তোমরা ছাই-এর মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? এটি আসলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

**কাজ :** কার্বোনেট ঘোগ ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** চক, ১টি চামচ, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কাঁচের ছাপার।

**পদ্ধতি :** চকটিকে শুঁড়া করে নাও। চকের শুঁড়া চামচে নাও। এবার কাঁচের ছাপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড চামচে ঘোগ করতে থাক। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে? ইঁয়া, গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে এবং অনেকটা ফেনার মতো মনে হচ্ছে।



চিত্র-১১.৯: কার্বোনেট ঘোগ ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

এর কারণ কি? কারণ হলো, চক হচ্ছে মূলত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ( $\text{CaCO}_3$ )। পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঘোগ করাতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কারণেই আমরা বৃদ্ধবৃদ্ধ দেখি ও ফেনার মতো দেখায়। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ও পানির পরিষ্কার দ্রবণ দেখতে পাই।

এটি কী ধরনের পরিবর্তন? ভৌত না রাসায়নিক? এটি রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ উৎপন্ন পদার্থ (ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি) ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এদের ধর্মণ পুরোপুরি ভিন্ন। চকের বদলে তোমরা ডিমের খোসাও ব্যবহার করতে পার। কারণ এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে।

### পাঠ-৯, ১০ :

**কাজ :** ধাতু ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ম্যাগনেসিয়াম রিবন, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, স্পিগ্রিট ল্যাঙ্ক ও টেস্ট টিউব।

**পদ্ধতি :** টেস্টটিউবের অর্ধেক পরিমাণ ভরে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। ম্যাগনেসিয়াম রিবনের কয়েকটি ছোট ছোট টুকরা এসিডে ছেড়ে দাও। কোনো গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে কি? না উঠলে স্পিগ্রিট ল্যাঙ্ক জালিয়ে টেস্ট টিউবের তলায় হালকা তাপ দাও। গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ উঠছে কি? এটি ম্যাগনেসিয়াম ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বৃদ্ধবৃদ্ধ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেস্ট টিউবের মুখে একটি জলজ দিয়াশলাই ধরে দেখ কি ঘটে? পপ পপ শব্দ করে ঝুলছে? ইঁয়া, ঠিক তাই। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না। ধাতুর সাথে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া কী ধরনের পরিবর্তন? অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ এতে সম্পূর্ণ ভিন্নথার্মী নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাগনেসিয়াম রিবন ছাড়াও তোমরা জিংক, এলুমিনিয়াম, কপার বা অন্য ধাতু দিয়েও এ পরীক্ষা করতে পার।

### শিলা গঠন প্রক্রিয়া

এর আগে তোমরা জেনেছ যে শিলা তিনি ধরনের হয়, যথা আঙ্গোহ শিলা, পাশলিক শিলা ও বৃপ্তান্তরিত শিলা। শিলার গঠন প্রক্রিয়া নির্ভর করে এটি কী ধরনের শিলা তার উপর। প্রথমে আঙ্গোহ শিলার কথাই ধরা যাক। তোমরা কি জান, আঙ্গোহ শিলা কীভাবে গঠিত হয়েছে? হাজার হাজার বছর আগে পৃষ্ঠিয়ার তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আজকের বাসযোগ্য পৃষ্ঠিয়া হয়েছে। পৃষ্ঠিয়া ঠাণ্ডা হওয়ার সময় ঝু-গর্ভের অভ্যন্তরে উভক্ষণ ও গলিত শিলা (যা ম্যাগমা নামে পরিচিত) আটকে পড়ে। এই ম্যাগমা পরে ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে আঙ্গোহ শিলা বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আঙ্গোহ শিলা মূলত উভক্ষণ মিশ্রণ ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে, নতুন পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। তাহলে আঙ্গোহ শিলার গঠন প্রক্রিয়া অবশ্যই একটি ভৌত পরিবর্তন, ঠিক যেমনটি ঘটে জলীয়বাস্ত থেকে ঘনীভবনের মাধ্যমে পানি বা মেঘ তৈরির সময়।

এবার দেখা যাক পাশলিক শিলা কীভাবে গঠিত হয়। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাতাস, পানি, তুষার ও হিমবাহ সমৃদ্ধযোগে, ঝুঁড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদির প্রভাবে আঙ্গোহ শিলা ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। ফলে চূর্ণবিহুর্ণ হয়ে ছেট ছেট কণায় পরিণত হয়। এই ছেট ছেট কণাগুলো পানি বা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হয়ে নদ-নদীর মাধ্যমে সাগরে সিয়ে পড়ে এবং তলদেশে আস্তে আস্তে পশ্চিমে জমা হয়। এই সময় এর সাথে জীবজীব বা গাছপালার দেহবশেষও পগি স্তরের মাঝে আটকা পড়ে। পানির চাপ ও তাপে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জমাকৃত পগি ধীরে ধীরে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে পাশলিক শিলা বলে। যেহেতু পাশলিক শিলার গঠনে নানাবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত থাকে, তাই এদের গঠন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

এবার বৃপ্তান্তরিত শিলার গঠন প্রক্রিয়া দেখে নেয়া যাক। বৃপ্তান্তরিত শিলা তৈরি হয় আঙ্গোহ বা পাশলিক শিলা থেকে। তাপ, চাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে আঙ্গোহ বা পাশলিক শিলা পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের যে শিলা তৈরি করে, তাকেই বৃপ্তান্তরিত শিলা বলে। যেমন বেলে পাথর (sandstone) একটি পাশলিক শিলা এবং এটি বৃপ্তান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজে (quartz) পরিণত হয় বলে কোয়ার্টজ একটি বৃপ্তান্তরিত শিলা। একই ভাবে চুনাপাথর থেকে মার্বেল এবং কয়লা থেকে থ্রাফাইট তৈরি হয় বলে মার্বেল ও থ্রাফাইটও বৃপ্তান্তরিত শিলা। বৃপ্তান্তরিত শিলার ধর্ম মূল শিলা থেকে আলাদা হওয়ায় এবং বৃপ্তান্তরের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত বলে বৃপ্তান্তরিত শিলার গঠন এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন হিসেবে ধরা যায়।

#### এই অধ্যায়ে আমরা যা বা শিখলাম

ভৌত পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় না ও পদার্থের ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় না।

- রাসায়নিক পরিবর্তনে এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয়।
- লোহার তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর উপর দস্তার পাতলা আস্তরন দেয়াকে গ্যালভানাইজেশন বলে।
- ইলেক্ট্রোপ্লেটিং হলো তড়িৎ বিপ্লবণের সাহায্যে একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর পাতলা



চিত্র-১১.১০ : শিলা

ଆକ୍ଷମଣ ତୈରିର ପଢ଼ିଯା ।

- দহনে কোনো পদাৰ্থ বাতাসের অঙ্গিজনেৱ সাথে বিক্ৰিয়া কৰে ভাপশক্তি উৎপন্ন কৰে।
  - পানি চক্ৰে জড়িত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কয়েকটি পৰিৰবৰ্তন হচ্ছে বাষ্পীভৱন, ঘনীভৱন, বৃষ্টি, প্ৰবেদন ও ক্ষৰণ।
  - শিলা তিন ধৰনেৱ হয়, যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও বৃপ্তাত্ত্বিত শিলা।
  - আগ্নেয় শিলাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়ায় ভৌত পৰিৰবৰ্তন এবং পাললিক শিলা ও বৃপ্তাত্ত্বিত শিলাৰ গঠনে রাসায়নিক পৰিৰবৰ্তন জড়িত।

અનુભૂતિ

ଶୁନ୍ୟତାନ ପୁନ୍ରମ କରି

১. স্ফুটন একটি \_\_\_\_\_ পরিবর্তন।
  ২. চায়ে চিনি মিশানো একটি \_\_\_\_\_ পরিবর্তন।
  ৩. কাগজ পুড়ানো একটি \_\_\_\_\_ পরিবর্তন।
  ৪. ক্রমণ প্রক্রিয়া \_\_\_\_\_ চক্রের সাথে জড়িত।
  ৫. দুনাপাথর একটি \_\_\_\_\_ শিলা।

સરકિલ દિનો

১. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
  ২. দহন কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
  ৩. চুলায় খড়ি বা গ্যাস পুড়ালে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়, ভৌত না রাসায়নিক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
  ৪. পানি চক্রের ক্রমতৃ আলোচনা কর।
  ৫. আগ্নের শিলা, পালঙ্কি শিলা ও ঝঁপাঞ্জিরিত শিলার বৈশিষ্ট্য কী কী?

બહનિર્ણાયક ધર્મ

১. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন?

କୁଣ୍ଡଳ

১০৮

গ. সালোকসংশোধন

୪. ପ୍ରସ୍ତେନ

২. P ও Q এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো-

  - প্রাণী শসনের সময় P ত্যাগ করে
  - উজ্জিদ ও প্রাণীর শসনের প্রধান উপাদান Q

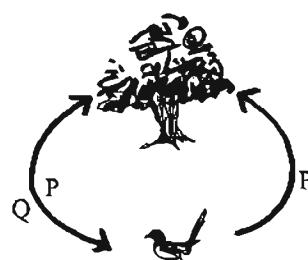
### ମିଶ୍ର କୋନ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧ

五

三

V. I

卷之三



নিচের উকীলকের আলোকে ৩ ও ৪ সম্মত প্রয়োগ উন্নত দাও:

আমিস সাহেব একজন নির্মাণ টিকাদার। তিনি বিশ্বব্যাপের সৌন্দর্য বাঢ়াতে সাধারণত চূনাপাথরের  
রূপান্তরিত শিলা ব্যবহার করেন। তবে কখনও কখনও প্রানাইট পাথরও ব্যবহার করেন, যা ম্যাপমা থেকে উৎপন্ন।

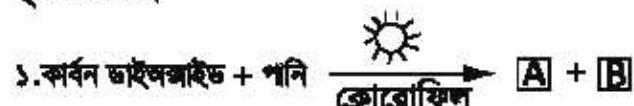
৩. উকীলকে উকুলিত রূপান্তরিত শিলাটিকে এসিড প্রয়োগ করলে কোন গ্যাসটি উৎপন্ন হবে?

- ক.  $O_2$       খ.  $CO_2$       গ.  $N_2$       ঘ.  $H_2$

৪. উকীলকে উকুলিত প্রানাইট কোন ধরনের শিলা?

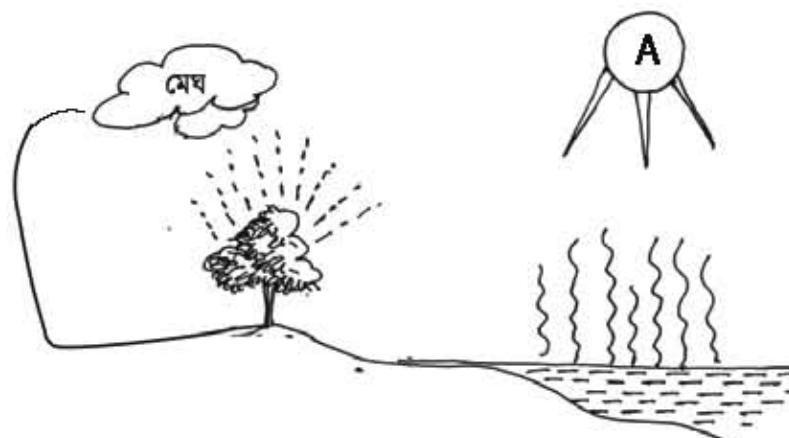
- ক. আঙুর      খ. পাশলিক      গ. রূপান্তরিত      ঘ. জীবাশ্ম

### সূজনশীল ধূম



- ক. মরিচা কী?  
 খ. ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বলতে কী বুঝাব?  
 গ. উকীলকে উকুলিত বিজিয়াতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. উকীলকের A ও B-এর মধ্যে কোন উপাদানটি পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয় বিশ্লেষণ কর।

২।

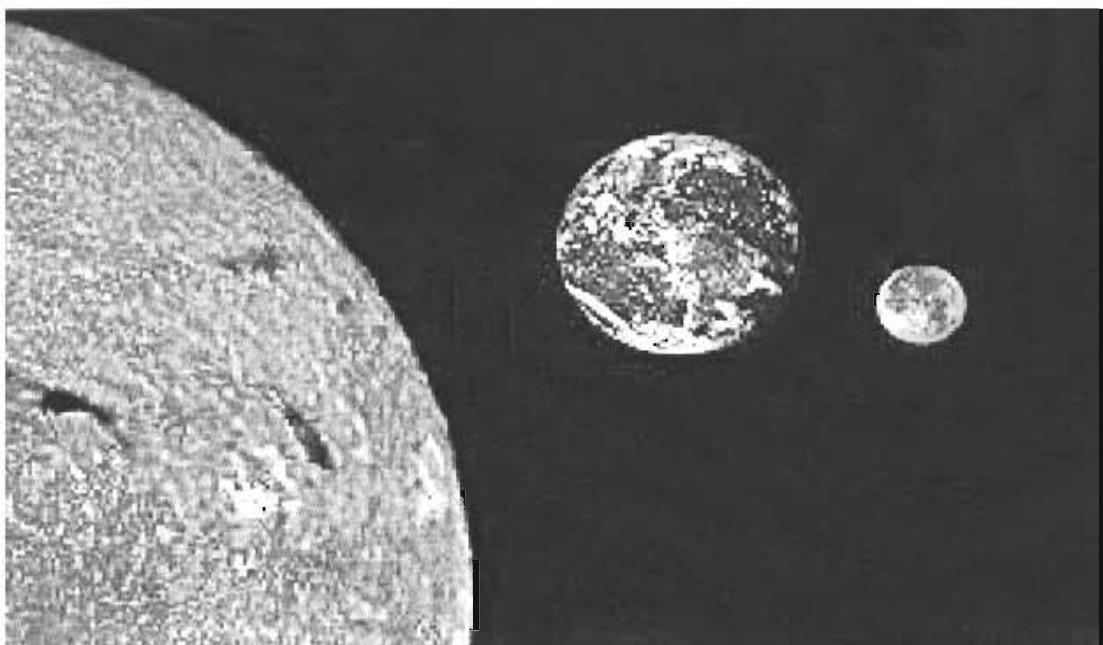


- ক. উপরের চিত্রটি কীসের?  
 খ. পাশলিক শিলা কীভাবে তৈরি হয়?  
 গ. চিত্রের উকুলিত অক্সিয়াটি ব্যাখ্যা কর?  
 ঘ. চিত্রের অক্সিয়াটিকে A -এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

## দাদশ অধ্যায়

# সৌরজগত ও আমাদের পৃথিবী

আমাদের বাসভূমি পৃথিবী, অন্য সাতটি গ্রহ এবং আরও কিছু জ্যোতিস্ক সূর্যকে কেন্দ্র করে সব সময় ঘূরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণিয়মান সকল জ্যোতিস্ক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা। আমাদের এই পৃথিবী দুই ভাবে ঘূরছে। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর পাক খাচ্ছে আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে এক বছরে একবার ঘূরে আসছে। পৃথিবীর এ ঘোরার ফলেই দিন-রাত হয়, খাতু পরিবর্তিত হয়।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- সৌরজগতের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৌরজগতের সদস্যদের ভৌত বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে পারব।
- সৌরজগতের গঠন কাঠামোর চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- পৃথিবী ঘূর্ণনের প্রভাব এবং এর ফলে স্ফট ফ্লাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবজগতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারব।

## পাঠ-১: সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের কিছুটা পরিচয় পেয়েছ। ভোরবেলায় সূর্যকে পূর্ব দিগন্তে উঠতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে এটি আমাদের মাথার উপরের দিকে উঠে আসে। সন্ধিয় দেখ সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুবে যায়। রাত শেষে পরদিন ভোরে সূর্যকে আবার পূর্ব দিগন্তে উঠতে দেখ। পৃথিবী থেকে মনে হয় সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর চারপাশে ঘূরছে। আগের দিনের মানুষ এটাই মনে করতেন। তবে বিজ্ঞানীরা এখন প্রমাণ করতে পেরেছেন যে আসলে সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। বরং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘূরছে—এটা কেন্দ্র আমাদের মনে হয়? তোমরা নিশ্চয়ই বাস, লঞ্চ বা রেলগাড়ীতে করে দূরে বেড়াতে গিয়েছ? তোমরা কি একটা বিষয় খেয়াল করেছ? এগুলো যখন খুব দুর যায়, তখন পাশের গাছপালা গুলো পেছনের দিকে ছুটছে বলে মনে হয়। আসলে রেলগাড়ী, লঞ্চ বা বাস সামনের দিকে চলছে কিন্তু মনে হয় এটি দাঁড়িয়ে আছে। আর পাশের গাছপালা আসলে স্থির কিন্তু মনে হয় এগুলো পেছনের দিকে ছুটছে। পৃথিবী আর সূর্যের বাপারাটি তেমনি। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে কিন্তু পৃথিবী থেকে আমাদের মনে হয় সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘূরছে।

মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই সূর্য, চন্দ্র ও তাঁরা নিয়ে আগ্রহী ছিল। তবে সে সময় মহাকাশের এসব জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের যত্নপাতি ছিল না। তাই খালি চোখে যেমনটি বোঝা যেত তেমনটাই তারা বিশ্বাস করতেন। তোমরা হয়তো জেনেছো যে, অ্যারিস্টটল দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। তিনিও মনে করতেন পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে। এখন থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমী জোরালোভাবে বলেন যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সবকিছু ঘূরছে। তার এই মতবাদ দীর্ঘদিন মানুষ বিশ্বাস করেছে। কিন্তু কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ টলেমীর মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তার এই মতবাদকে কেউ ভুল প্রমাণিত করতে পারেননি।

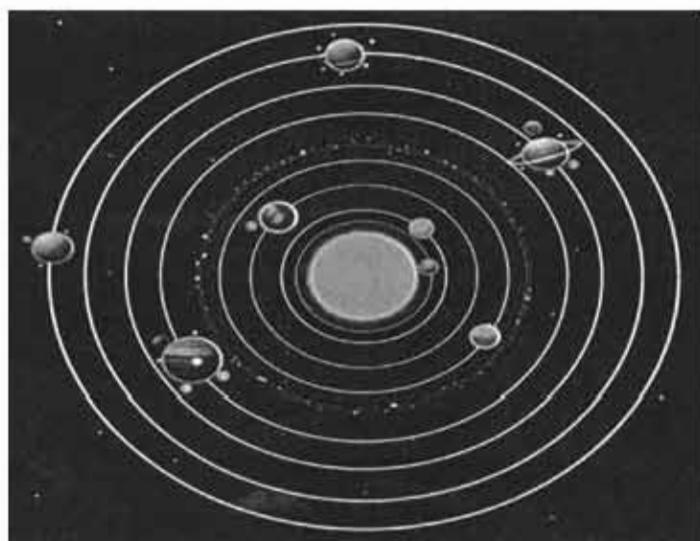
এরপর কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামে একজন জ্যোতির্বিদ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ নিয়ে আসেন। তিনি পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের বদলে সূর্যকেন্দ্রিক মডেলের প্রস্তাব করেন। তার মডেলের মূল কথা হলো পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তিনি আরও একটি নতুন কথা বলেন, সেটি হলো, পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর আবর্তন করছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ও কেপলার, কোপারনিকাসের এই মতবাদের পক্ষে প্রমাণ হাজির করেন। বর্তমানে সূর্যকেন্দ্রিক এই মডেল প্রমাণিত এবং বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করেছে।

## পাঠ ২-৪ : সৌরজগতের গঠন ও পরিচয়

তোমরা জেনেছ সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ আরও সাতটি গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ঘূরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল জ্যোতিষ্ক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা।

সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ বিভিন্ন দূরত্বে থেকে ঘূরছে। নিচে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলোর কক্ষপথ দেখানো হলো এবং সৌরজগতের সদস্যদের পরিচয় দেওয়া হলো।

**সূর্য:** আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র রয়েছে সূর্য। সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মতো ঘূর্ণ একটি গ্যাসপিণ্ড। এই ঘূর্ণ গ্যাসপিণ্ডে রয়েছে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু পরম্পরাগত সাথে মুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিষ্ঠক হয়। এ প্রক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তি ভাগ ও আলোকশক্তি হিসেবে সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সূর্যের কাছ থেকে আমরা ভাগ ও আলো পেয়ে থাকি।



চিত্র-১২.১ : সৌরজগৎ

**সূর্য মাঝারি আকাশের একটি নক্তু।** তারপরও এটি পৃথিবীর ঘূর্ণনায় জক জক গুণ বড়। সূর্য পৃথিবী থেকে আর ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তাই পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যকে এত হেট দেখি।

**এহসুসের পরিচয়:** সূর্যকে কেন্দ্র করে রয়েছে আটটি শহ। পৃথিবী এমন একটি শহ। এহসুস সাধারণত পোলার্কুলার। এহসুসেতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। কিন্তু এহসুসে নিজেরা শক্তি উৎপাদন করে না। তাই কোনো শহ নিজে আলো বা ভাগ নিসেবণ করে না। পৃথিবী থেকে সূর্যের অন্যান্য শহকে উজ্জ্বল দেখালেও এহসুসে আসলে সূর্যের আলোতে আলোকিত। এহসুসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো:

**শূন্য:** শূন্য সূর্যের সবচেয়ে কানেক্তি শহ। এতে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই।

**শূক্র:** পৃথিবী থেকে সক্রান্ত পশ্চিম আকাশে সক্রান্তারা এবং তোরকেোয়া শূক্রতারা অপে বে ভারাটি দেখা যাব, সেটি কোনো নক্তু নয়। এটি আসলে সূর্যের একটি শহ, যার নাম শূক্র। সূর্যের আলো এ শহের উপরে পড়ে। তাই আমরা একে আলোকিত দেখি।

**গুরুবী:** তোমরা হুরজো জান বে, কেবল পৃথিবীতেই জীবনের জন্য উপযোগী উপকরণ ও পরিবেশ রয়েছে। পৃথিবী সূর্য থেকে দূরত্বের দিকে দিয়ে ভূজীয় শহ।

**মঙ্গল:** মঙ্গলকে কখনো কখনো শাল শহ বলা হয় কারণ এর পৃষ্ঠ শাল রয়েছে। এর পৃষ্ঠ খুলিময় এবং শুধুই গাত্তা বায়ুমণ্ডল রয়েছে। মঙ্গলের মাটির নিচে গানি থাকার সত্ত্বাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা এখন ঘনে করেন।

**বৃহস্পতি :** বৃহস্পতি সূর্যের সবচেয়ে বড় গ্রহ। এটিতে শুধু গ্যাসই রয়েছে, কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই।

**শনি:** শনি প্রাহটিও কেবল গ্যাস দিয়ে তৈরি। এটিকে দ্বিতীয় কক্ষগ্রহে রিং বা আঠো রয়েছে।

**ইউরেনাস:** ইউরেনাস গ্যাস ও বরফ দিয়ে গঠিত।

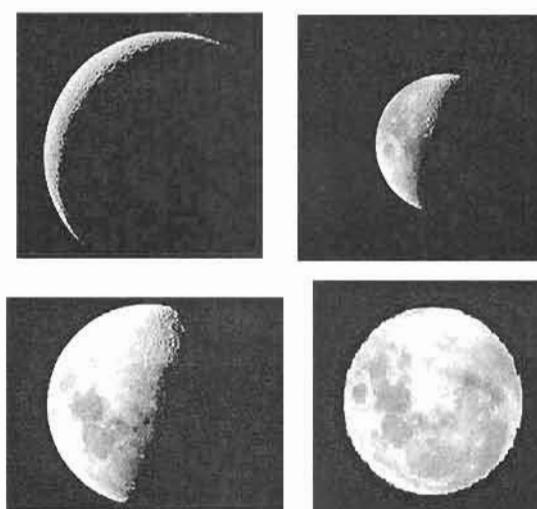
**নেপচুন :** নেপচুনও অনেকটা ইউরেনাসের মতো একটি গ্রহ।

আগে পুটো নামক একটি জ্যোতিস্ককে গ্রহ বলা হতো। কিন্তু ২০০৯ সালে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, এটি একটি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ গ্রহ।

**উপগ্রহ:** তোমরা জেনেছ সৌরজগতের প্রাহগ্রহে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তেমনি প্রাহগ্রহকে কেন্দ্র করে সূরহে ছোট ছোট উপগ্রহ। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। এটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূরহে।

উপগ্রহগ্রহে আকারে গ্রহের চেয়ে অনেক ছোট হয়। নিজেরা তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। এরা তাই সূর্যের আলো ধারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয় বলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি।

চাঁদ ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আঁচন্দের বস্তু। তোমরা দেখ যে চাঁদ এক রাতে হয়তো একেবারেই দেখা যায় না যাকে আমরা অমাবস্যা বলি। তার পরের রাতে সবু এক ফালি চাঁদ পঞ্চম আকাশে অন্ধ সময়ের জন্য দেখা যায়। এই সবু এক ফালি চাঁদ প্রতি রাতে বড় হতে থাকে। দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে একটি ধারার মতো দেখা যায়। একে আমরা পূর্ণিমা বলি। পূর্ণিমার পরের রাত থেকে চাঁদটি আবার ছোট হতে থাকে। এভাবে ছোট হতে হতে আবার দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে কোন এক রাতে এক বারের জন্যও দেখা যায়না। এভাবে ২৯ বা ৩০ দিন পর পর আমরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হতে দেখি। কেন এরকম হয়? এ প্রশ্নের উত্তর তোমরা উপরের শ্রেণিতে জানবে।



চিত্র- ১২.২ : নতুন চাঁদ ও পূর্ণিমার চাঁদ

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হলেও পৃথিবীর চারপাশে সূরহে ২৫০০ এর বেশি মানুষ প্রেরিত উপগ্রহ। এদেরকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলা হয়। এ কৃত্রিম উপগ্রহগ্রহে বেতার ও টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া এবং অন্যান্য তথ্য সঞ্চাহের জন্য প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেরও প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে।

### সৌরজগতে অন্যান্য জ্যোতিস্ক

আমাদের সৌরজগতে সূর্য, এবং উপর্যুক্ত ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য জ্যোতিস্ক। এরা হলো—ধূমকেতু, উকা ও গ্রহাণু। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা ভ্রূণছে। ধূমকেতু চেয়ে আকাশে বেশ ছোট কঠিন শিলাময় বা খাতব বস্তু—যাদের নাম গ্রহাণু। এরা ক্ষুদ্র প্রহের মতো। ধূমকেতুসমূহও আমাদের সৌরজগতের অংশ। এরা কঠিন (গ্যাস, বরফ ও ধূলিকণা) পদার্থ দিয়ে তৈরি। তবে তাপ পেলে কিছু অল্প সহজেই গ্যাসে পরিণত হতে পারে। যখন ধূমকেতুসমূহ সূর্যের কাছাকাছি যায় তখন সূর্যের তাপে গ্যাসীয় ও কঠিন পদার্থ নির্গত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে যায়। তখন এটি বাটার মত দর্শনীয় লোজে পরিণত হয়। পৃথিবী থেকে এদেরকে কখনো কখনো দেখা যায়। কোনো কোনো ধূমকেতু অনেক বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। যেমন, হালিল ধূমকেতু গড়ে ৭৫ বছর পর পর পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এটিকে ১৯১১ সালে এবং ১৯৮৬ সালে দেখা গেছে। একে আবার ২০৬২ সালে দেখা যাওয়ার কথা।



চিত্র-১২.৩: ধূমকেতুর ছবি

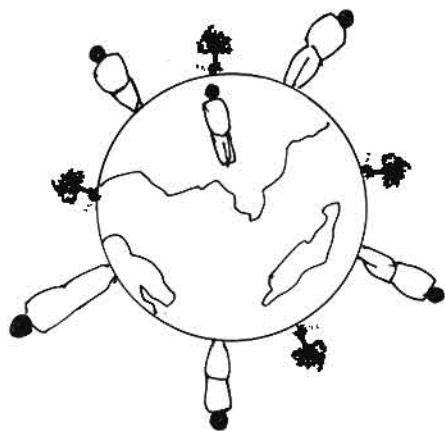
তোমরা কি কখনো রাতের বেলায় ইঠাং আকাশে আগুনের গোলক ছুটে যেতে দেখেছ? এরা উকাপিঙ্গ। সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিস্ক সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো উকাপিঙ্গ। এই ক্ষুদ্র কঠিন পিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌছালে বায়ুর সংসর্ক্ষণ এসে পুড়ে যায়। এ জন্য এদেরকে অগ্নিগোলকের মতো ছুটে বা পড়ে যেতে দেখা যায়। কখনো কখনো বড় উকাপিঙ্গ আধপোড়া অবস্থায় পৃথিবীগঠে পড়ে বড় গর্তের সৃষ্টি করে।

### পাঠ-৫: আমাদের বাসভূমি পৃথিবী

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। আমাদের এই পৃথিবীর আকার কেমন? আমরা চারদিকে তাকালে কি এর আকার বুঝতে পারি? একে কি গোলাকার চাকতি বা ধালার মতো মনে হয়? আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে একটি ধালার মতো মনে হয়। মনে হয় আমরা, আমাদের ঘরবাড়ি এই ধালা বা চাকতির উপরে আছি। আর আকাশ এই ধালাকে ঢেকে আছে। কিছু পৃথিবী ধালা বা চাকতির মতো নয়। এটি গোলাকার, তবে পুরোপুরি গোলাকার নয়। পৃথিবী কমলালেবুর মতো উভর-দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা।

গোলাকার পৃথিবী পৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ পানি আর একভাগ মাটি দিয়ে আবৃত। আর এই গোলাকার পৃথিবীকে ধীরে রয়েছে গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডল। তোমরা নিচয়ই ভূগোলক বা গ্রোব দেখেছো? আমরা ভূগোলকের

মতো একটি গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করছি। পশ্চ হলো, আমরা তাহলে পৃথিবী থেকে দূরে ছিটকে বা পড়ে যাই না কেন?



চিত্র-১২.৪: পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে মানুষের অবস্থান

এর কারণ অভিকর্ষ বল। পৃথিবী তার পৃষ্ঠের সবকিছুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে এই বলের সাহায্যে। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থানকারী কোনো কিছুই পৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ে না।

### পাঠ-৬, ৭ : পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন

তোমরা দেখ সকালে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে। সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিম দিগন্তে ঢুবে যায়। পরদিন সকালে তোমরা দেখ যে সূর্য আবার পূর্বদিক থেকে উঠছে। এ থেকে মনে হয় সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘূরছে। আগের দিনে মানুষরা তাই ধারণা করতো যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপরও আবর্তন করে বা পাক খায়। তোমরা নিশ্চয়ই লাটিম নিয়ে খেলেছো? লাটিম কীভাবে ঘোরে? লাটিম তার সবু আল—এর উপর দাঢ়িয়ে নিজে নিজে পাক খায় বা আবর্তন করে। একই সাথে মাটির উপর বৃক্ষাকার বা উপবৃক্ষাকার পথে এক স্থান থেকে অন্য স্থান হয়ে ঘূরে আসে।



চিত্র-১২.৫: লাটিমের দুই ধরনের ঘূর্ণন/গতি

এভাবে লাটিমটির দুই ধরনের গতি রয়েছে। একটি হলো নিজ অক্ষের উপর আবর্তন। আরেকটি হলো মাটির উপর দিয়ে ঘূরে আসা। লাটিমের মতো পৃথিবীরও দুই ধরনের ঘূর্ণন রয়েছে। একটি হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর আক্রিক

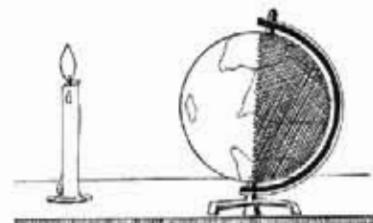
গতি। হিড়িটি হলো পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ও ঘণ্টা সময়ে একবার সূর্যের চারপাশে ঘূরে আসে। একে পৃথিবীর বার্ষিক গতি কہা হয়। পৃথিবীর আহিক গতির অর্থাৎ নিজ অক্ষে আবর্তনের কালখে দিন-রাত হয়। দিন-রাত কীভাবে হয় তা নিচের পরীক্ষাটির মাধ্যমে ভালভাবে বোঝা যায়।

**পরীক্ষণ :** পৃথিবীর আহিক গতির পরীক্ষা : দিন-রাত কীভাবে হয়?

**উপকরণ :** একটি ভূগোলক, একটি মোমবাতি অথবা কুণিবাতি

অথবা চার্জ লাইট।

**পরীক্ষণ পদ্ধতি:** মধ্যে ভূগোলক ভালভাবে সক কর। এর মাঝ বরাবর একটি খোলা এক প্রান্ত থেকে অন্য থাঁতে চলে গেছে। এটিকে পৃথিবীর অক্ষরেখ হিসেবে বরাবর কর যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তন করে।



চিত্র-১২.৬ : পৃথিবীর আহিক গতির পরীক্ষা

একটি চৌকিল বা সমকল যেবের উপর বাতিটি ঝালিয়ে রাখ। এবার একটু দূরে ভূগোলকটিকে রাখ। কক্ষটির আলো নিয়ে বা দরজা আলো বন্ধ করে দুর্বাট অন্ধকার কর। বাতিটিকে সূর্য এবং ভূগোলকটিকে পৃথিবী হিসেবে ধ্বনেচনা কর। এবার ভূগোলকটির দিকে ভাকাও। ভূগোলকটির সবদিক কি সমান আলোকিত? না কোন দিক আলোকিত আর তার উপরে দিক অন্ধকারাজন্ত? দেখতে পাই নিচয়ই বে ভূগোলকটির অর্ধেক অংশ আলোকিত আর অন্য অর্ধেক অন্ধকারাজন্ত। কোন অর্ধেক আলোকিত? বে অর্ধেক বাতিটির দিকে আছে। আমরা আলোকিত অংশকে দিন আর অন্ধকারাজন্ত অংশটিকে রাত মনে করতে পাই। এবার ভূগোলকটি আস্তে আস্তে ঘোরাও এবং সক করে দেখ কী হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অন্ধকার অংশ আস্তে আস্তে আলোকিত হচ্ছে এবং আলোকিত অংশ ধীরে ধীরে অন্ধকার হচ্ছে। কিন্তু সক্ষময়ই ভূগোলকটির অর্ধেক অংশ আলো পাছে এবং বাকি অর্ধেক অংশ আলো পাছে না। এভাবে পৃথিবীর অর্ধেকাংশে দিন এবং বাকি অর্ধেক রাত চলতে থাকে। ভূগোলকটির একটি নির্দিষ্ট স্থান বাতিটির সামনে ঝোঁকে ধীরে ধীরে একদিকে ঘোরতে থাকলে এই আলোকিত অংশ (দিন) ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে হতে একসময় পুরোপুরি অন্ধকার (রাত) হয়ে যাবে। একই দিকে আরও ঘোরাতে থাকলে আবার এই নির্দিষ্ট স্থানটি আলোকিত হতে শুরু করে এবং একসময় পুরোপুরি আলোকিত হয়ে যাব। অর্থাৎ এই স্থানে আবার দিন কিরে আসে।

এই পরীক্ষাটির মতো পৃথিবী তার নিজ অক্ষে আবর্তন করে ফলে আমরা দিন, ভারপুর রাত, আবার দিন, আবার রাত, আবার দিন এই ইকম পরিবর্তন হতে দেখি। অন্যক্ষেত্রে, দিন-রাত-দিন-রাত-দিন এই পরিবর্তন আমরা দেখি কালে পৃথিবী তার নিজ অক্ষে আবর্তন করে বলে।

### পাঠ-৮, ৯ : সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর সূর্ণন- পৃথিবীর বার্ষিক গতি

ইতোমধ্যে তোমরা পৃথিবীর আহিক গতি বা নিজ অক্ষের উপর আবর্তন সম্পর্কে জেনেছ। পৃথিবীর অন্য গতিটি হচ্ছে বার্ষিক গতি। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩৬৫ দিন ও ঘণ্টা সময়ে একবার ঘূরে আসে। এই সময়কে এক সৌম বছো বা এক বছো কہা হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিন-রাত ছেট বা বড় হয় এবং বড়ুর পরিবর্তন হয়।

তোমরা কী বছরের সবসময় একই রকমের আবহাওয়া দেখতে পাও? জানুয়ারি মাসে বা পৌষ-মাঘ মাসে শীত না গরম থাকে? আষাঢ় বা ভাদ্র মাসে আবহাওয়া কি পৌষ মাসের মতোই, না তিনি? আমরা দেখি বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আবহাওয়া থাকে। পৌষ বা মাঘ মাসে বেশ শীত পড়ে আবার বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ গরম পড়ে। কেন, তা ভাব তো? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কীভাবে ঘোরে তা জানলে।

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কিছুটা হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তবে পৃথিবী বছরের বিভিন্ন সময়ে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করে। তাই পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট অংশ একটি নির্দিষ্ট সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অংশ যখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, তখন সেই অংশটি বেশিক্ষণ ধরে এবং খাড়াভাবে সূর্যের তাপ পায়। পৃথিবীর সেই অংশে তখন গ্রীষ্মকাল। তোমরা হয়তো জান যে, পৃথিবীর বিশুব রেখার দুই পার্শ্বকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করা হয়। উভয় অংশকে উভয় গোলার্ধ এবং দক্ষিণ অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ ধরা হয়। আমরা উভয় গোলার্ধে বাস করি। ২১ জুন তারিখে বাংলাদেশ সূর্যের কিছুটা কাছে চলে আসে। তাই এসময়ে আমরা সূর্যকে আমাদের মাথার উপর দেখতে পাই। এই সময়ে আমরা সবচেয়ে লম্বা দিন ও ছেট রাত দেখতে পাই। খাড়াভাবে এবং লম্বা সময় সূর্যের তাপ পাওয়ার কারণে এই সময়টিতে এবং এর কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে। তবে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই সময়ে বাংলাদেশে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে আমরা এই সময়টিকে বর্ষাকাল বলে থাকি।

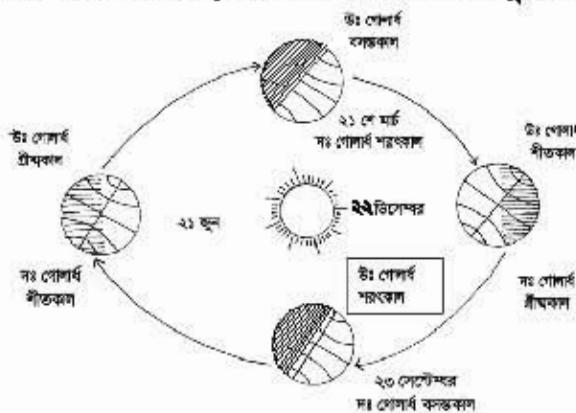
২১ জুন পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তখন রাত বড় হয়, দিন ছেট হয় এবং ওখানে সূর্যের তাপ তির্যক বা হেলানোভাবে পড়ে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধ এ সময় সূর্যের তাপ কম পায়। ওখানে তখন শীতকাল। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় জুন, জুলাই ও আগস্ট এই তিন মাস শীতকাল।

পৃথিবী ২১ জুনের পরে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। বাংলাদেশসহ উভয় গোলার্ধ কিছুটা দূরে সরে যেতে থাকে, একই সাথে দক্ষিণ গোলার্ধ কিছুটা সূর্যের দিকে এগোতে থাকে। এইভাবে সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখে পৃথিবীর বিশুব অঞ্চল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং উভয় ও দক্ষিণ মেরু ঐ সময়ে সূর্য থেকে সমান দূরত্বে থাকে। সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখে তাই পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে দিন-রাত সমান হয়। বিশুবীয় অঞ্চলে তখন সূর্য মাথার উপরে অবস্থান করে খাড়াভাবে কিরণ দেয়, তখন বিশুবীয় অঞ্চলে বেশ গরম পড়ে। বাংলাদেশে তখন দিন-রাত সমান বলে তখন শীতও নয় আবার খুব গরমও নয়। দক্ষিণ গোলার্ধেও তখন শীত চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল আসতে থাকে, অর্থাৎ সেখানে তখন বসন্ত।

২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধের একটি অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। আর তখন বাংলাদেশ সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই তখন বাংলাদেশে দিন ছেট হয় এবং রাত বড় হয়। সূর্যকে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে হেলে কিরণ দিতে। কম সময় এবং তির্যকভাবে কিরণ পায় বলে বাংলাদেশে তখন শীত পড়ে। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া তখন দিন বড় এবং রাত ছেট হয়। সূর্য তখন দক্ষিণ গোলার্ধে খাড়া ভাবে কিরণ দেয়। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।

আবার পৃথিবী ২১ মার্চ সূর্যের দিকে মুখ করে হেলে থাকে। তখন আবার পৃথিবীর সকল স্থানে দিনরাত সমান হয়। এজন্য এই সময়ে আমাদের দেশেও দিনরাত সমান হয়। এই সময়ে শীতও বেশি থাকে না আবার গরমও বেশি পড়ে না। এই সময়ে আমাদের দেশে বসন্ত কাল। ২১ মার্চের পরে পৃথিবী আবার

ঘূরতে ঘূরতে ২১ জুন ভারিখে আগের বছরের অক্ষণানে কিমে আসে। এভাবে সূর্যের সিকে পৃথিবীর অবস্থানের ভাস্তুময়ের কারণে দিনরাত ছোট বা বড় হয় এবং এর ফলস্বরূপ খন্দ পরিবর্তিত হয়।



চিত্র: ১২.৭: সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণন

পৃথিবী যদি সূর্যের চারপিকে না ঘূরতো তাহলে কী হতো তো? পৃথিবী সূর্যের চারপিকে না ঘূরলে পৃথিবীর কোন একটি আয়োজ সবসময় একটি খন্দই থাকতো। সেক্ষেত্রে বালাদেশে সারা বছর হয়তো সর্বম থাকতো। কোনো শীত আসতো না। উচ্চটাচাও হতে পারত। অর্থাৎ সবসময় শীত থাকতো। বালাদেশে বিশিষ্ট খন্দ আছে বলে বিশিষ্ট ফসল কলে। একটি খন্দ থাকলে এক রকম ফসলই হতো। আমাদের জীবন ধারণ কর্তৃকর হয়ে দেত।

রাশিয়া বা অন্যান্য শীতপ্রায় দেশে খন্দ পরিবর্তন না হলে মানুষ বিচত্তেই পারতো না। সেখানে বছরের বেশির ভাগ সময় ব্রহ্ম চাকু থাকে। সেসময় কসল কলে না। অর্থ সময় শীতকাল এলে ব্রহ্ম গলে বায়। মানুষ তখন ফসল ফলায়। শীতকাল না এলে মানুষ ফসল ফলাতে পারতো না।

#### এ অধ্যায়ে আমরা বা শিখলাম

- পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।
- সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনান সকল জ্যোতিঃক ও কৌক জাগুণা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জাগুগাই হৈকা।
- সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মতো ছুলত একটি গ্যাসপিল। এই ছুলত গ্যাসপিলে রয়েছে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু পরম্পরার সাথে সম্মত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিপন্থ হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন হয়ে সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সূর্যের কাছ থেকে আমরা তাপ ও আলো পেয়ে থাকি।
- এইসূত্রে কেন্দ্র করে ঘূরে ঘূরে ছোট ছোট উপরাহ। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপরাহ চৌম। উপরাহগুলো আকাশে প্রবেশ করে থেকে ছোট হয়। এরা নিজেরা তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। এগুলো সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো চৌমের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয় বলে আমরা চৌমকে আলোকিত দেখি।

- আমাদের সৌরজগতে সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য জ্যোতিষক। এরা হলো, ধূমকেতু, উষ্ণা ও গ্রাহণ। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা ঘূরছে।
- পৃথিবী থালা বা চাকতির মতো নয়। এটি গোলকাকার তবে পুরোপুরি গোলকাকার নয়। পৃথিবী কমলাগেবুর মতো উভর-দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থান করছি।
- পৃথিবীর দুই ধরনের ঘূর্ণন রয়েছে। একটি হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর আক্রিক গতি। দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ে একবার সূর্যের চারপাশে ঘূরে আসে। একে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলা হয়।
- পৃথিবীর আক্রিক গতির জন্য দিনরাত হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিন রাত ছোট বা বড় হয় এবং খতুর পরিবর্তন হয়।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর

- সূর্য মাঝারি আকারের একটি \_\_\_\_\_।
- সূর্যকে কেন্দ্র করে \_\_\_\_\_ গ্রহ ঘূরছে।
- চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র \_\_\_\_\_ উপগ্রহ।
- আমরা পৃথিবীর \_\_\_\_\_ অবস্থান করি।
- বলের প্রভাবে আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে যাই না।

#### সংক্ষেপে উভর দাও

- কেন আগে মানুষ মনে করত যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যোরে?
- কোন কোন বিজ্ঞানী পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের কথা বলেছেন?
- সূর্যসহ অন্যান্য নক্ষত্র কীভাবে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে চলেছে তা, ব্যাখ্যা কর।
- ধূমকেতু কী? এদের লেজ কীভাবে সৃষ্টি হয়? একটি পরিচিত ধূমকেতুর উদাহরণ দাও।
- একটি উপর্যুক্ত ব্যবহার করে পৃথিবীর দুই ধরনের গতি ব্যাখ্যা কর।
- দিন-রাত কীভাবে হয় তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।
- মানুষের জীবনে খতু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা কর।

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. কোন গ্রহটি বরফ ও গ্যাস দ্বারা গঠিত?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. বৃহস্পতি | খ. মঙ্গল   |
| গ. শনি      | ঘ. ইউরেনাস |

২. সূর্যের ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রযোজ্য তা হলো, এটি-

- i. একটি নক্ষত্র
- ii. একটি জলন্ত গ্যাস পিণ্ড
- iii. সকল গ্রহ ও নক্ষত্রকে আলো দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. ii          |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের সারণী থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব (কোটি কি.মি.)	সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়
শুক্র	১০.৮০	২২৫ দিন
পৃথিবী	১৪.৯৬	৩৬৫ দিন
বৃহস্পতি	৭৭.৮৫	প্রায় ১২ বছর
শনি	১৪২.৭০	২৯ $\frac{1}{2}$ বছর
ইউরেনাস	১৮৭.১	-
নেপচুন	৪৪৯.৮	১৬৫ বছর

৩. সারণিতে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু সূর্য থেকে প্রায় ২২.৮ কোটি কি.মি. দূরে অবস্থিত গ্রহটির অবস্থান কোথায়?

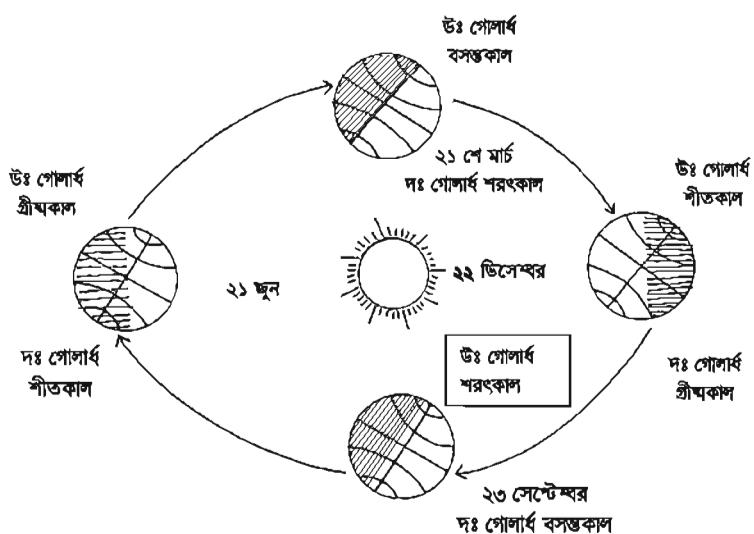
- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ক. পৃথিবী এবং শুক্রের মধ্যখানে | খ. বৃহস্পতি এবং শনির মধ্যখানে  |
| গ. শনি এবং নেপচুনের মধ্যখানে   | ঘ. পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যখানে |

৪. ইউরেনাসের সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় কতো বছর সময় লাগবে-

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. ১০ বছর | খ. ২৯ বছর  |
| গ. ৮০ বছর | ঘ. ১৭০ দিন |

### সূজনশীল প্রশ্ন

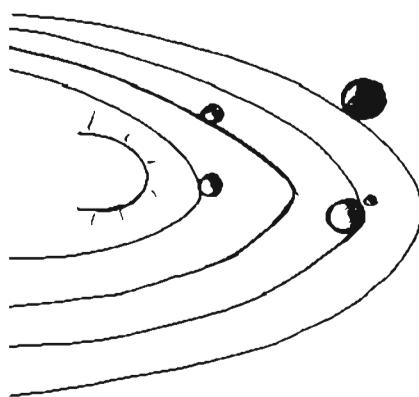
১.



ক. আক্ষিক গতি কী?

- খ. জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইতের মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙাদেশে প্রচুর বৃষ্টিশীত হয় কেন?
- গ. দক্ষিণ পোলার্থে সবচেয়ে ছোট রাত ও সবচেয়ে বড় দিন কখন হয় চিন্তা, থেকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উত্তর পোলার্থে ৩০ পে ডিসেম্বর দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য ক্ষেমন হবে – যুক্তিসহ উপর্যুক্ত কর।

২.



ক. চাঁদ কতদিনে পৃথিবীকে একবার অদক্ষিণ করে?

- খ. পুটোকে এখন আর সৌরজগতের সদস্য ধরা হয় না কেন?
- গ. রাতের বেলায় ৩ এবং ৪ নম্বর শহরের মধ্যে কোনটি অস্থকারচ্ছন্ন থাকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ভূতীয় শহরের সাথে অনেক মিল থাকা সহজেও ৪ৰ্থ শহরটি জীবজগতের বসবাসের উপযোগী নয় – যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

## অন্তর্বিদ্যা অধ্যায়

# প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দূষণ

আমাদের চারপাশের সব জড় ও জীবকে নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। তোমরা জান বিভিন্ন জড় ও জীবের মধ্যে রয়েছে সম্পর্ক। আবার জীব ও পরিবেশের মধ্যেও রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, যার ফলে আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে বিচি সব কর্মকাণ্ড। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে, যার জন্য পরিবেশে সে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালায়। যেকোনো একটি পরিবেশে মানুষ যখন এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালায়, তখন সেখানকার উপাদানসমূহের উপর বিভিন্ন প্রভাব পড়ে।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পরিবেশ দূষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহের দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানের উপর দূষণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হব।
- পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রভাব পোস্টারে উপস্থাপন করতে পারব।

### ପାଠ - ୧: ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ

ଅନ୍ୟତାର ଅନୁଭବର ସାଥେ ଆମାଦେଇ ଚାରିପାଶେର ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଜେ । ମାନୁସ ତାର ପ୍ରାଣୀଜଳ ଯୋଟିଲେଇ ଜନ୍ୟ ଆକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବିଭିନ୍ନଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଇଛେ । ଆକୃତିକ ଅବରୀ ମାନୁସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଳ ଏହି ଉତ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ପରିବେଶର ଭାବନାମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ । ଫଳେ ମାନୁସ ଓ ଉତ୍ତିଦିସନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ କରିବାକୁ ଅନୁଭବ ହେବ । ଏକମାତ୍ର ଅବରୀକୁ ଆମରା ସବୁ ପରିବେଶର ମୂଲ୍ୟ ।



ଚିତ୍ର-୧୦୧: ମୂଲ୍ୟ ପରିବେଶ

**କାହିଁ:** ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଆମା

**ଅନ୍ୟତାର ଉତ୍ତରକାଳୀନ:** ନୋଟ ଖାତା ଓ କଲ୍ୟ ।

**ପରିବେଶ:** ତୋରାର ଧାଳାକା ଓ ସମ୍ବେଦନ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର । ପରିବେଶେ କୋମୋ ଥିକାର ମୂଲ୍ୟ ଘଟେଇ କିମ୍ବା ତା ଲକ୍ଷ କର ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର । ସେ ସକଳ ମୂଲ୍ୟ ହୁଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇ, ତେ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରେସିଡେ ଆଲୋଚନା କର ।

ଦ୍ୱାରାତିକ୍ଷୟ ଜୀବ ଥେବେ ଶୁଭୁ କରେ ସକଳ ଥିକାର ଜୀବ ଓ ମାନୁସଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧିବିର ଏହି ପରିବେଶେ । ପରିବେଶେର କୋମୋ ଅଣ୍ଟାଇ ଆଜି ମୂଲ୍ୟମୂଳ୍ୟ ନର । ମାନୁସ ଶୁଭୁ ତାର ନିଜେର ପରିବେଶକେଇ ଦୂର୍ବିତ କରାଇ ନା, ସକଳ ଜୀବ ଓ ତାର ପରିବେଶଓ ଏହି ଦୂର୍ବଳେ ଫଳେ କରିବାକୁ ହେବ । ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟରେ ଫଳେ ମାନୁସଙ୍କ ସକଳ ଉତ୍ତିଦିନ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଧାରଣେ ବିନ୍ଦୁ ଘଟେଇ । ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଘଟେଇ ? କିମ୍ବା କରିବାକାରକ ଉପାଦାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପାରାକ୍ରମାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେର ଫଳେ ଆମାଦେଇ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ କରାଇ, ଯାକେ ଆମରା ମୂଲ୍ୟ (Pollutant) ବାଦି । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାପ ବିଦ୍ୟୁତକେନ୍ଦ୍ରର ଚିମନି ଏବଂ ବାଲବାହନ ଥେବେ ନିର୍ମିତ ବୌଯା, ଅଧିତେ ବ୍ୟବହାର କ୍ରିଟାନ୍ତିକ, ଝାସାରାନିକ ସାର, ବିଭିନ୍ନ ଆବର୍ଜନା, ପଲିସିନ, ପ୍ରାଣୀକ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ମୂଲ୍ୟକେର ଉପାଦାନ । ଏ ସକଳ ମୂଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନଭାବେ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକେ ଦୂର୍ବିତ କରାଇ ।

## পাঠ - ২ : পরিবেশের উপাদানসমূহের দৃষ্টিকোণ

পরিবেশ প্রধানত দুটো উপাদান নিয়ে গঠিত। জীব এবং জড় উপাদান। তোমরা জান সকল উদ্ধিদ ও প্রাণী নিয়ে পরিবেশের জীব উপাদান গঠিত আবার জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে মাটি, পানি, বায়ুসহ পৃথিবীর অন্যান্য সকল জড়বস্তু। দৃষ্টিকোণে ফলে পরিবেশের সকল জীব ও জড় উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার ফলে মানুষসহ সকল জীব পরিবেশে হুমকির সম্মুখীন হয়। এখন প্রশ্ন হলো, পরিবেশ দৃষ্টিত হওয়ার কারণ কী?

**কাজ:** পরিবেশের উপাদানসমূহের দৃষ্টি সম্পর্কে জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** নোট খাতা, পোস্টার কাগজ ও মার্কার।

**পদ্ধতি:** শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পূর্ববর্তী পাঠে তোমরা যে সকল দৃষ্টি সন্তুষ্ট করেছ, সেগুলোর কারণ কী, তা দলে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবেশের এ সকল উপাদান দৃষ্টিত হওয়ার উৎসসমূহ খুঁজে বের কর। দৃষ্টিকোণের কারণ এবং উৎসসমূহ পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর। প্রত্যেক দলের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখ এবং শ্রেণি আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে বাড়তি মানুষের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন ইত্যাদি। চামের জমি বাড়াতে ও বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ বনজঙ্গল কেটে ফেলছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এরোসোল ও রেফ্রিজারেটর থেকে নির্গত CFC (ক্লোরোফ্লোরো কার্বন) ওজেন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। বাড়তি মানুষের জন্য খাদ্য ও বাসস্থান ছাড়াও প্রয়োজন নানা রকম পণ্যসমগ্রী। ফলে তারা গড়ে তুলছে বিভিন্ন শিল্পকারখানা। এসব শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য দৃষ্টিত করছে পরিবেশ। এভাবেই পৃথিবীর পরিবেশ দৃষ্টিত হচ্ছে। পরবর্তী পাঠগুলোতে তোমরা পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান মাটি, পানি ও বায়ু দৃষ্টি সম্পর্কে জানবে।

## পাঠ-৩, ৪ : মাটি দৃষ্টি

আমাদের জীবন ধারণের জন্য মাটি অত্যাবশ্যিক। মাটিতে বিভিন্ন ফসল ফলে, যা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। শুধু খাদ্যই নয়, জীবন ধারণের সবকিছুই যেমন— বাসস্থান, বস্ত্র, উষ্ণ ইত্যাদির জন্য আমরা যে উদ্ধিদের উপর নির্ভরশীল তাও মাটিতে জন্মায়। এ মাটিকেও আমরা বিভিন্নভাবে দৃষ্টিত করছি, যার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে।

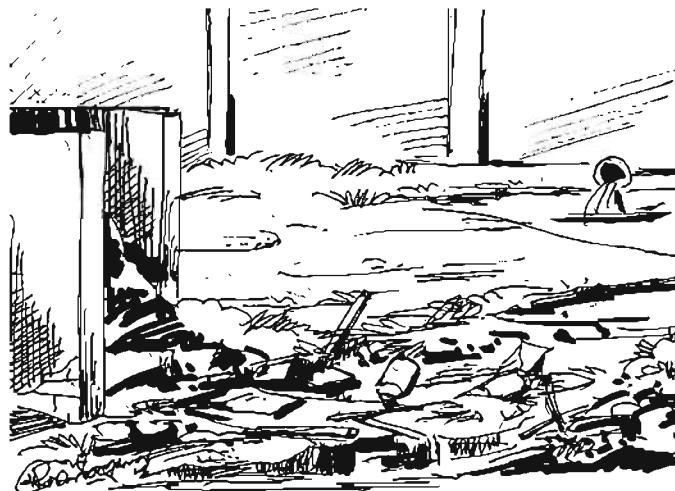
**কাজ :** মাটি দৃষ্টি ও মাটি দৃষ্টিকোণের উৎস সম্পর্কে জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** নোট খাতা, পোস্টার কাগজ ও মার্কার।

**পদ্ধতি:** তোমার এলাকার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন কর। এসব স্থানে কীভাবে মাটি দৃষ্টিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ কর। মাটি দৃষ্টিকোণে উৎসগুলো কী কী তা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখ। তোমার এলাকার মাটি দৃষ্টি রোধে সবাইকে সচেতন করতে হলে কী কী করা দরকার তা পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর এবং আলোচনায় অংশ নাও।

### মাটি দূষণের কারণ ও উভয়

মাটিতে আমরা যে সকল আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ ফেলি, এগুলোকে পচতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে। যার ফলে এগুলো মাটির সঙ্গে সহজে মিশে যায়। এছাড়াও আজকাল আমরা এমন সব দ্রব্যাদি ব্যবহার করছি যেগুলো মাটিতে পচে না। যেমন কাঁচ, পলিথিন, প্রাণিক ইত্যাদি। যা উত্তিসেব স্বাভাবিক বৃক্ষিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এসব জিনিশ ছাড়াও মাটিকে আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করছি। এসবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আবর্জনাসহ কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার, শিলকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি।



চিত্র- ১৩.২ : মাটি দূষণ

### পাঠ - ৫, ৬ : পানি দূষণ

বর্তমানে পৃথিবীতে সুপ্রয়োগ পানির অভাব দেখা দিয়েছে। পানি ছাড়া জীবন চলে না। পানি দূষণ আমাদের জন্য একটি বড় চিন্তার বিষয়। পানি নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। মানুষই পানি দূষণের জন্য দায়ী। এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই এটা এখন অত্যন্ত প্রকট।

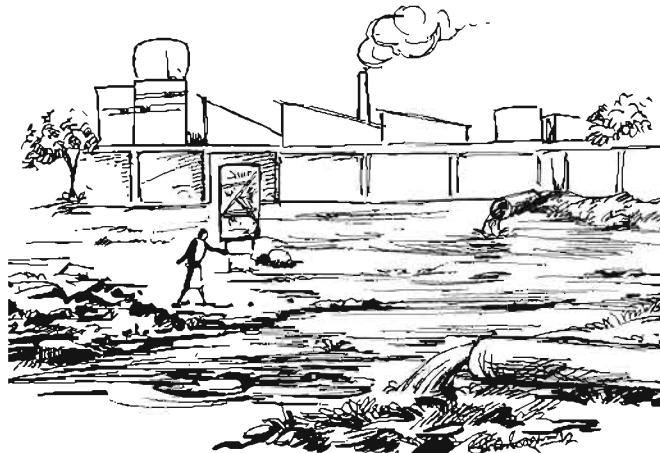
**কাজ :** পানি দূষণ এবং পানি দূষণের কারণ এবং উভয় সম্পর্কে জানা।

**পর্যবেক্ষণ :** তোমার এলাকায় বা এলাকার নিকটে বা গ্রামের বাড়িতে যদি কোনো জলাশয়, পুকুর বা নদী থাকে তা পরিদর্শন কর। সক্ষ করে দেখ এখানকার পানি কীভাবে দূষিত হচ্ছে। যদি তোমার এলাকা বা গ্রামের বাড়িতে এ ধরনের জলাশয় বা পুকুর অথবা নদী কিছুই না থাকে, তবে সহপাঠিদের সাথে আলোচনা করে জেনে নাও কীভাবে তাদের এলাকার পানি দূষিত হয়, নেট খাতায় লিখে রাখ। পানি দূষণের উভয় কারণ জেনে শ্রেণিতে আলোচনায় অংশ নাও।

### পানি দূষণের কারণ এবং উভয়

বিভিন্নভাবে পানি দূষিত হতে পারে। এ কারণগুলোর মধ্যে মানুষের কর্মকাণ্ডই পানি দূষণের অন্যতম কারণ। নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পর্যটনিকাশন ও শিল্প বর্জ্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমিতে ও জলাশয়ে বিভিন্ন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলোও বিভিন্ন ভাবে জলাশয় থেকে নদী এবং নদী থেকে সাগরে পড়ছে। এছাড়া এগুলো মাটির নিচের পানির সঙ্গে মিশেও পানিকে দূষিত করছে। তোমরা শক্ত করে থাকবে অনেকে পুরুরের পানিতে বাঁশ, বেত, পাট ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখে। গরু, মহিষ, ছাগল গোসল করায়। অনেকে বিভিন্ন জলাশয়ের উপর কাচা পাইখানা তৈরি করে, যা পানিকে দূষিত করে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণেও পানি দূষিত হয়ে থাকে। যেমন— তোমরা বন্যার কথা শুনেছ। বন্যার ফলে মানুষ ও গৃহপালিত পশু পাখির মসুমুত্ত পানিতে মিশে এবং পানি দূষিত হয়। খাদ্যের উচ্চিষ্ট, যফলা আবর্জনা, জীব-জন্মের মৃতদেহ, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য নানাধরণের পচনশীল বস্তু যেখানে সেখানে ফেলা হয়। এগুলো পচে বিভিন্ন জীবাণুর সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য বৃষ্টির পানির সাথে পুরু, নদী ও জলাশয়ের পানিতে গিয়ে মিশে।



চিত্র-১৩.৩ : পানি দূষণ

### পাঠ -৭, ৮ : বায়ু দূষণ

আমাদের পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুর মধ্যেই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈঁচে আছে। মানুষের সৃষ্টি বিভিন্ন কারণে বায়ুর কোনো কোনো উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে বা কমে যাচ্ছে, যা পরিবেশ ও আমাদের জন্য ক্ষতিকর। বায়ুর এ ধরনের পরিবর্তন বায়ু দূষণ নামে পরিচিত। আজ পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডল বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে।

**কাজ:** বায়ু দূষণ এবং এর উৎস সম্পর্কে জানা।

**গুরুত্ব:** তোমার এলাকার বায়ুদূষণের উৎস ও কারণগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এগুলোর মধ্যে মানুষ সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক কারণ গুলো পৃথকভাবে পোস্টার কাগজে লিখ। এটি শ্রেণিতে প্রদর্শন কর এবং আলোচনা কর।

### বায়ু দূষণের কারণ এবং উৎস

মানুষের ঘরানা এবং প্রাকৃতিকভাবে বায়ু দূষিত হতে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বায়ু দূষণের জন্য কতগুলো কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যানবাহন ও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোয়া। এছাড়াও আমাদের দেশে ইটের ভাটায় যখন ইট তৈরি করা হয়, তখন সেখান থেকে কালো ধোয়ার সৃষ্টি হয়, যা বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের আরও কারণের মধ্যে রয়েছে তৃটিপূর্ণ মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, বাস, টেক্সো ইত্যাদির ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা ধোয়া। এসকল ধোয়ার সাথে নির্গত হয় কার্বন মনোজ্ঞাইড, কার্বন কণা এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড। এগুলো পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বায়ু দূষণের জন্য শুধু যে যানবাহন ও শিল্পকারখানাই দায়ী তা কিন্তু নয়। সিগারেটের ধোয়া, এসবেটেস, নিমার্ণ কাজের ধূলিকণা, বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা ইত্যাদিও বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের আরও একটি অন্যতম কারণ হলো নির্বিচারে বন-জঙ্গল কেটে ফেলা। এর ফলে বায়ুতে উষ্ণিদ কর্তৃক গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যায়।



চিত্র- ১৩.৪ : বায়ু দূষণ

### পাঠ - ৯ : দূষণের প্রভাব

তোমরা মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ কীভাবে ঘটে তা জেনেছ। তোমরা কী জান এসব দূষণের ফলে পরিবেশের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ে?

**কাজ :** বিভিন্ন দূষণের প্রভাব সম্পর্কে জানা।

**গুরুত্ব :** শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। দলগুলো তোমাদের বিদ্যালয় এবং এলাকার আশেপাশের পরিবেশ পরিদর্শন করবে। দেখ এলাকার পরিবেশে কোন কোন ধরনের দূষণ ঘটছে। এসব দূষণের ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীবের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ছে তা দলে আলোচনা করে নেট খাতায় লিখ। শ্রেণিতে দল থেকে সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন কর এবং শ্রেণিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

### **মাটি দূষণের প্রভাব**

তোমরা জেনেছ, মাটি দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে মাটিতে বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। মাটি দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন কঠিন ও রাসায়নিক বর্জ্য। এসব বর্জ্য যেখানে-সেখানে ফেলার কারণে পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মাটিতে ফেলে দেওয়া কাচ, অ্যালুমিনিয়াম, পলিথিন ইত্যাদি মাটিতে সহজে মেশে না। ফলে মাটি তার উর্বরতা হারায়। তোমরা জেনে আবাক হবে অ্যালুমিনিয়াম মাটির সাথে মিশতে সময় লাগে একশ বছর। কাচের লাগে দুশ বছর এবং পলিথিনের লাগে প্রায় সাড়ে চারশ' বছর। তাই এগুলো আমাদের নর্দমা, জলাশয়কে ভরাট করে এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এগুলো পুরুর, নদী, সাগর এসব স্থানেও স্থানান্তরিত হয়। ফলে এসব পরিবেশে জীবের বেঁচে থাকা হুমকির সম্মুখীন হয়। কৃষি জমিতে যে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তা যেমন মাটির সকল জীবের জন্য ক্ষতিকর তেমনি এসব রাসায়নিক দ্রব্য উক্তিদের মাধ্যমে খাদ্যের সাথে মিশে ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগের সৃষ্টি করছে।

### **পানি দূষণের প্রভাব**

আমরা বিভিন্নভাবে পানি দূষিত করছি তা তোমরা জেনেছো। এ দূষিত পানি পান করলে আমাশয়, ডায়ারিয়া, কলেরা, জিভিস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হয়। পানি দূষিত হলে সে পানিতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীও বাঁচতে পারে না। ফলে পানির পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

### **বায়ু দূষণের প্রভাব**

তোমরা জেনেছ, বিভিন্নভাবে বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষিত হলে সে বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বায়ুতে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে মানুষের শ্বাসকষ্টজনিত রোগ থেকে শুরু করে ক্যান্সার এর মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। এছাড়াও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুতে মিশে গিয়ে এসিড বৃষ্টির সৃষ্টি হতে পারে। এই এসিড বৃষ্টি শুধু মানুষের ক্ষতিই করে না, জলজ প্রাণীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে বনভূমিও ধ্বংস হয়।

এসব ছাড়াও বায়ু দূষণের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি অব্যাহত থাকে, তবে সমুদ্রপঞ্চের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী নিচু স্থলভূমি পানিতে ডুবে যাবে। আবার কোনো কোনো অঞ্চল খরার কবলে পড়বে। ফলে স্থানীয় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটবে। এতে শুধু মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, অসংখ্য উক্তিদ ও প্রাণী পৃথিবী থেকে লুক্ষ হয়ে যাবে। পরিনতিতে সার্বিক ভাবে পৃথিবী বুকির মুখে পড়বে।

### **পাঠ - ১০ : দূষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ**

বিভিন্নভাবে পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ু দূষন এর কারণ আমরা জানলাম। মাটি, পানি ও বায়ু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মানুষের কারণেই বর্তমানে এ পরিবেশ ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক না রাখতে পারলে পৃথিবীর সকল জীবের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার একমাত্র উপায় হলো পরিবেশ সম্রক্ষে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দূষণ প্রতিরোধ।

**কাজ :** দূষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে জানা।

**পদ্ধতি :** শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পরিবেশ দূষণ থেকে নিজে ও সকলকে বিরত রাখতে কী কী করা যায়, তা দলে আলোচনা করে নেট খাতায় লিখ। পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে স্লোগান তৈরি কর। স্কুলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর।

মাটি, পানি, বায়ু ছাড়া পরিবেশে জীবের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। আমাদের সকলের উচিত পরিবেশের এ উপাদানগুলোকে দূষণমুক্ত ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। বর্তমানে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে পরিবেশের এসকল উপাদানের ব্যবহার অনেক বেশি হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে পরিবেশের দূষণ ঘটছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে ও সংরক্ষণ করতে হলে আমাদের সবাইকে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

- সুস্থ পরিবেশের জন্য মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ যাতে না ঘটে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- বাড়িঘর, স্কুল ও রাস্তার পাশে গাছপালা লাগাতে হবে।
- খোলা জায়গায় যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে।
- শিল্পকারখানা থেকে ধোঁয়া বের হয়ে যেন দূষণ না ঘটে, সেজন্য ধোঁয়া বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে একে দূষণমুক্ত করতে হবে।
- প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এসবের পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কীটনাশক, রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে। এগুলোর পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা মাকড় দমন করতে হবে।
- ঘর-বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ও খাদ্যদ্রব্যের উচ্চিষ্ট যেখানে-সেখানে না ফেলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মাটির গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিতে হবে।
- জনগণকে দূষণের ক্ষতিকারক দিক এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- বন সংরক্ষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এগুলো বিভিন্ন জীবের আবাসস্থল। এছাড়া গাছপালা আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

#### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যখন কোনো পরিবর্তন ঘটে তখন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীবের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।
- প্রাকৃতিক এবং মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড উভয় কারণেই পরিবেশ দূষণ ঘটে। তবে বিভিন্ন দূষণের জন্য মানুষই প্রধানত দায়ী।
- পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের ফলে শুধু মানুষই বিপন্ন হবে না, অসংখ্য উঙ্গিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।
- দূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হলো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম উপায়।

### অনুশীলনী

#### **শূন্যস্থান পূরণ কর**

১. চামের জমি বাড়াতে ও বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ \_\_\_\_\_ কেটে ফেলছে।
২. শিল্পকারখানার \_\_\_\_\_ পানি দূষণের জন্য দায়ী।
৩. বিভিন্ন আবর্জনাকে পচতে সাহায্য করে \_\_\_\_\_।

#### **সঠকিষ্ঠ প্রশ্ন**

১. দূষণ কীভাবে ঘটে তার একটি উদাহরণ দাও।
২. দূষণ রোধ সম্পর্কে তোমার এলাকার সবাইকে সচেতন করতে হলে তুমি কী কী করতে পার?
৩. তোমার বাড়ির পরিবেশ সংরক্ষণে তোমার করণীয় কী?
৪. তোমার বিদ্যালয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে তুমি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পার?
৫. পানি দূষণের দুটো প্রভাব উল্লেখ কর।
৬. বায়ু দূষণ কেন মানুষের জন্য ক্ষতিকর?

#### **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. কোনটি থেকে শহরের বাসাবাড়িতে পানি সরবরাহ করা হয়?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. নলকূপ | খ. পুকুর |
| গ. নদী   | ঘ. বিল   |

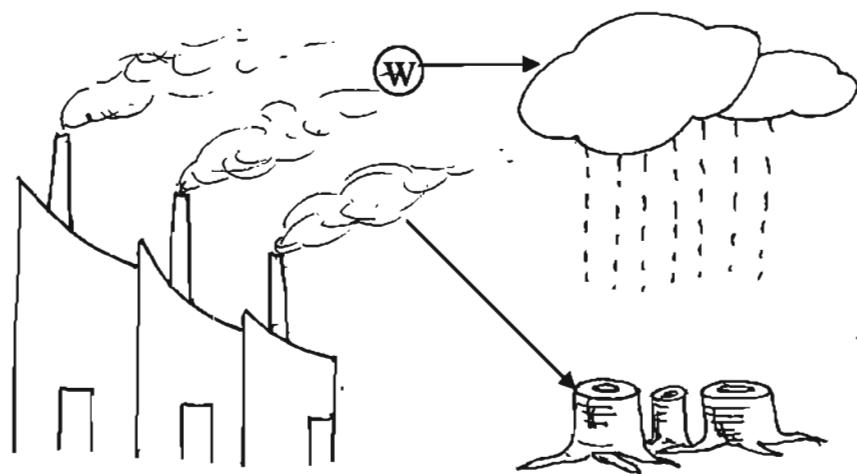
২. মাটি দূষণের কারণ হলো—

- i. পলিথিন ও কৌটনাশক
- ii. আবর্জনা ও মৃতজীবদেহ
- iii. রাসায়নিক সার ও কাঁচ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

দৃশ্যটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও:



চিত্র : কারখানার রোয়া ও বৃক্ষ নিখন

৩. দৃশ্যকল্পের W চিহ্নিত অংশে অনুস্থিত কোনটি?

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড   | খ. অক্সিজেন          |
| গ. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন | ঘ. কার্বন মনোঅক্সাইড |

৪. চিত্রে প্রদর্শিত ঘটনাটি পৃথিবীতে সংঘটিত হলে-

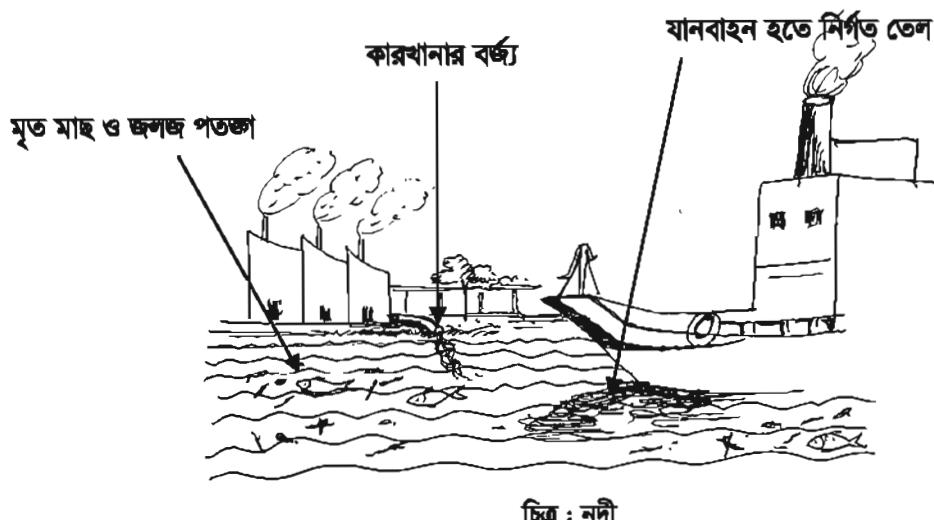
- i. উজোন স্তর নষ্ট হবে
- ii. অপ্লবৃষ্টির সম্ভাবনা বাঢ়বে
- iii. প্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## সূজনশীল প্রশ্ন

১.



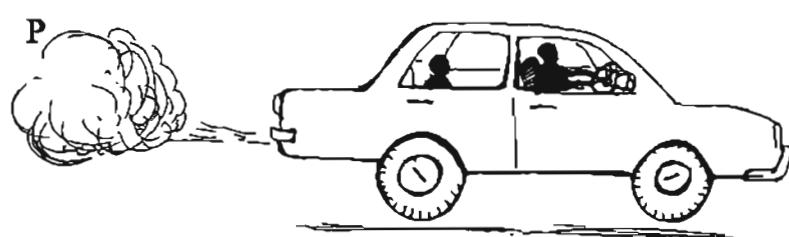
ক. এসিড বৃক্ষি কী?

খ. প্লাস্টিক মাটির জন্য ক্ষতিকর কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের প্রণালীগুলো কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উদ্দীপকের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে?

২.



চিত্র : গাড়ি

ক. দূষণ কী?

খ. পানি দূষণ কেন ক্ষতিকর?

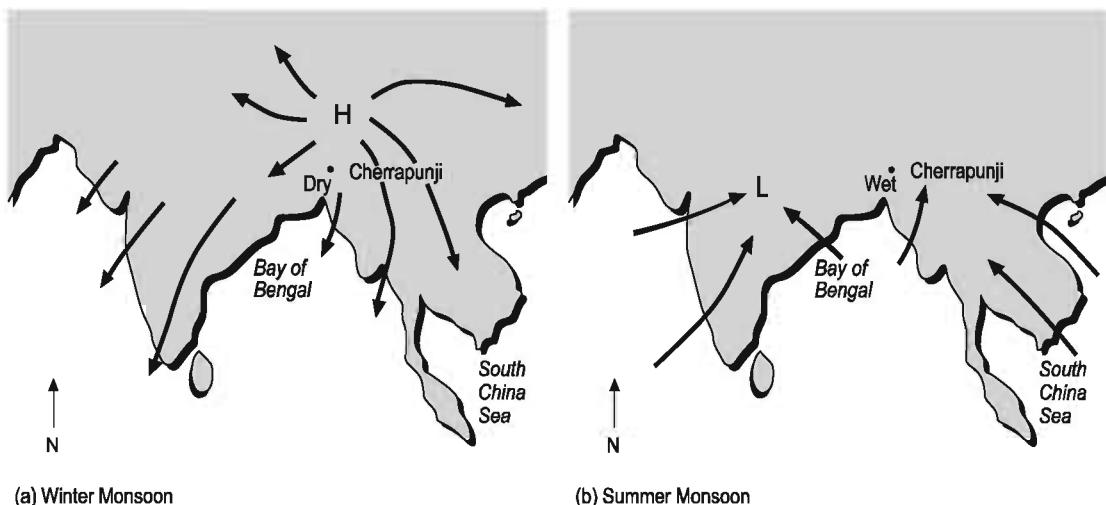
গ. পরিবেশের উপর 'P' কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের সৃষ্টি সমস্যা সমাধানে আমাদের কর্মীয় কী তা বৃক্ষিসহ বিশ্লেষণ কর।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# জলবায়ু পরিবর্তন

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্প সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্ধতা ইত্যাদি অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু। আবহাওয়া ও জলবায়ু আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক আবহাওয়া ও জলবায়ুতে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।



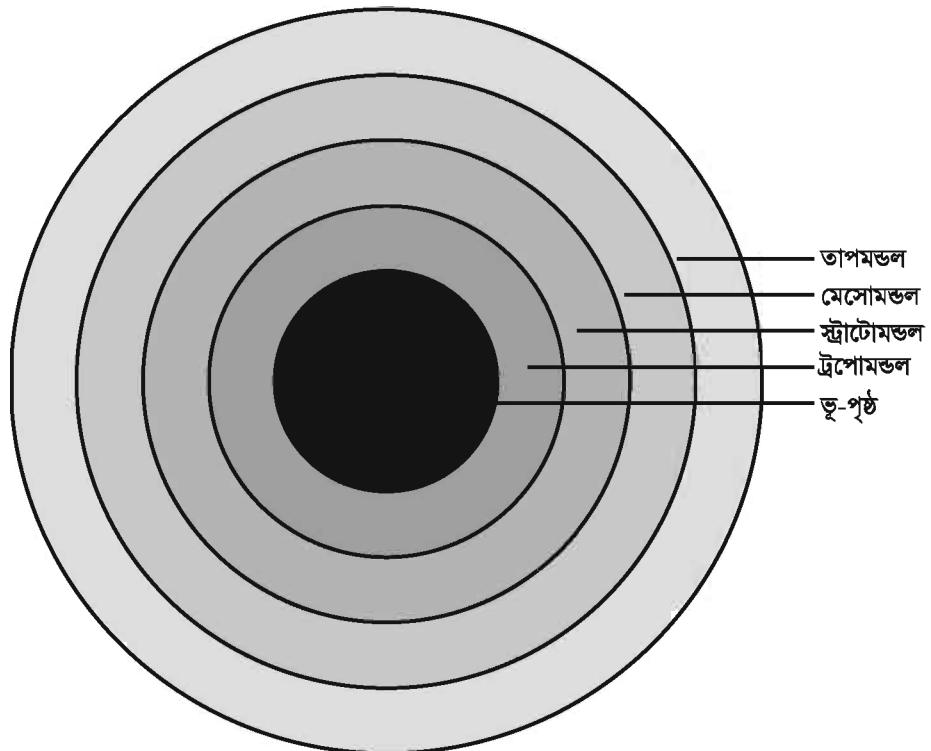
### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবেশে পানি চক্র, অক্সিজেন চক্র ও কার্বন চক্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবহাওয়া ও জলবায়ু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ ১ ও ২ : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছ, সূর্যের প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। এ সময় হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরি করে।

যে বায়বীয় অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জান যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও, তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে। বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি স্তর হলো ট্রিপোস্ফিয়ার বা ট্রিপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।



চিত্র- ১৪.১ : বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

**ট্রিপোম্বল:** ভূপৃষ্ঠ থেকে এগার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রিপোম্বল। এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে। যেমন এই স্তরে মেঘ, বৃক্ষ, বায়ু প্রবাহ, বড়, কুয়াশা এসব হয়। তাই ট্রিপোম্বল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

**স্ট্রাটোম্বল:** ট্রিপোম্বলের ঠিক উপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোম্বল। এই স্তর ট্রিপোম্বল থেকে শুরু করে প্রায় ৩৯ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাস খুব কম পরিমাণে আছে।

**মেসোম্বল:** স্ট্রাটোম্বল শেষ হয়ে এই স্তর শুরু। এই স্তরের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে।

**তাপম্বল:** এই স্তর প্রায় বায়ুশূন্য। এই স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে, তাই এর নাম তাপম্বল। এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

### পাঠ ৩: পরিবেশে পানি চক্র

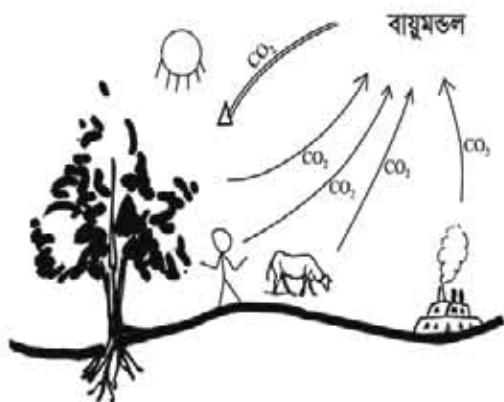
একাদশ অধ্যায়ে তোমরা পানি চক্রের সম্বন্ধে জেনেছ। পানি চক্র পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরো সমুদ্রসহ ভূপৃষ্ঠের পানি যদি বাষ্প না হয়ে ভূপৃষ্ঠেই থেকে যেত, তাহলে কী হতো? নিচয়ই বৃক্ষ হতো না! নদীতে পানি থাকতো না। আমরা কী তাহলে ফসল ফলাতে পারতাম? বৃক্ষের পানিও পেতাম না, নদীর পানি থেকে সেচ দিতে পারতাম না। বৃক্ষ না হলে ভূগর্ভেও পানি থাকতো না। আবার পর্বতের ছড়ায় বা মেরু অঞ্চলে বরফ জমা না থেকে গলে গেলে কী হতো। সমুদ্রে পানির পরিমাণ বেড়ে যেত। তাতে সমুদ্রের কাছাকাছি নিচু এলাকা যেমন বাহ্লাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে ডুবে যেত।

পানি চক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তোমরা লক্ষ করেছ যে, পানি চক্রের উপর সূর্যতাপের একটি বড় প্রভাব রয়েছে। কখনো পানি চক্রে ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন অতি বৃক্ষ হলে বৃক্ষের পানি দ্রুত সরে যেতে না পারলে বন্যা হয়। আমাদের দেশে বন্যা প্রায় প্রতিবছরই দেখা যায়। আবার পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানি চক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এসম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে জানব।

### পাঠ ৪: পরিবেশে কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

তোমরা আমো বে বায়ুমণ্ডলে অবিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য খুব পুরুষপূর্ণ। এ দুইটি গ্যাসই জীবনের জন্য অতি আবশ্যিক। বায়ুমণ্ডলে এ দুইটি গ্যাসের ভারসাম্য বোধার জন্য কার্বন চক্র বোৰা সহজকার।

সবল জীবনেই গঠনে কার্বন দরকার হয়। এ কার্বন আসে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে। গানি ও বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে উচ্চিদ সালোকসংরেণ প্রক্রিয়ার অক্সিজেন ও শুকোজ তৈরি করে। এই শুকোজ উচ্চিদেহে তৈরি করে। আপী উচ্চিদ থেকে খাদ্য প্রথম করার মাধ্যমে কার্বন প্রথম করে।



চিত্র-১৪.২: কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

উচ্চিদ ও আপিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রথমত, উচ্চিদ ও আপী শুসন প্রক্রিয়ার শুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপাদন করার সময় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন প্রথম করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, উচ্চিদ ও আপিদেহকে শোষণে ভাবে কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে যেতে। তৃতীয়ত, উচ্চিদ ও আপিদেহ মাটিতে পচবার সময় ব্যাকটেরিয়া ও হ্যাক কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে ছেড়ে দেয়।

ভাসলে দেখা গেল, বায়ুমণ্ডল থেকে উচ্চিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রথম করে শুকোজ তৈরির মাধ্যমে উচ্চিদ ও আপিদেহে কার্বন সংরক্ষ করে। উচ্চিদ ও আপিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে ফিরে আসে। এভাবে পরিবেশে কার্বনের অর্ধায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে এ ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এ সম্পর্কে এ অধ্যায়েই আমরা জানব।

### পাঠ ৫: আবহাওয়া ও জলবায়ু

আলামীকাল মুগ্ধের পর ঢাকার আশেপাশের এলাকায় উন্নত-পদ্ধতি সিক থেকে সমকা হাওয়া যেযে বেতে গাঁজে। দিনের বেশির ভাগ সময় আকাশ থাকবে যেখনুন্ত, ভবে বিকেন্দের দিকে উন্নত-পূর্ব কোণে কালো যেয অমতে গাঁজে। আজ ঢাকার বায়ুজ আপেক্ষিক আর্দ্ধতা হিল ৬০ শতাংশ। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হিল কুণ্ঠিয়ায় ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিল সিলেটে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তোমরা কি রেডিও বা টেলিভিশনে খবরের শেষে এরকম খবর শুনতে পাও? এটি কিসের খবর? আমরা কী জানতে পাই এ ধরনের খবর থেকে? আগামীকাল ঝড় বা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? আমরা কি জানতে পারি কাল কেমন গরম বা শীত থাকবে? হ্যাঁ, সাধারণত খবরের শেষ দিকে থাকে বৃষ্টি বা ঝড় হতে পারে কি না, তাপমাত্রা কেমন থাকবে। কোথায় কতটুকু বৃষ্টি হয়েছে বা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ছিল। এ সবই আবহাওয়ার খবর। আবহাওয়ার খবর থেকে কি বোঝা যায় আবহাওয়া কী?

### আবহাওয়া

আবহাওয়া বলতে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে বোঝায়। বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ, বায়ু কোন দিক থেকে কত জোরে বয়, বায়ুর আর্দ্রতা বা বায়ুতে জলীয়বাস্ফের পরিমাণ, মেঘ, কুয়াশা ও বৃষ্টিপাত-এই অবস্থাগুলো মিলে আবহাওয়া।

যেমন কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস - এ থেকে বোঝা যায় সেদিনের আবহাওয়া বেশ গরম ছিল। আবার কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস- এ থেকে বোঝা যাবে সেদিন বেশ ঠাণ্ডা ছিল। আবার আকাশ ছিল মেঘলা অথবা দিনটি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল- এরকম অবস্থাও স্বল্প সময়ের আবহাওয়া নির্দেশ করে।

### জলবায়ু

আমরা বলে থাকি আজ সকালে আবহাওয়া ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু দুপরে আবহাওয়া বেশ গরম। অল্প সময়ে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, জলবায়ু সহসা বদলায় না। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি সামগ্রিক বা গড় ফল। যেমন আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র-এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে এবং বায়ু ভেজা বা আর্দ্র থাকে। আবার রাশিয়ার জলবায়ু শীতপ্রধান; এ কথা বলতে আমরা বুঝি যে রাশিয়ায় সাধারণতঃ খুব শীত পড়ে।

### আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান মূলত একই। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা (জলীয়বাস্ফের আপেক্ষিক পরিমাণ), বৃষ্টিপাত এগুলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। উপাদানসমূহ একই হলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী? ইতোমধ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্কের কথা জেনেছ। জলবায়ু মূলত কোনো স্থানের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থা বা ফল। দেখা যাক আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী?

- ১। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থাই আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাই জলবায়ু।
- ২। কোনো স্থানের আবহাওয়া অন্ত সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হলে সেটা হতে অনেক বছর লেগে যায়।
- ৩। কাছাকাছি অঞ্চলের আবহাওয়া একই সময়ে ভিন্ন হতে পারে। যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিনে ফরিদপুরে বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু বরিশালে বৃষ্টি নাও হতে পারে। কিন্তু কাছাকাছি অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত একই রকম। যেমন, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু একই রকম।

### পাঠ-৬, ৭ : আবহাওয়ার পরিবর্তন

কোনো একদিন সকালে হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখলে যে বাইরে উজ্জ্বল রোদ, তবে ততটা গরম লাগছে না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরম বাড়তে লাগল, গাঁঁয়ে ঘাম হতে শুরু করল। আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমতে শুরু করলো এবং এক সময় কালো মেঘে সূর্যটি ঢেকে গেল। একটু পরে মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি শেষে আকাশ আবার পরিষ্কার হলো এবং গরমটা কমে এলো। একটু চিন্তা কর তো এক দিনেই আবহাওয়া কর্তটা পরিবর্তন হলো। আবহাওয়া পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কেন এভাবে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়?

আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা আসলে সূর্যতাপের। আমরা এখন দেখব সূর্যতাপ আবহাওয়ার উপাদানসমূহ পরিবর্তনে কীভাবে ভূমিকা রাখে।

**সূর্যতাপের উপর তাপমাত্রার নির্ভরতা :** সূর্য থেকে আগত আলোকরশির সাথে তাপও পৃথিবীতে এসে পৌছায়। সূর্যতাপ যখন পৃথিবীগঠে পড়ে তখন পৃথিবীগঠ উন্নত হয়। পৃথিবীগঠের সাথে মিশে থাকা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরও (ত্রিপোক্ষেয়ার) এতে উন্নত হয়। ফলে দিনের বেলায় সাধারণত আমরা বেশি গরম অনুভব করি। রাতে যখন সূর্য অস্ত যায়, তখনো পৃথিবীগঠ ও বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর গরম থাকে। কারণ দিনের বেলায় পৃথিবীগঠ যে তাপ পায় তা রাতের বেলায় সবচুকু চলে যেতে পারে না। পৃথিবীগঠ যে তাপ বিকিরণ করে তা বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাস্তু, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি সেই তাপ শোষণ করে ধরে রাখে। তাই রাতের বেলা আমরা গরম অনুভব করি। গ্রীষ্মকালে সূর্য আমাদের মাথার উপর থেকে খাড়াভাবে ও বেশি সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা বেশি গরম অনুভব করি। পক্ষান্তরে, শীতকালে সূর্য অনেকটা দূর থেকে তির্যকভাবে এবং কম সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা শীতকালে কম গরম অনুভব করি।

তাপমাত্রার উপর বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের নির্ভরতা : বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। আমরা যেমন দেখি পানির উচ্চতা যেখানে বেশি সেখান থেকে পানি কম উচ্চতার দিকে যায়। বায়ু উচ্চচাপের এলাকা থেকে নিম্নচাপের এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ুচাপের পরিবর্তন হয়।

কোনো জায়গার তাপমাত্রা বেশি হলে সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে ঐ স্থানে বায়ু পাতলা বা ফাঁকা হয়ে যায়। অর্থাৎ বায়ুচাপ কমে যায়। এরকম অবস্থাকে বলে নিম্নচাপ। তখন আশেপাশে যেখানে বায়ুচাপ বেশি, সেখান থেকে বায়ু এসে ফাঁকা স্থান পূরণ করে। এভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে তাপমাত্রা কম সেখানে বায়ু ঘন থাকে। ফলে বায়ুচাপ বেশি থাকে। বায়ুচাপ বেশি থাকাকে উচ্চচাপ বলা হয়।

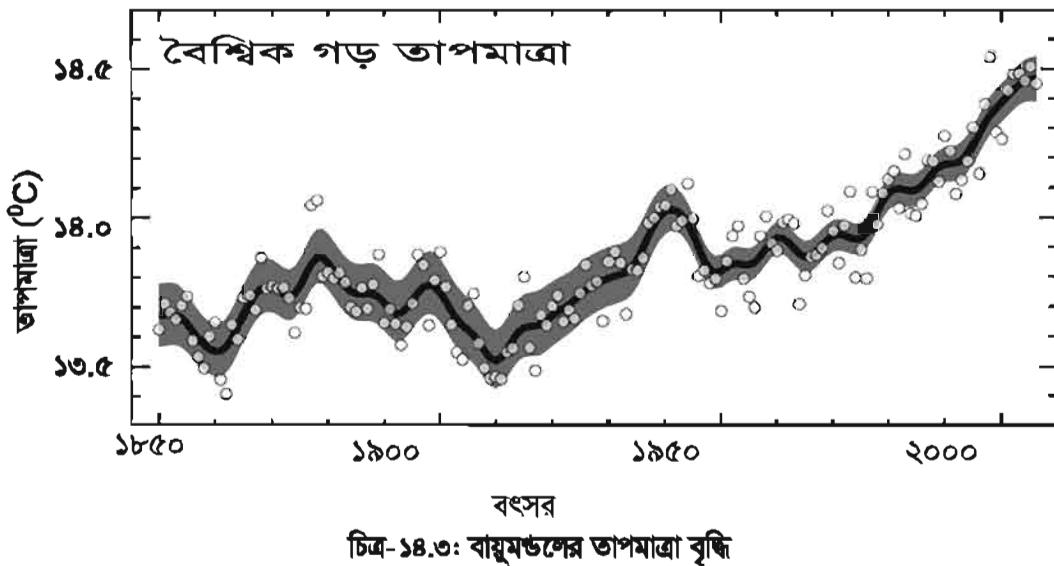
আমাদের দেশে আমরা দেখি, শীতকালে বায়ু উভর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উল্টোটা দেখি। কেন বায়ু একেক সময় একেক দিক থেকে প্রবাহিত হয়? শীতকালে সূর্য বাংলাদেশের দক্ষিণে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই সেখানে বায়ুচাপ কম থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের উভরে বেশ শীত এবং বায়ুচাপ বেশি। তাই শীতকালে বাংলাদেশের উভর দিক থেকে বায়ু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্থলভাগ থেকে আসে বলে এতে জলীয়বাস্প কম থাকে। এজন্য শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে এবং বৃক্ষ কম হয়।

আবার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই বাংলাদেশে তখন বেশ গরম এবং বায়ুচাপ কম থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তখন কম গরম, তাই বায়ুচাপ বেশি। সেই সময় বায়ু বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ দিক থেকে এই বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাস্প নিয়ে আসে। এই জলীয়বাস্প ঠাণ্ডা হয়ে বৃক্ষ হয়। এজন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ু আর্দ্র থাকে এবং প্রচুর বৃক্ষ হয়।

### পাঠ ৮, ৯, ১০ : জলবায়ুর পরিবর্তন

ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহুদিনের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তোমরা জান যে, বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে ও তেমন শীত পড়ে না। শীতকাল বেশ ছোট, সাধারণত পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত পড়ে। তারপর শীত কমে গিয়ে ধীরে ধীরে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ গরম পড়ে। এই দুই মাসকে আমরা গ্রীষ্মকাল বলি। বৈশাখ মাসে প্রতিবছরই কালবেশার্থী দেখা যায়। ও আষাঢ়ের শুরু থেকে বৃক্ষ শুরু হয় অর্থাৎ বর্ষাকাল শুরু হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেশ গরম ও বৃক্ষ পড়ে। তারপর আবার আবহাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং পৌষ মাসে শীত ফিরে আসে। এটাই বাংলাদেশের জলবায়ুর স্বাভাবিক রূপ। এরকম আবহাওয়া তোমার বাবা-মা যখন ছোট ছিলেন তখনও দেখা যেত। বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের সামগ্রিক আবহাওয়া অর্থাৎ জলবায়ু একই রকম।

কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাঢ়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming) বলে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্যটনের ছড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্রের পানি প্রসারিত হচ্ছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে ধাকলে পানির উচ্চতা বাড়তে ধাকবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্রাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরুদ্ধ আবহাওয়া ঘেমন থরা, অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘেস্থি বেশি বেশি ঘটতে দেখা যাবে।



### বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। এ অধ্যায়েই তোমরা জেনেছ যে, কার্বন ও অক্সিজেন চক্রাকারে ফিরে আসে বলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কলকারখানা ও যানবাহনে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো হচ্ছে। এসব জ্বালানি পোড়ানো থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনোভাবে ব্যয় বা শোষিত হচ্ছে না। বরং মানুষ বাড়ার ফলে এবং অন্যান্য কারণে গাছপালা করে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে কেন তাপমাত্রা বাঢ়ছে?

### কাজ : ইন হাউজ প্রভাৱ

প্ৰযোজনীয় উপকৰণ: দুটি সমান মাপের পানিৰ গ্লাস, মাপচোৰ, পানি, একটি পৰিষ্কাৰ স্বচ্ছ প্রাস্টিকেৰ ব্যাপ ও দুটি ধাৰ্মোথিটাৰ।

### গুৰুত্ব:

১. দুটি গ্লাসে মাপচোৰ দিয়ে মেঘে সমান পৱিমাণ পানি নাও।
২. ধাৰ্মোথিটাৰ একটি কোৱে ধাৰ্মোথিটাৰ রাখ। ধাৰ্মোথিটাৰে দেখ পানিৰ ভাগমাত্রা কৃত। কোমাদেৱ ধাৰ্মোথিটাৰে শিখে নাও।
৩. একটি গ্লাস প্রাস্টিকেৰ ব্যাপেৰ তিতৰ রেখে ব্যাপেৰ মূখটি আঢ়কে দাও।
৪. দুটি গ্লাস ধৰণৰ মোসে রেখে দাও। অনুমান কৰে তো কোমাদিৰ পানি বেশি পৱয় হবে? কোমাদেৱ উভয়েৰ পকে ঝুঞ্জি দাও।
৫. এক ষষ্ঠী পতে ধাৰ্মোথিটাৰে দেখ গ্লাস দুটিৰ ভাগমাত্রা কৃত। কোমাদিৰ ভাগমাত্রা বেশি বেড়েছে? কোমাদেৱ অনুমাদেৱ সাথে ফিলেছে কি? না মিলে তাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰ।

দেখা বাবে, যে গ্লাসটি প্রাস্টিকেৰ ব্যাপেৰ তিতৰ হিল তাৰ ভাগমাত্রা বেশি বেড়েছে। কেন তা কৰতে পাৰ? সুৰ্যৰ ভাগ দুটি গ্লাসেৰ পানিৰ উপৰ সমানভাৱে পড়ছে। যে গ্লাসটি প্রাস্টিকেৰ ব্যাপেৰ তিতৰে আছে সেটিকে ভাগ প্ৰবেশ কৰতে পাৱে। কিন্তু প্রাস্টিকেৰ ব্যাপ তেস কোৱে তিতৰেৰ ভাগ পুৰোপুৰি বেয় হতে পাৱে না। ফলে প্রাস্টিকেৰ ব্যাপেৰ তিতৰে পানি ভাড়াতাড়ি পৱয় হয় অৰ্ধাত ভাগমাত্রা হৃত বাঢ়ে।

শীতকুণ্ডাল মেলে ভীত্র শীতে গাছপালা চিকে ধোকতে পাৱে না। ভীত্র শীতে শাক-সবজি বৰানোৱ জন্য কাঠেৰ দৱ তৈৰী কৰা হয়, যাকে ইন হাউজ কৰা হয়। শীতকালে অজসৰ বখন ঝোদ থাকে, তখন ঝোদেৱ ভাগ কাচ তেস কোৱে ঘৰেৱ তিতৰে প্ৰবেশ কৰে এবং ঘৰেৱ বায়ু, পাহ ও মাটিকে উন্মুক্ত কৰে। ঘৰেৱ উন্মুক্ত স্বাভাৱিকভাৱে বিকিৰিত হয়ে বাইঠে চলে বেতে চায়। কিন্তু ভাগমাত্রা বেড়ে বাগৱাইৰ তা কাচ তেস কোৱে বাইঠে যেতে পাৱে না। ফলে কাঠেৰ দৱ রাতেৰ বেৰাইও পৱয় থাকে এবং তিতৰেৰ শাক-সবজি বেতে থাকে। কাঠেৰ দৱেৰ তিতৰে এভাৱে ভাগ থেকে বাগৱাইৰ বিবৃতিকে ইন হাউজ প্ৰভাৱ বলে।



চিত্র-১৪.৪ : ইন হাউজ

পৃথিবীটাকে একটি গ্রিনহাউজের মতো ধরা যায়। পৃথিবীর চারদিক থিবে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডলে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প যেগুলো গ্রিনহাউজের মতো কাজ করে। এরা সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোনো বাঁধা দেয় না, ফলে সূর্যের তাপে পৃথিবী উন্নত হয়। কিন্তু এরা উন্নত পৃথিবী থেকে তাপকে বিকিরিত হয়ে চলে যেতে বাঁধা দেয়। ফলে পৃথিবী রাতের বেলায়ও গরম থাকতে পারে। এসব গ্যাসকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলে রয়েছে— এটি মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ। কারণ এসব গ্যাস না থাকলে পৃথিবী থেকে তাপ বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত আর পৃথিবী ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত। এখন প্রশ্ন হলো আশীর্বাদ আবার কীভাবে সমস্যা হলো? সমস্যা হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকায় এরা বেশি বেশি তাপ ধরে রাখতে পারছে। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।

### জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে কী করণীয়?

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ জানলে তোমরা। উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিচের প্রবাহ চিত্রটি আঁকতে পারি।



উপরের প্রবাহ চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাহলে কীভাবে আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারি? সহজ উত্তর হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে। অথবা কোনভাবে এদেরকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া। মিথেন গ্যাসকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরানো যায় না। এর উৎপাদন বা নিঃসরণও বন্ধ করা কঠিন। কারণ এটি উৎপাদিত হয় কৃষিকাজ থেকে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় প্রধান সুপারিশ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ

কমানো। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো কমিয়ে তার বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন—সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ ইত্যাদি) ব্যবহার করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ কমে। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড কমানোর জন্য আরেকটি উপায়ের কথা বলা হয়। তা হলো বেশি করে গাছ লাগানো। কারণ গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে আসে।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বায়ুমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি স্তর হলো ট্রিপোস্ফিয়ার বা ট্রিপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।
- ভূপৃষ্ঠ থেকে এগার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রিপোস্ফিয়ার। এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে। যেমন এই স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা এসব হয়। তাই ট্রিপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
- স্ট্রাটোমণ্ডলে রয়েছে উজ্জোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।
- ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয়বাস্প, জলীয়বাস্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসেবে পানি আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টির পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সবশেষে সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির চক্রকারে ঘুরে আসাকে পানি চক্র বলে। পানি চক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।
- জীব বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বসনের কাজ চালায়। শ্বসন প্রক্রিয়া শেষে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। আবার উক্ষিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে খাদ্য তৈরী করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি গ্যাসই জীবনের জন্য অতি আবশ্যিক।
- কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্প সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা এ অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু।

- আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা আসলে সূর্যতাপের। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ু চাপের পরিবর্তন হয়।
- কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming) বলে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্বতের চূড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্রের পানি প্রসারিত হচ্ছে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরূপ আবহাওয়া যেমন খরা, অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা যাবে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাই কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণ কমানোই জলবায়ু পরিবর্তন রোধের মূল উপায়।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর

- ভূপৃষ্ঠ থেকে এগার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলে -----
- নামের একটি গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।
- কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার গড় ফলকে বলে -----।
- আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা হলো -----।
- তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্রের পানি -----হয়।

### সংক্ষেপে উত্তর দাও

- বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে অর্ধাং পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলে বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে কেন তা ব্যাখ্যা কর।
- ট্রিপোমণ্ডল কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
- চিত্রসহ পানিচক্র ব্যাখ্যা কর।
- কীভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে?
- চিনহাউজ প্রভাব কী? বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে কীভাবে এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়?

### কল্পনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাস্তুমণ্ডলের কোন স্তরটি প্রায় বাস্তু শূন্য?

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ক. ট্রিপোমণ্ডল | খ. স্ট্রাটোমণ্ডল |
| গ. মেসোমণ্ডল   | ঘ. তাপমণ্ডল      |

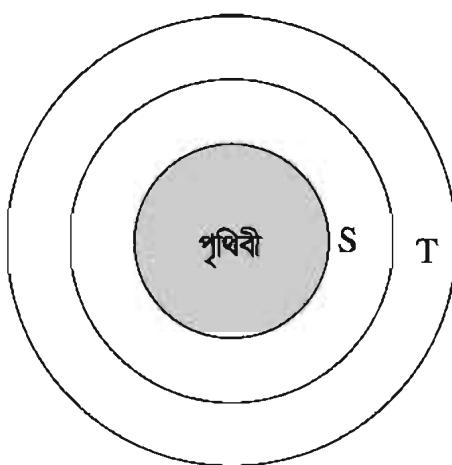
২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে—

- i. একই দেশের বিভিন্ন স্থানে একই দিনে আবহাওয়া ভিন্ন হতে পারে
- ii. বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের জলবায়ু প্রায় একই
- iii. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

উদ্দীপকটি সক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. উদ্দীপকের T স্তরে ধাকে –

- i. অঞ্জিজেন ও নাইট্রোজেন
- ii. কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ধূশিকণা
- iii. জলীয়বাস্ত্ব ও উজোন গ্যাস

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. S স্থানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এই স্থানের-

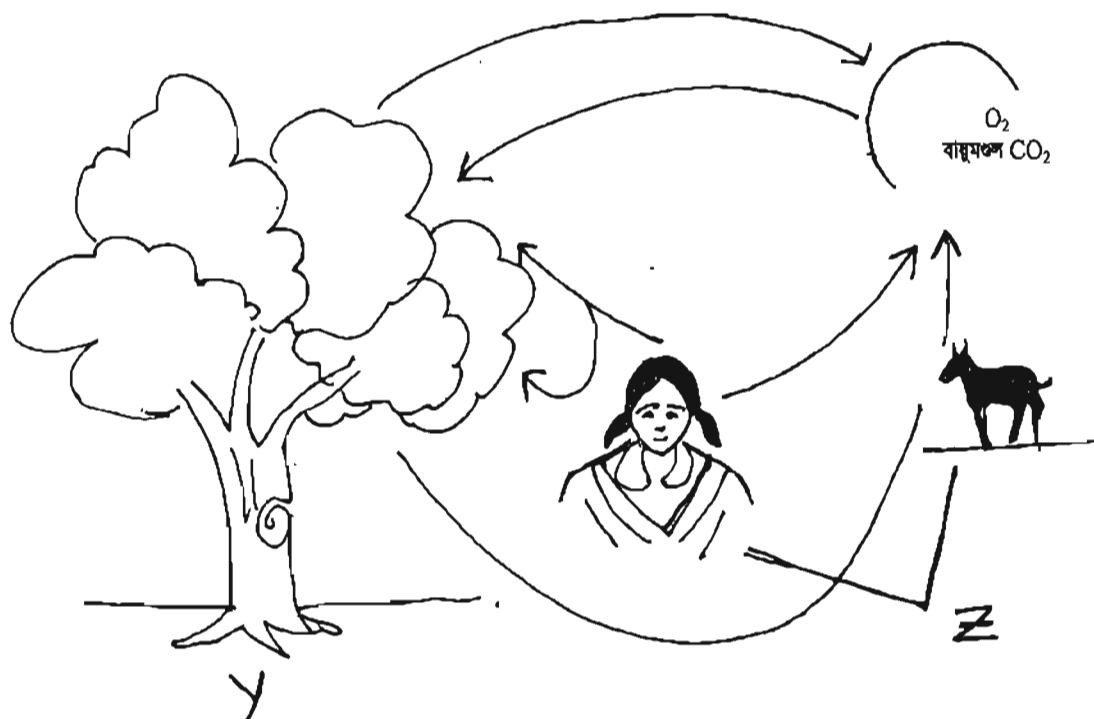
- বায়ুর চাপ বাড়বে
- বায়ু হালকা হবে
- বায়ুর চাপ কমবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

### সূজনশীল প্রক্রিয়া

১.



চিত্র

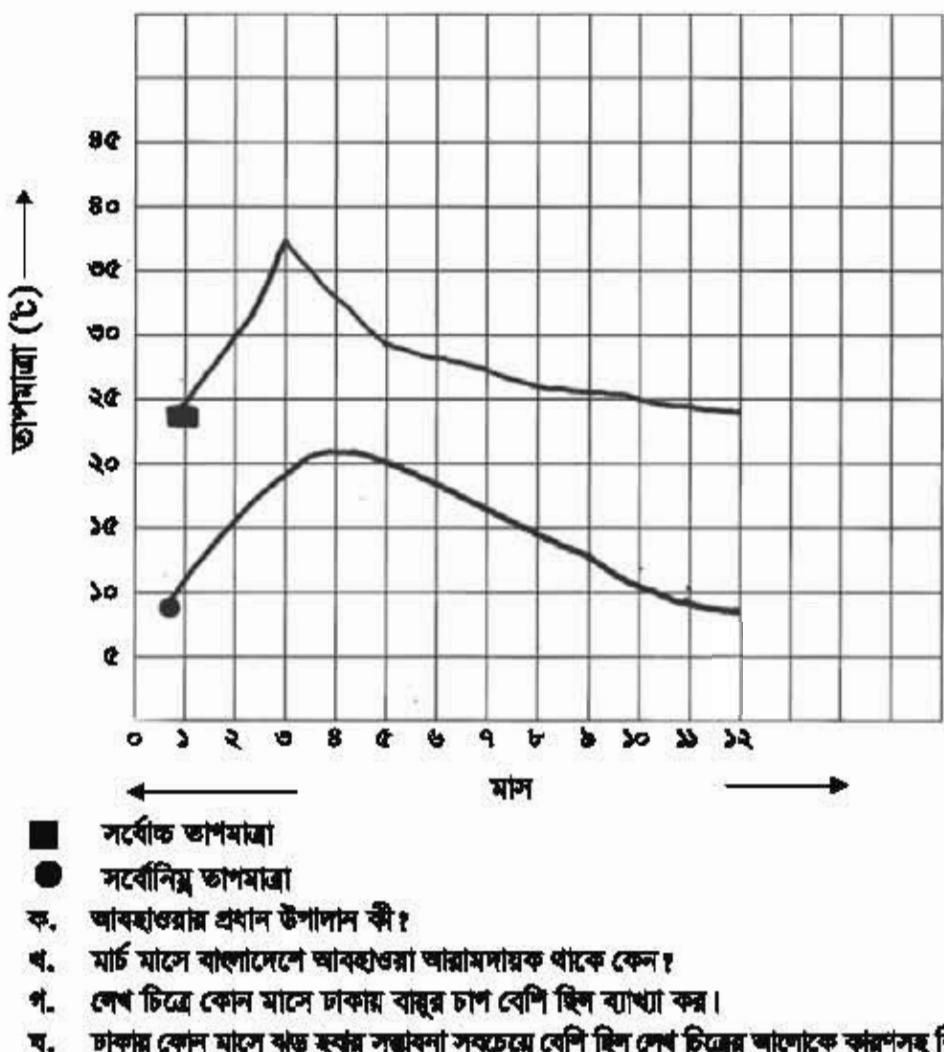
ক. ভূগর্ভস্থ পানি কী?

খ. স্ট্রাটোমণ্ডল কেন জীব জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? বর্ণনা কর।

গ. Y ও Z কিভাবে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Z থেকে নির্গত গ্যাসটির পরিমাণ অধিক বেড়ে পেলে পরিবেশে কী বিপর্যয় ঘটবে তা মুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২. সিলের থাকে ঢাকার কোনো এক বছরের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখানো হলো।





সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিনয়ীকে সবাই পছন্দ করে

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য